হাজ্‌রাতুল কুদ্দুস

আল্লামা বদ্‌রুদ্দীন সেরহিন্দী রহ.

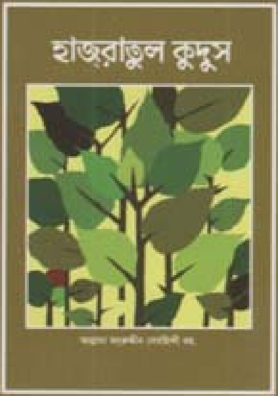

সেই সিঁড়ি শেষ হয়েছে। সমাপ্ত হয়েছে নবী-রসুল প্রেরণের প্রবহমানতা। এসেছেন তাঁদের শেষতম ও মহানতম জন, যিনি অপার মমতার পারাবার। রহমাতুল্লিল আ'লামীন। তারপর গত হয়েছে চৌদ্দশত বৎসর। তাঁর ধর্মাদর্শের পথেই এখন সমর্পিতপ্রাণ হতে হবে আমাদেরকে। খুঁজে নিতে হবে তাঁরই পথানুগামী কোনো নায়েবে রসুলকে, জামানার কুতুবকে, যথার্থ পীর-মোর্শেদকে। তাঁরাই মোহনা সমুদ্রমিলনপিয়াসী নদীসমূহের। হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ যেমন বলেছেন 'ফকিরদের দীল্ আল্লাহ্প্রাপ্তির দরওয়াজা।'

'হাজ্‌রাতুল কুদুস' অর্থ 'পবিত্রাত্মাগণ' –তাঁদের জীবনচরিত।

প্রচ্ছদ : সাবৃনা

হাজ্‌রাতুল কুদুস

প্রথম খণ্ড

হাজ্‌রাতুল কুদুস

প্রথম খণ্ড

ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. থেকে
হজরত খাজা মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ র. পর্যন্ত
মাশায়েখে নক্‌শবন্দিয়ার একটি প্রাচীন ও প্রামাণিক আলোচনা

কাশ্‌ফে হাকায়েক আল্লামা বদ্‌রুদ্দীন সেরহিন্দী র.
খলিফা
হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি কুদ্দিসা সিররুহু

উর্দু অনুবাদ
খাদেমে আহলুল্লাহ্‌ মোহাম্মদ আশরাফ নক্‌শবন্দি মুজাদ্দেদি
মাকতাবায়ে নোমানিয়া
ইকবাল রোড, শিয়ালকোট

হাজ্‌রাতুল কুদুস
প্রথম খণ্ড
আল্লামা বদ্‌রুদ্দীন সেরহিন্দী র.
অনুবাদ
মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মালেক
সম্পাদনা
মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ২০১৪

প্রকাশক
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ
www.hakimabad.com
ফোনঃ ০১৭২৬২৮৮২৮০, ০১৬৭৭০৪২৮৯২, ০১৭৩৩৯৫৪৮৪১

মুদ্রকঃ শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

প্রচ্ছদঃ সাবৃনা

বিনিময়ঃ ২৮০/- (দুইশত আশি টাকা মাত্র)

পরিবেশক
মোজাদ্দেদিয়া কুতুবখানা
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০
মোবাইলঃ ০১১৯৯-৪৩৫৭৩৮, ০১৯২৯-৪৮৫২৯৯

HAZRATUL QUDUS Volume-1: Authoratative discussions on the lifesketchs of Holy Souls written by Allama Badruddin Serhindi (Rh.) and translated in Bengali by Maolana Mohammad Abdul Malek / Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia, Bhuigarh, Narayangonj, Bangladesh.
Exchange Tk.280/-   US $ 20

ISBN 984-70240-0065-0

بسم الله الرحمن الرحيم

মানুষের আর্তি-আকুতি ও রহস্যাভিসার সেদিকেই, যেদিকটি তার জানা নেই। তার প্রজ্ঞা ও প্রেমের অভিযাত্রা জুড়ে রয়েছে কেবলই দুর্বোধ্যতাপ্রিয়তা, অন্বেষণপিপাসা। তার ভাবনা-চেতনা-বেদনায়, সত্তায়-আত্মায় কেবলই প্রশ্ন— কে তুমি? কোথায় তুমি, কোথায় তুমি— দ্যাখা দাও, 'আরেনি' 'আরেনি'।

পথিক! তুমি পথ হারাবে কেনো? চলতে থাকো। পথশ্রান্তি তো পথপ্রাপ্তিরই পূর্বনিদর্শন। তোমাকে যিনি ভালোবেসে তাঁর পরিচয় দানের নিমিত্তে সৃষ্টি করেছেন, অশেষ অনুকম্পাপরবশ হয়ে কেবল তাঁরই সকাশকামী হতে বলেছেন। শিখিয়েছেন এই মরমী মহাপ্রার্থনাখানি— আমি তো তোমারই আরাধনা করি এবং শরণ যাচনা করি কেবল তোমার। সুতরাং জীবনকে জবাবশোভিত করতে হলে দ্বন্দ্ব-সন্দেহ-অবিশ্বাস পরিহার করতে হবে। প্রশ্নপ্রবণপ্রবৃত্তিকে দেখাতে হবে সমর্পণের পথ, বিশ্বাস-ভালোবাসার অলৌকিক আলোকরেখা।

মহাকালের প্রেক্ষিত-পটভূমিকায় বার বার ওই আলোকরশ্মিরই পুনঃ পুনঃ প্রজ্জ্বলন ঘটিয়েছেন আমাদের মহান প্রভুপালয়িতা যিনি সর্বশক্তিধর, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ। ওই আলোক প্রজ্জ্বলনকারীগণের নাম নবী ও রসূল।

তাঁদের প্রথমজনের নাম হজরত আদম আ.। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষজনের নাম হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। মহাপ্রস্থানপর্ব শেষ করেছেন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের প্রজ্জ্বলিত আলোককুণ্ড এখনও প্রবহমান। এই পবিত্র প্রবহমানতা সচল, সবল ও সফল হতে থাকবে মহাপ্রলয় সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত। যাঁরা এই আলোকসম্ভার-প্রেমভার বুকে বয়ে নিয়ে চলেছেন ও চলবেন, তাঁরাই আউলিয়া— পীর ও মোর্শেদ।

আমাদের প্রেম-পিপাসা, প্রেমালোকতৃষ্ণা মেটাতে পারেন এখন কেবল তাঁরাই। আমাদেরকে এখন তাঁদেরই স্নেহ-মমতার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। এটাই পরিত্রাণের পথ। সফলতার সুন্দর সরণী।

তাঁদের সকলের রয়েছে অটুট শৃঙ্খল— সিল্‌সিলা। সেগুলোর নামও রয়েছে বিভিন্ন রকমের— যেমন কাদেরিয়া, চিশ্‌তিয়া, নক্‌শবন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া।

'হাজ্‌রাতুল কুদুস' এর এই খণ্ডটিতে রয়েছে নক্‌শবন্দিয়া সিলসিলার পীর-মোর্শেদগণের জ্যোতির্ময় জীবনালেখ্য। এটা প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ডখানি প্রকাশিত হয়েছে এক বছর আগে। এবার ক্রমসমতায় আসতে পারা গেলো। আলহামদুলিল্লাহ্‌।

এই পুস্তকখানি তরিকাগ্রহণকারীদের জন্য অবশ্যপাঠ্য। বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী সালেকগণ এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করবেন না।

বেলা তো বেড়েই চলেছে। এক এক করে প্রত্যেক জীবনেই আসছে সকাল-দুপুর-অপরাহ্ন। ওই তো সামনে নিশিথের আগমনাভাস— বিষণ্ন সায়াহ্ন। আসুন! এখনই সাবধান ও সচকিত হই। গ্রহণ করি পীর ও মোর্শেদ। আলো হই, সুবাস-সুরভি হই মুক্তি, শান্তি ও ভালোবাসার। হে আমাদের পরম প্রেমময় প্রভুপালনকর্তা! আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করো।

গ্রন্থখানির সম্মানিত রচয়িতা আল্লামা বদ্‌রুদ্দীন সেরহিন্দি র. ছিলেন হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন খলিফা। তাঁর লেখনীতেও সুবিকশিত হয়েছে তাঁর পবিত্র প্রভাব। সে প্রভাবকে মান্য করেই এগিয়ে চলেছি আমরা।

হে আমাদের জীবন-জীবনোপকরণদাতা, মৃত্যুপ্রদাতা আল্লাহ্‌! এই গ্রন্থের অনুবাদক, পাঠক এবং এর প্রকাশকর্মসন্নিহিত কর্মী-শ্রমিকগণ— আমরা প্রশংসা-প্রশস্তি স্তব-স্তুতি বর্ণনা করি কেবল তোমার। আর সর্বোৎকৃষ্ট দরূদ-সালাম প্রেরণ করি তোমার প্রেমাস্পদ ও প্রিয়তম বাণীবাহক মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবার প্রতি— সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। শান্তিবারতা বর্ষিত হোক সকল নবী-রসূল, নৈকট্যভাজন ফেরেশতাকুল এবং প্রস্থানিত পীর-আউলিয়া ও পুণ্যবান-পুণ্যবতীগণের উপর। আমিন।

শান্তি এবং শান্তি— প্রথমে, এখন ও পরবর্তীতে।

ওয়াস্‌ সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

বোখারা বাগানে হাসে গুলে-নক্‌শবন্দ্‌
মাটির সুরাহী যার প্রেমের পরশে
হয়ে যায় সুচিত্রিত অতুল বুলন্দ্‌
চমকায় ইশকের বাগানে হরষে।
বিরান বাগানে দিলে ফুলের বাহার
বেখবর মানুষের মিনারে আজান
জীবনের জয়্‌বায় বাগ বোখারার
ছুটালো জাহান জুড়ে প্রেমের তুফান।

তোমার বিরহে ফোটে দীলের দরদ্‌
গোপন চেতন পটে কুসুমের মতো
বোখারা বরণ তার পাপড়ি পরত্‌
সুবাস ছড়ায় বিশ্ব জুড়ে অবিরত।

সালাম গ্রহণ করো শাহে নক্‌শবন্দ্‌
তোমারই বিরহে পোড়ে পাপী ফরজন্দ্‌।

সূচীবিন্যাস

হাজ্‌রাতুল কুদুসঃ শুরুর কথা/১১
পরিচিতি/১৩
হামদ/১৯
শাজরায়ে খানদানে আলিয়া নক্‌শবন্দিয়া/২৩
চার খলিফার গুণাবলী ও মর্যাদা/২৬
প্রথম খলিফা আমিরুল মুমিনীন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু/৩৩
আমিরুল মুমিনীন হজরত ওমর ফারুক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু/৫০
হজরত ওমর রা. এর বাণী/৫৪
আমিরুল মুমিনীন হজরত ওসমান জুন্‌নূরাইন রদ্বিয়াল্লাহু আনহু/৫৯
আমিরুল মুমিনীন হজরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু/৬৩
হজরত সালমান ফারসী রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু/৬৮
ইমাম কাসেম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর সিদ্দিক র./৭১
হজরত ইমাম জাফর সাদেক র./৭২
হজরত বায়েজীদ বোস্তামী র./৮০
হজরত শায়েখ আবুল হাসান খেরকানী র./৮৯
হজরত শায়েখ আবু আলী ফারমেদী তুসী কুদ্দিসা সিররুহু/৯৪
হজরত খাজা আবু ইউসুফ হামাদানী কুদ্দিসা সিররুহু/৯৮
হজরত খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানী কুদ্দিসা সিররুহু/১০১
হজরত খাজা আরেফ রেওগাড়ী কুদ্দিসা সিররুহু/১২০
হজরত খাজা মাহমুদ আঞ্জীর ফাগনবী কুদ্দিসা সিররুহু/১২৩
হজরত খাজা আলী রামেতিনি কুদ্দিসা সিররুহু/১২৫

হজরত খাজা মোহাম্মদ বাবা সাম্মাসী কুদ্দিসা সিররুহু/১৪০
হজরত সাইয়্যেদ আমীর কুলাল কুদ্দিসা সিররুহু/১৪৩
খাজা মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন নক্শবন্দ কুদ্দিসা সিররুহু/১৪৫
আমীর বোরহানউদ্দিন কুদ্দিসা সিররুহু/১৮২
আমীর হামজা কুদ্দিসা সিররুহু/১৮৪
আমীর শাহ কুদ্দিসা সিররুহু/১৮৪
আমীর আমর কুদ্দিসা সিররুহু/১৮৫
মাওলানা আরেফ দেগ গেরানী কুদ্দিসা সিররুহু/১৮৫
হজরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী কুদ্দিসা সিররুহু/১৮৮
খাজা আলাউদ্দিন গজদাওয়ানী কুদ্দিসা সিররুহু/১৯৪
শায়েখ সিরাজুদ্দিন পীর মাস্তি কুদ্দিসা সিররুহু/১৯৫
মাওলানা সাইফুদ্দিন মানারী কুদ্দিসা সিররুহু/১৯৬
মাওলানা সাইফুদ্দিন খোশখা বোখারী কুদ্দিসা সিররুহু/১৯৭
খাজা আলাউদ্দিন আত্তার কুদ্দিসা সিররুহু/১৯৭
খাজা মোহাম্মদ পারসা কুদ্দিসা সিররুহু/২০৩
হজরত খাজা নাসিরউদ্দিন উবায়দুল্লাহ আহ্রার কাদ্দাসাল্লাহু সিররুহু/২০৬
হজরত মাওলানা মোহাম্মদ জাহেদ দখ্শী কুদ্দিসা সিররুহু/২২৫
হজরত মাওলানা দরবেশ মোহাম্মদ কুদ্দিসা সিররুহু/২৩৩
হজরত মাওলানা খাজেগী আমকাংগী কুদ্দিসা সিররুহু/২৩৫
হজরত খাজা মোহাম্মদ বাকী কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজ/২৩৯
মকতুব ৪. নক্শবন্দিয়া তরিকার পরিভাষাসমূহ/২৫৭
আল্লাহ্র ওলীগণ কবীরা গুনাহ থেকে নিরাপদ নন/২৭২
হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর কারামতসমূহ/২৮০
হজরত খাজা উবায়দুল্লাহ র./২৯৪
হজরত খাজা আবদুল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহু/২৯৫
শায়েখ তাজুদ্দীন সম্ভলী কুদ্দিসা সিররুহু/২৯৯
খাজা হুসামুদ্দিন আহমদ কুদ্দিসা সিররুহু/৩০৪
শায়েখ ইলাহ্দাদ কুদ্দিসা সিররুহু/৩১০

আমাদের বই

তাফ্সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
মাক্বামাতে মাযহারী (১-২) মোট ২ খণ্ড
হাজ্রাতুল কুদুস (১-২) মোট ২ খণ্ড
মুকাশিফাতে আয়নিয়া
মাআরিফে লাদুন্নিয়া
মাব্দা ওয়া মা'আদ

মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
সিদ্দিকশ্রেষ্ঠ ◆ নকশায়ে নক্শবন্দ ◆কালিয়ারের কুতুব ◆বায়ানুল বাকী
জীলান সূর্যের হাতছানি ◆নূরে সেরহিন্দ ◆আল্লাহ্র জিকির ◆প্রথম পরিবার
মহাপ্রেমিক মুসা ◆তুমিতো মোর্শেদ মহান ◆নবীনন্দিনী ◆ জননীদের জীবনকথা

আবার আসবেন তিনি ◆ অগ্নি ও উদ্যানের সংবাদ
সুন্দর ইতিবৃত্ত ◆ফোরাতের তীর ◆ মহাপ্লাবনের কাহিনী
দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন ◆কী হয়েছিলো অবাধ্যদের

THE PATH
পথ পরিচিতি ◆নামাজের নিয়ম ◆রমজান মাস ◆ চেরাগে চিশ্তী
BASICS IN ISLAM ◆ ইসলামী বিশ্বাস
মালাবুদ্দা মিনহু ◆ কোরআন ও তাজবীদ শিক্ষা

কাব্য সংকলন ◆ সোনার শিকল
বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন ◆ সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
তৃষিত তিথির অতিথি ◆ ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
নীড়ে তার নীল ঢেউ ◆ ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

হাজ্‌রাতুল কুদুস
প্রথম খণ্ড

শুরুর কথা

হাজ্‌রাতুল কুদুস আল্লাহ্‌র প্রেমাস্পদ রহমাতুল্লিল আলামিনের উত্তরাধিকারীদের একটি প্রামাণিক আলোচনা। সুবহানাল্লাহ্! আলোচনা যদি হয় আরেফীন ও সালেহীনগণের, আর সে আলোচনার লেখকও যদি হন ওলিয়ে কামেল, তাহলে কেউ যদি দৃঢ় বিশ্বাস ও মহব্বত নিয়ে তা পাঠ করে, সে কি কখনো আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত হতে পারে?

تَنَزَّلُ الرَّحْمَةِ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ -

(সালেহীনের আলোচনাকালে আল্লাহ্‌র রহমত অবতীর্ণ হতে থাকে)।

দীর্ঘদিন যাবত ‘হাজ্‌রাতুল কুদুস’ এর অনুবাদ পাওয়া যাচ্ছিলো না। সূফী মোহাম্মদ জাফর সাহেব (রংপুরী, শিয়ালকোটী) হাজ্‌রাতুল কুদুস প্রথম খণ্ডের একটি অনূদিত অনুলিপি আমাকে দিয়েছেন। দোয়া করি, আল্লাহ্ তাঁর কল্যাণ করুন। আমিন। অনুলিপিখানি পাঠ করার পর অনুভব হলো, নকশ্‌বন্দী মাশায়েখগণের শিক্ষা ও তাঁদের রূহানী ফয়েজ হাসিল করার জন্য গ্রন্থখানি অবশ্যপাঠ্য। তাই আল্লাহ্‌প্রেমিকগণের রূহানী আস্বাদ সরবরাহের উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি ছাপিয়ে প্রকাশের ইচ্ছা করলাম। মূল ফার্সি অনুলিপি কোথাও পাওয়া যাচ্ছিলো না। ফলে কাজ শুরু করাও সম্ভব হচ্ছিলো না। অবশেষে আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে মাওলানা আবদুর রশীদ কাশেমী প্রথম খণ্ডের একটি ফার্সি কপি কুতুবখানায়ে রশীদিয়া, লাহোর এর স্বত্বাধিকারীর নিকট প্রেরণ করেন। বিষয়টি জানতে পেরে যথাসম্ভব দ্রুত তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। মাওলানা সাহেবও আনন্দচিত্তে গ্রন্থটি পাঠ করার অনুমতি দিয়ে দিলেন। এজন্য অবশ্যই তিনি ধন্যবাদার্হ। আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। আমিন। দীর্ঘদিন ধরে পাঠকদের অনেক কষ্ট হয়েছে। অবশ্য এর অনেক কারণও আছে। সেগুলো উল্লেখ করলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে। আলহামদুলিল্লাহ্! শেষে সকল

প্রতিবন্ধকতা দূর হলো। প্রকাশপর্ব সমাগত হলো। আল্লাহ্তায়ালা সকল মুসলমানকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিন। আমিন।

পাঠক সমীপে উপস্থাপনব্য কিছু কথা ঃ

১. মূল গ্রন্থকার যে আলোচনা যে শিরোনামে করেছেন, আমরাও তদ্রূপ করেছি।

২. উপশিরোনামসমূহ পাঠকের সুবিধার্থে আমাদের পক্ষ থেকে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৩. মূল কিতাবে উল্লেখিত কোরআনের আয়াত ও হাদিসসমূহের উদ্ধৃতি প্রথম অনুবাদক পার্শ্বটীকায় উল্লেখ করেছেন। আমিও (উর্দু অনুবাদক) সেগুলো যথাস্থানে রেখে দিলাম। স্বীকার করছি, মরহুম মাওলানার (প্রথম অনুবাদকের) অনুবাদ দ্বারা আমিও উপকৃত হয়েছি।

৪. কিছু স্থানে ড. গোলাম মোস্তফা সাহেব মা. (হায়দারাবাদ) বিশ্লেষণমূলক কিছু টীকা সংযোজন করেছিলেন। সেগুলোও যথাস্থানে তাঁর নামসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. অবশিষ্ট অন্যসব টীকা অধমের পক্ষ থেকে সংযোজিত।

৬. পুস্তকটি নির্ভুল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু আমি অধম নির্ভুল নই। তাই সুধী মহল সমীপে আবেদন এই যে, কোথাও ভুল-ত্রুটি পরিদৃষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করবেন, যাতে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা যায়।

পুস্তকটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আর জনাব জিয়া মোহাম্মদ জিয়ার (মা.আ.) কথা স্মরণ করছি বিশেষভাবে, যিনি তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে কবিতাসমূহ সংশোধন করে দিয়েছেন।

অধমের প্রতি চির মেহেরবান পীরজাদা আল্লামা ইকরাম আহমদ ফারুকী সাহেব গ্রন্থকারের জীবনী লিখে দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন। দ্বীনের খেদমতে আল্লাহ্ তাঁর লেখনিতে আরও শক্তি দান করুন। বন্ধুবর জনাব কমর ইয়ায্দানী সাহেবকেও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি, যিনি প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থসমূহের জন্য যথেষ্ট সময়ক্ষেপণ করেন।

ওহে আমাদের প্রভুপালক! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা। আর তাঁর ওসিলায় আমাদেরকে ক্ষমা করো, যিনি বিশ্বজাহানের করুণাসিন্ধু। রহমাতুল্লিল আলামীন। তাঁর প্রতি যাবতীয় সালাত ও সালাম।

মোহাম্মদ আশরাফ নক্‌শবন্দী মোজাদ্দেদী।

পরিচিতি

পীরজাদা আল্লামা ইকবাল আহমেদ ফারুকী, এম. এ. বলেন, হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর যতোগুলো জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তন্মধ্যে খাজা হাশেম কাশেমী রচিত 'যুবদাতুল মাকামাত' ও শায়েখ বদরুদ্দীন সেরহিন্দী প্রণীত 'হাজ্‌রাতুল কুদুস' শীর্ষস্থানীয়। লেখকদ্বয় হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানির দীক্ষাপ্রাপ্ত অন্তরংগ বন্ধু ও নকশ্‌বন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার বরকতপ্রাপ্ত প্রথম সারির প্রচারক হিশাবে স্বীকৃত। শায়েখ বদরুদ্দীন রচিত 'হাজ্‌রাতুল কুদুস' পুস্তকখানির ঐতিহাসিক নাম 'দারাজাতুল আবরার' (পুণ্যবানগণের স্তর)। ১০৪৩ হিজরী মোজাদ্দেদিয়া তরিকার দরবেশগণের জীবনীপরম্পরা, মারেফাতের অবস্থাসমূহ ও মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর সংস্কারমূলক কর্মসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা বিন্যাসের ক্ষেত্রে পুস্তকখানি এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বিজ্ঞ লেখক পুস্তকটিকে বারো অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে চার খলিফা ও হজরত সালমান ফারসী রা. থেকে হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. পর্যন্ত নকশ্‌বন্দিয়া তরিকার বুজর্গগণের আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায় হতে নবম অধ্যায় পর্যন্ত ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে সুবিশদ আলোচনা করেছেন। দশম অধ্যায়ে আলোকপাত করেছেন হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানির শেষ জীবনের অবস্থা সম্পর্কে। একাদশ অধ্যায়ে তাঁর সন্তানগণের এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে তাঁর খলিফাগণের আলোচনাকে স্থান দিয়েছেন।

বিজ্ঞ লেখক তাঁর রচনায় জীবনী লেখার সাধারণ পদ্ধতি থেকে কিছুটা ভিন্নতা অবলম্বন করতঃ বাব (অধ্যায়) এর স্থলে 'হাজ্‌রাত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আর বড়দের (মহাত্মাগণের) বাণীগুলোকে 'কুদসিয়্যাহ্‌' বা 'মালফুয' শব্দে ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের আধ্যাত্মিক স্তর বুঝানোর জন্য

‘দরজাত’ শব্দ প্রয়োগ করেছেন এবং তাঁদের কারামতসমূহকে ‘কারামত’ বা ‘তাসাররুফ’ শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে হাজ্‌রাতুল কুদুসের শাস্ত্রীয় পরিভাষার পাশাপাশি এর নামের মধ্যে যে অর্থগত সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তা একমাত্র শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যানুরাগীরাই অনুধাবন করতে সক্ষম।

গ্রন্থটির বিন্যাসশৈলী, পরিমার্জনা, শিল্পিত বিবরণকৌশল, বিষয়বস্তু ও শিরোনাম— অধিকন্তু এর গ্রহণযোগ্যতা ও অনুমোদনের যাবতীয় বিষয় এক কথায় অনবদ্য। তিনি বলেন, এই অধম, অপদার্থ ইতোপূর্বে তাঁর (মোজাদ্দেদে আলফেসানী র.) পবিত্র করকমলে এই মাকামাগুলো লিপিবদ্ধ করে পেশ করেছিলাম— সেই পুস্তকটির নাম ছিলো ‘সিয়ারে আহমদী’। তিনি সেটা পড়ে খুবই আনন্দিত হয়ে বলেছিলেন, আমার জীবনী সম্পর্কে তোমার এই লেখা খুবই সুন্দর হয়েছে। লেখক এ গ্রন্থ রচনার পূর্বে ‘সিয়ারে আহমদী’ নামে মাকামাতে মুজাদ্দেদিয়া সম্পর্কে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যা মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. পছন্দ করেছিলেন এবং নিজ হাতে কিছু শব্দ সংশোধন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি গৃহের আসবাবপত্রের সঙ্গে চুরি হয়ে গিয়েছিলো। এতে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন এবং নিপতিত হয়েছিলেন এক ধরনের নৈরাশ্য ও হীনমন্যতায়। ইতোমধ্যে তাঁর পীর ভাই খাজা হাশেম কাশমিরী র. এর জীবনালোচনা ১০৩৭ হিজরীতে ‘যুবদাতুল মাকামাত’ নামে প্রকাশ পায়। পুস্তকটি পাঠ করে তিনি পুনঃপ্রণোদিত হন। ১০৩৯ হিজরীতে (মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর ইন্তেকালের পর) তিনি পুনরায় গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। কিছু কিছু বিষয় তাঁর কলমের গতিপথে বারংবার বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিলো। রচনা সংক্রান্ত ওই সকল বাধা হাজ্‌রাতুল কুদুসের পাণ্ডুলিপি ও তাঁর লেখকের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করছিলো। সেগুলোর কিছু এখানে উল্লেখ করা অতীব জরুরী। ১০৪৩ হিজরীতে রচনা শেষ করলেন। ইতোমধ্যে সেরহিন্দের একজন সাইয়্যেদ অতিভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে ওলীআল্লাহ্‌গণের একটি পূর্ণাঙ্গ রচনা তৈরী করার প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁর আগ্রহ ও নিষ্ঠা দেখে লেখক এতোটা প্রভাবান্বিত হন যে, তিনি ‘হাজ্‌রাতুল কুদুসের’ কাজ বন্ধ করে ‘মাজমাউল আউলিয়া’ নামে এক হাজার পাঁচশত বুজর্গানে দ্বীনের জীবনীসম্বলিত এক সুদীর্ঘ গ্রন্থ রচনা শুরু করে দেন। আর এ কাজ শেষ করেন ১০৪৪ হিজরীর শেষ দিকে। তারপর হাজ্‌রাতুল কুদুসের পাণ্ডুলিপি

সংশোধন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তৎকালীন বিচারপতি সাইয়্যেদ সাহেব তাঁকে পুনরায় আহবান করেন 'মাজমাউল আউলিয়ার' কিছু কাজ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য। তাই তিনি গ্রন্থখানির সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকেন ১০৪৭ হিজরী পর্যন্ত। তিন বৎসর পর একাজ থেকে অবসর হয়ে হাজ্‌রাতুল কুদুসের কাজে হাত দেওয়া মাত্রই শাহ্‌জাদা দারাশিকোর পক্ষ থেকে এসে পৌঁছে আরেক আবেদন, যার প্রেক্ষিতে 'বাহ্‌জাতুল আসরার' ও 'রওজাতুল নাওয়াযির' নামক দুটি গ্রন্থ ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করার গুরুদায়িত্ব সুসম্পন্ন করতে হয়। অতঃপর বাহানে বাকলী রচিত 'তাফসীরে আরাইসুল বায়ান' এর অনুবাদও তাঁর দায়িত্বে অর্পণ করা হয় সেই একই ব্যক্তির পক্ষ থেকে। তবে 'আরাইসুল বায়ান' অনুবাদের পাশাপাশি হাজ্‌রাতুল কুদুসের পাণ্ডুলিপি তিনি সংশোধন করে ফেলেন। বক্ষমান এ গ্রন্থটি তাই ১০৫৩ হিজরীতে পূর্ণতার স্তরে এসে পৌঁছে।

নকশ্‌বন্দিয়া বুজর্গগণের জীবনী সম্পর্কে বিশেষ করে মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর মাকামাত সম্পর্কে লিখিত পুস্তকাদির মাঝে 'হাজ্‌রাতুল কুদুস' অনন্য মর্যাদার অধিকারী। মোজাদ্দেদিয়া সিলসিলার সাথে আধ্যাত্মিকভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের জন্য এই কিতাব আলোকবর্তিকা-স্বরূপ। ইমামে রব্বানি মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর জীবন ও কর্মবিষয়ক গবেষকগণের জন্য এই কিতাব একটি বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ প্রমাণপঞ্জী। 'যুবদাতুল মাকামাত' নামক গ্রন্থটিও একই বিষয়ের উপর রচিত। এর লেখকও মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর দীক্ষাপ্রাপ্ত খলিফা। কিন্তু হাজ্‌রাতুল কুদুস অদ্বিতীয় ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কারণ এই গ্রন্থের মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে 'সিয়ারে আহমদী' নামক পুস্তিকার উপর, যা হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য মর্যাদায় ভূষিত হয়েছিলো। কিছু কিছু স্থান তাঁর সংশোধনের সৌভাগ্যও অর্জন করেছিলো। 'যুবদাতুল মাকামাত' প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেলো যে, মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর জীবনের কিছু দিক এতে অনুপস্থিত। 'হাজ্‌রাতুল কুদুস' এর লেখক সেগুলোও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সাহিত্য ও ভাষাগত বিবেচনায় 'যুবদাতুল মাকামাত' অপেক্ষা 'হাজ্‌রাতুল কুদুস' অধিক প্রাঞ্জল ও সাবলীল। মোটকথা উভয় কিতাব স্ব-স্ব স্বকীয়তা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

গবেষকগণ ‘হাজ্‌রাতুল কুদুস’ এর গ্রন্থকার শায়েখ বদরুদ্দীন বিন শায়েখ মোহাম্মদ ইব্রাহীম র. এর জন্মতারিখ বিভিন্ন আলামতের আলোকে ১০০২ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন। পনেরো বৎসর বয়সে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর পিতা আবদুল আহাদ র. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দারুল উলুমে ভর্তি হন, যা পরবর্তীকালে মোজাদ্দেদিয়া সিলসিলার সালেকগণের তরবিয়ত বা দীক্ষাকেন্দ্রে (খানকায়) পরিণত হয়। তৎকালে উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার ছিলো মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর ওপর। সম্মানিত লেখক তাঁর নিকট থেকেই জাহেরী এলেম অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি একস্থানে লিখেন, এই অধম শরহে মাওয়াকেফ, বায়যাবী, কুদুরী, আহমদী হাশিয়ায়ে মীর সহকারে হজরতের কাছেই পড়েছেন এবং হজরতের শিষ্যত্বের সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

শায়েখ বদরউদ্দীন সেরহিন্দী ১৭ বৎসর পর্যন্ত সেই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছিলেন। জাহেরী এলেম অর্জনের পাশাপাশি হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানির সান্নিধ্যে সুলুকের স্তরসমূহ যথাযথভাবে অতিক্রম করেন। হজরত মোজাদ্দেদ র.ও তাঁর তরবিয়তের কাজটি অতি গুরুত্ব সহকারে সম্পন্ন করেন। জাহেরী এলেম অর্জনকালে এমন সময়ও অতিক্রান্ত হয়েছে যখন স্বয়ং মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. আদেশ করেছেন কিছুদিনের জন্য সবক ও তাকরার (সামনের পাঠ ও অতীত পাঠের পুনরালোচনা) বন্ধ রাখতে— যাতে অন্তরে জিকরে ইলাহীর আছর (চিহ্ন) বসে যায়। এ নির্দেশ পালনার্থে তিনি কিছুদিনের জন্য লেখাপড়া বন্ধ করে দেন এবং লোকজনের সংশ্রবও পরিত্যাগ করেন। নিজের বক্ষকে মারেফতের গুপ্ত রহস্যভাণ্ডারে রূপায়িত করেন। এমনকি গাছপালা, মাটি, পাথরকে তিনি আল্লাহ্‌র জিকিরে মশগুল দেখতে পান। আর এভাবেই তিনি মাযহারে জামালে রব্বানীর স্তরে এসে পৌঁছেন।

সুলুকের স্তরসমূহ অতিক্রম করে করে শায়েখ বদরুদ্দীন সেরহিন্দী র. সাহু (সচেতনতা), মাহু (নিমজ্জন), তাসবীহ (উপমা), তাওহীদ (একত্ববাদ) ও অজুদীর (অস্তিত্বের) অবস্থাসমূহও অতিক্রম করেন এবং আল্লাহ্‌র যাতপাকের পরিচয়ের দৌলতে ধন্য হন।

লেখকের ভাষ্যমতে এক মাকামে জিকিরের প্রভাবে অবস্থা এরূপ হয় যে, সকল কিছু মানবীয় ইচ্ছার বাইরে চলে যায়। অন্তরের এসকল অবস্থা মোজাদ্দেদ সাহেবের তরবিয়তের ফলাফল ছাড়া আর কিছুই নয়। হজরত

মোজাদ্দেদ র. তাঁর অধীনে তরবিয়তরত সালেকের স্তরসমূহ অতিক্রমের বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। শায়েখ বদরুদ্দীন সেরহিন্দী র. হাজ্‌রাতুল কুদুসের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ দিকে সেই স্তর ও অবস্থাসমূহের আলোচনা করেছেন, সেগুলো তিনি অতিক্রম করেছেন। যদি সে সকল স্তর সবিস্তারে আলোচনা করা হতো তাহলে পাঠকগণ অনুধাবন করতে পারতেন যে, মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর উচ্চপর্যায়ের তাওয়াজ্জোহ্ ও তাঁর পরশপাথরতুল্য সান্নিধ্য কীরূপ জটিল ও কঠিন স্তরসমূহ অতিক্রম করার ক্ষেত্রে সফল সহযোগিতা করেছে।

হাজ্‌রাতুল কুদুসের গ্রন্থকার তাঁর এই নূরান্বিত রচনায় আপন পীর ও মোর্শেদ হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর ফয়েজ ও বরকতের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে সুলুকের বিভিন্ন স্তর বা মনজিলসমূহ অতিক্রমণকালে উন্নতি বা অবনতির ক্ষেত্রে কলবের বিভিন্ন অবস্থা, কামালতে বেলায়েত (বেলায়েতের পূর্ণতা), কামালতে রেসালত ও নবুওয়াত (রেসালত ও নবুয়তের পরিপূর্ণতা) বিষয়ক ফয়েজ ও বরকতের সুবিন্যস্ত আলোচনা করেছেন। এগুলোর দ্বারা কিছুটা অনুমান করা যায় যে, তরিকায়ে খাস মোজাদ্দেদিয়ার সালেকগণের রূহানী তরবিয়ত (আত্মিক প্রতিপালন) কীভাবে বা কোন্ পদ্ধতিতে করা হয়।

গ্রন্থকার হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর ভিতর-বাহিরের সঙ্গী ছিলেন। তথাপি কচিৎ কখনো তাঁর মজলিশ থেকে দূরে থাকলে হজরত মোজাদ্দেদ র. নিজ পবিত্র মকতুবাতের মাধ্যমে তাঁর তরবিয়তের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেন। মকতুবাতে ইমামে রব্বানী— তিন খণ্ডেই গ্রন্থকারের নামে এরূপ একাধিক মকতুব রয়েছে যার মধ্যে মারেফত ও তাসাউফের রহস্যাবলী সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

২৮৯ নং মকতুবে রয়েছে কাযা ও কদরের (ভাগ্য ও নিয়তি বা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার) রহস্যাবলী, ২৯৭ নং মকতুবে এহাতা ও সুরয়ানে হকের (বেষ্টনী ও আল্লাহ্‌র মাঝে ভ্রমণ) বিশ্লেষণ। দ্বিতীয় খণ্ডের ৪০ নং মকতুবে শানে উরুদীয়ার (সংযম মর্তবা), হুজুব ও শুহুদী (আবরণ ও দর্শন) এবং মাকামে অজুদীর (অস্তিত্ব স্তর) বিবরণ উল্লেখ করেছেন। এভাবে আলমে আরওয়াহ্ (রূহানী জগত), আলমে মেছাল (উদাহরণিক জগত) ও আলমে আযসাদ (দেহতত্ত্ব) এর রহস্যসমূহ বিভিন্ন মাকামের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

হজরত শায়েখ বদরুদ্দীন সেরহিন্দী র. এর পরিবার ছিলো অনেক বড়। এই বড় পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব তাঁকে আমীর সুলতানদের আদেশ পালনে কয়েকবার সম্মত করেছে। জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে তাঁকে কয়েকটি সফর এবং এতদ্‌সংক্রান্ত কিছু কাজও সম্পন্ন করতে হয়েছে।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. বলতেন, আমার ইচ্ছা যে, আপনি এক স্থানে বসে আল্লাহ্‌র মাখলুকদের ইলমী ও রূহানী দিকনির্দেশনা দানের খেদমতে লিপ্ত থাকেন। কিন্তু পারিবারিক অবস্থা আপনার অনুকূল নয়। আপনাকে দিল্লী, আগ্রা ও অন্যান্য স্থানে কয়েকবার ভ্রমণ করতে হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও তিনি যেখানেই যেতেন আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের জিয়ারতের মাধ্যমে ফয়েজ লাভ করতেন। দুনিয়ার এতসব ব্যস্ততা ও রূহানী স্তরসমূহ অতিক্রম করার পাশাপাশি সামর্থ্য অনুযায়ী যে সকল মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন, সেগুলোর তালিকা নিম্নরূপ ঃ

১. হাজ্‌রাতুল কুদুস, ২. ফুতুহুল গয়ব (ফার্সী অনুবাদ), ৩. তাফসীরে আরাইসুল বায়ান (ফার্সী অনুবাদ) ৪. বাহজাতুল আসরার (ফার্সী অনুবাদ) ৫. রাওয়ায়েহ। ৬. কারামাতে আউলিয়া ৭. মাজমাউল আউলিয়া ৮. বেসালে আহমদী ৯. বিজাতে আতকিয়া ১০. রওজাতুন্‌ নাওয়াযের (ফার্সী অনুবাদ)। বক্ষমান গ্রন্থের রচনাকার্যে লেখককে যেরূপ বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং এর বিন্যাস কার্যে তাঁকে প্রায় দশ বৎসর কাল অতিবাহিত করতে হয়েছে, তেমনিভাবে কিতাবের অনুবাদের ক্ষেত্রে (প্রকাশক) হাফেজ মোহাম্মদ আশরাফ সাহেব মোজাদ্দেদীকেও অদম্য আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও জানা-অজানা এমন অনেক বাধা ও ব্যস্ততার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিতাবের অনুবাদ, অনুলিপিকরণ ও প্রকাশনার কাজ কয়েক বৎসরে পূর্ণতা লাভ করেছে।

হাজ্‌রাতুল কুদুসের প্রথম খণ্ড তখনো প্রকাশিত হয়নি, শুধু তার উর্দু তরজমা আল্লাহ্‌ওয়ালাদের কওমী দোকান লাহোর ১৯২৫ ইং সালে প্রকাশ করেছে। এর ফার্সী অনুলিপি দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য। দ্বিতীয় খণ্ডের ফার্সী অনুবাদ মাহকুমা আওকাফ পাঞ্জাবের তত্ত্বধানে ১৯৭১ ইং সালে প্রকাশ পায় এবং সাহিত্যানুরাগী রুচিশীলদের অধ্যয়নের বৃত্তভূত হয়। সেই অনুলিপিকে মাওলানা মাহবুবে ইলাহী তাঁর জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা বিশ্লেষণ, সংশোধনবিষয়ক উপযুক্ত শ্রম-সাধনার মাধ্যমে বিন্যস্ত করেন। বিজ্ঞ লেখকদের নিকট খানকায়ে কান্দিয়া শরীফ কিতাব খানায়ে খানকায়ে

মুসাযাই শরীফ ও আগা হাশেম জানের (সিন্ধু) ব্যক্তিগত হস্তলিখিত অনুলিপি বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু প্রথম খণ্ডের হস্তলিখিত অনুলিপিটি প্রকাশককে কুতুবখানায়ে রশীদিয়া লাহোরের মালিক মাওলানা আবদুর রশীদ কাশেমী সাহেব তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থেকে সরবরাহ্ করেছিলেন। ওই অনুলিপিটি শাব্দিক বিশুদ্ধতা ও হস্তাক্ষরের সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে উন্নত নিদর্শনস্বরূপ ছিলো।

ইকবাল আহম্মদ ফারুকী, এম,এ
২৭শে মার্চ ১৯৮১ ইং।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

হামদ ঃ অসংখ্য অগণিত প্রশংসা মহান আল্লাহ্র ওই পবিত্র সত্তার তানায্যুলাতের দরবারে, যাঁর মধ্যস্থতায় অনস্তিত্বের বাগানে অস্তিত্বের দান ও দাক্ষিণ্য বর্ষিত হয়। অসীম ও অজস্র কৃতজ্ঞতা তাঁরই মহান গুণাবলীর ওই সকল ভালোবাসাপূর্ণ তাআইয়্যুনায়ে সৌরভের জন্য, যার আলোর বিকিরণে চিন্তা-চেতনায় আঁধার আলোকিত হয়েছে। পবিত্র স্তরসমূহের এই যে সোনালী ধারা, যা অদৃশ্য এককত্বের অজ্ঞেয়তা হতে দৃশ্যজগতের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত। সর্বপ্রকার প্রশংসা ও গুণকীর্তনের উপযুক্ত ওই পবিত্র বৃক্ষ নিজ মূল ও শাখা-প্রশাখাসহ কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার অধিকারী।

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

(এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। সূরা বনী ইসরাইল আয়াত ৪৪) এ মাকামেরই বিবরণ দিচ্ছে।

لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ (দুনিয়া ও আখেরাতে সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। সূরা কাসাস আয়াত ৭০)। উভয় আয়াত একই বিষয়বস্তু প্রকাশ করছে। কেনোনা সকল প্রকারের তাসবীহ তাহমিদ তানায্যুলাতে যাতের স্তরসমূহের মধ্য থেকে সেই স্তরের জন্যই হবে। তা আসলুন বা আসলের স্তরসমূহের অন্তর্ভুক্ত। মর্যাদা ও পবিত্রতা সিফাতে ইলাহীর স্তরসমূহের মধ্য থেকে সেই স্তরের জন্যই উপর হতে উপরের স্তরে উন্নতিপ্রবণ। কেনোনা এই সৃষ্টি জগতের বিশাল প্রান্তর আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর প্রতিবিম্ব মাত্র।

এই সম্ভাব্য বস্তুগুলোর সৃষ্টি হওয়া আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের পূর্ণতার ছায়া ও তার প্রতিফলন। সকল নবী, ওলী এমন কী সারা বিশ্বজগত একত্ববাদের আয়না ও বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

নাত ঃ হজরত মোহাম্মদ স. একক সত্তার পূর্ণ প্রকাশস্থল এবং আহাদিয়াত ও ওয়াহ্‌দিয়াতের মধ্যে মধ্যস্থস্বরূপ। তিনিই ওয়াহ্‌দিয়াত প্রকাশ হওয়ার পাশাপাশি আহাদিয়াত হতে ফয়েজ ও বরকত পৌঁছার ওসীলা বা মাধ্যম। فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى (ফলে তাঁহাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রহিল অথবা উহারও কম। সূরা নাজম আয়াত ৯)। তিনি স. এই মাকামে বা তার চেয়ে উপরের মাকামে উন্নীত হয়েছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর উপর, তাঁর সন্তানগণ, সাহাবীগণ ও সকল নবী-ওলীগণের উপর রহমত অবতীর্ণ করুন। আমিন।

অতঃপর, রচনার কারণঃ জ্ঞানী ও চক্ষুষমানগণ উত্তমভাবে অবগত আছেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা কোরআন মজীদে উল্লেখ করেছেন—

وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ

(তাঁহার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ করো। সূরা মায়িদা, আয়াত ৩৫)। তিনি আরও ঘোষণা করেন—

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۚ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ

(বলো ইহাই আমার পথ, আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আমি আহ্বান করি সজ্ঞানে। আমি এবং আমার অনুসারীগণও। সূরা ইউসুফ, আয়াত ১০৮)। রসূল স.বলেন—

عُلَمَآءُ اُمَّتِيْ كَاَنْبِيَآءِ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

(আমার উম্মতের আলেমগণ (দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে) বনী ইসরাইলের নবীগণের ন্যায়)। তিনি আরও বলেন—

اَلشَّيْخُ فِيْ قَوْمِهٖ كَالنَّبِيِّ فِيْ اُمَّتِهٖ

(কোনো কওমের মোর্শেদ তাদের মাঝে তেমন, যেমন কোনো উম্মতের মাঝে তাদের নবী)।

তিনি স. আরও বলেন— مَنْ لَّاشَيْخَ لَهٗ لَا دِيْنَ لَهٗ (যার কোনো শায়েখ বা পথপ্রদর্শক নেই, তার দ্বীন নেই)। তিনি স. একথাও বলেন যে, مَنْ لَّاشَيْخَ لَهٗ فَشَيْخُهٗ اِبْلِيْسَ (যার কোনো শায়েখ বা পীর-মোর্শেদ নেই তার পীর হলো শয়তান)।

অতএব আল্লাহ্ অনুসন্ধানকারীর জন্য এমন একজন পীর অত্যাবশ্যক যিনি তাকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা বলে দিবেন। পীর এমন হতে হবে যে, তাঁর সিলসিলা নবী করিম সল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং তিনি নবী স. এর সুন্নতের পূর্ণ অনুসারী। তরিকতের নিয়মে এটাও জরুরী যে, প্রত্যেক সালেক স্বীয় পীর-মোর্শেদ থেকে নবী করিম স. পর্যন্ত পুরো সিলসিলার সনদ সম্পর্কে অবগত থাকবে। আর তরিকতের একটি মূলনীতি হলো, মুরিদ তার নিজ সিলসিলার পীরগণের জীবনধারা, তরিকা, তাঁদের কথা, অবস্থা, স্তরসমূহ ও তাঁদের কারামতসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে। যাতে করে রসূলুল্লাহ স. এর দরবার হতে যে সকল নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে, সেগুলো দ্বারা পীরগণের মধ্যস্থতায় স্তরে স্তরে সকলেই উপকৃত হতে পারে। কেনোনা সিলসিলা বা শিকলের বৈশিষ্ট্য হলো এর একটি কড়া আন্দোলিত হলে এর প্রভাব অন্য কড়াতে গিয়ে পৌঁছে।

এই বর্ণনাটি 'তাসার্‌রুফ' নামক কিতাবের ৮২ পৃষ্ঠায় আল্লামা দায়লামী উল্লেখ করেছেন। তবে হাদিসে মারফু হিশাবে এর কোনো ভিত্তি নেই। আর এটা শুধু সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনার বর্ণনা। আর আল্লামা ইবনে জাওজীও তাঁর 'সাফাওয়াতুস সাফাওয়াত' কিতাবের ভূমিকায় এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এর মূল উপকারিতা হলো বুজর্গানে দ্বীনের ঘটনাবলী একত্রিত করা আর তাবে তাবেঈনের এসকল কথা, কাজ ও মতামত দলিল হিশাবে প্রমাণ করা। বিবরণীতে উল্লেখিত বাণীর (হাদিস) দৃঢ়তা ওই হাদিস থেকে পাওয়া যায়, যা মোহাদ্দেসীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন। যার বর্ণনা আল্লামা দায়লামী তাঁর রচিত 'আত্ তাসাররুফে' ৩৯৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন—

ذِكْرُ الصَّالِحِيْنَ كَفَّارَةٌ لِّلذُّنُوْبِ -

(নেককারগণের গুণাবলী, কার্যাবলী, কৃতিত্বসমূহের আলোচনা দ্বারা গুনাহ্ মাফ হয়)। প্রকাশ্য কথা হলো, আল্লাহ্তায়ালার করুণা ও

মেহেরবানীতে গুনাহ্ মাফ হয়। গ্রন্থকার যে শব্দাবলী এখানে প্রয়োগ করেছেন তা উক্ত হাদিসের যথার্থতা প্রমাণ করে। আল্লাহ্ই এর বিনিময় সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন।

দোয়ার সময় অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে নিজ সিলসিলার বুজর্গগণের নাম স্মরণ করা প্রকৃত মুরিদগণের দায়িত্ব। সকল প্রকার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য বিপদ আপদে তাঁদেরকে সুপারিশকারী ও ওসিলা (মধ্যস্থতাকারী) করে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করবে, যেনো তা অতি দ্রুত কবুল হয়।

সাইয়্যেদুত তায়্যিফাহ্ শায়েখ হজরত জুনায়েদ বাগদাদী র. বলেন, পীর-মোর্শেদগণের বাণীসমূহ পড়া, লেখা ও শোনার মধ্যে মুরিদগণের জন্য অনেক কল্যাণ রয়েছে। এর কোনো অন্ত নেই। তাঁদের কথা আল্লাহ্র বাহিনীসমূহ হতে একটি বাহিনী। মুরিদ যখন সব দিক থেকে নিরাশ হয়ে আল্লাহ্র বাহিনীর সাহায্যের প্রতি আশান্বিত হয়, তখন সে তার কাজে ভালোভাবে লিপ্ত হতে পারে। তার অন্তর্চক্ষু খুলে যায়, মনে প্রফুল্লতা আসে এবং অহংকার হতে পবিত্রতা লাভ করে।

আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীব স. কে বলেন,

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِۦ فُؤَادَكَ -

(রসূলদের ওই সকল বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি, যদ্দ্বারা আমি তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি। সূরা হুদ আয়াত ১২০)। রসূল স. বলেন, নেককারগণের আলোচনাকালে রহমত অবতীর্ণ হয়। তাই এ ব্যাপারে উম্মতে মোহাম্মদীর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, তাফসীর ও হাদিসের পরে বুজর্গানে দ্বীনের কথাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কথা।

বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি স্বীয় সিলসিলার পীরগণের অবস্থা, বাণী, স্তর ও কারামতসমূহ লিপিবদ্ধ করবে তার আমলনামায় প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে ৭০ সত্তরটি করে সওয়াব লেখা হবে। তাই এ অধম (বদরুদ্দীন ইবনে শায়েখ ইব্রাহীম সেরহিন্দী) সিলসিলায়ে নকশ্বন্দিয়ার পীরানে কেরামের স্তরসমূহ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমনভাবে সংকলন করেছেন, যেভাবে সংকলনের তাওফিক এখন পর্যন্ত কেউ পায়নি। এ গ্রন্থের নাম 'হাজ্রাতুল কুদুস' রাখলাম। আল্লাহ্তায়ালাই সাহায্যকারী এবং নির্ভরতা তাঁরই ওপর।

সাজরায়ে খানদানে আলিয়া নক্‌শবন্দিয়া

প্রকাশ থাকে যে, হজরত পীর ও মোর্শেদ শায়খুল ইসলাম কুতুবুল আনাম সায়্যিদুল মুহাক্কিকীন হুজ্জাতুল মুতাআখ্খিরীন অনাদি ভাণ্ডারের সংগ্রহকারী ও অনন্ত ভাণ্ডারের বণ্টনকারী নায়েবে রসূল স. আল্লাহ্‌র বন্ধুর উত্তরাধীকারী আমাদের শায়েখ ও ইমাম শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী কুদ্দিসা সিররুহু গাউসে আলম হজরত খাজা মোহাম্মদ বাকী কাবুলী কুদ্দিসা সিররুহুর খলিফা। তিনি বংশগতভাবে কুরায়শী। কাবুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং দিল্লী এসে বসতি স্থাপন করেন এবং তিনি হজরত মাওলানা খাজেগী আমকাংগী কুদ্দিসা সিররুহুর খলিফা। তিনি আপন পিতা মহোদয় হজরত মাওলানা দরবেশ মোহাম্মদ কুদ্দিসা সিররুহুর খলিফা। তিনি তাঁর খালু হজরত মাওলানা মোহাম্মদ জাহেদ ওয়াখশী কুদ্দিসা সিররুহুর খলিফা। তিনি খাজা উবায়দুল্লাহ আহরাব কুদ্দিসা সিররুহুর খলিফা। তিনি মাওলানা ইয়াকুব চরখী কুদ্দিসা সিররুহুর খলিফা। তিনি কুতুবুল আকতাব হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশ্‌বন্দি কুদ্দিসা সিররুহুর খলিফা। তিনি হজরত আমীর কুলাল কুদ্দিসা সিররুহুর খলিফা। তিনি হজরত খাজা বাবা সাম্‌মাসী কুদ্দিসা সিররুহুর খলিফা। তিনি হজরত খাজা আজিজানে আলী রামিতিনি ওরফে হজরত আঁযীযা কুদ্দিসা সিররুহুর খলিফা। আর তিনি হজরত খাজা মাহমুদ আঞ্জির ফাগনবী কুদ্দিসা সিররুহুর খলিফা। তিনি হজরত খাজা আরেফ রেওগাড়ী কুদ্দিসা সিররুহুর খলিফা। তিনি হজরত খাজা আবদুল খালেক গাজদাওয়ানী কুদ্দিসা সিররুহুর খলিফা এবং তিনি হজরত খাজা আবু ইউসুফ হামাদানী কুদ্দিসা সিররুহুর খলিফা। তিনি হজরত শায়েখ আবু আলী ফারমেদী কুদ্দিসা সিররুহুর খলিফা। তিনি হজরত শায়েখ আবুল হাসান খেরকানী কুদ্দিসা সিররুহুর খলিফা।

অনেকে বলেন, হজরত শায়েখ আবুল হাসান খেরকানীর সাথে খাজা আবু ইউসুফ হামাদানীর সরাসরি সম্পর্ক ছিলো। আবার কেউ একথা বলেন যে, শায়েখ আবু আলী ফারমেদীর সম্পর্ক ছিলো শায়েখ আবুল কাশেম গুরগানীর সাথে। তাঁর সম্পর্ক ছিলো শায়েখ আবুল হাসান খেরকানীর সাথে। তাঁর সম্পর্ক ছিলো সুলতানুল আরেফীন হজরত শায়েখ বায়েজীদ বোস্তামীর রুহানিয়াতের সাথে। তাঁর সম্পর্ক ছিলো হজরত ইমাম জাফর সাদেক কুদ্দিসা সিররুহুর রূহানিয়াতের সাথে। তাঁর সম্পর্ক ছিলো ইমাম কাসেম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর র. এর সাথে। তাঁর সম্পর্ক

ছিলো হজরত সালমান ফারসী রা. এর সাথে। তাঁর সম্পর্ক ছিলো আমীরুল মুমিনীন হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর সংগে।

হজরত খাজা আবুল খায়ের ফজলুল্লাহ বিন রোযবাহান ওরফে খাজা মাওলানা ইস্পাহানী কর্তৃক রচিত শরহে ওয়াসায়ায়ে খাজা আবদুল খালেক গাজদাওয়ানী কুদ্দিসা সিররুহু নামক গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ রয়েছে যে, খাজা আবদুল খালেক গাজদওয়ানীর পীরে তালিম ছিলেন হজরত খাজা খিজির আ. এবং তাঁর পীরে খেরকা ছিলেন হজরত খাজা ইউসুফ হামদানী এবং তাঁর পীর শায়েখ আবুল হাসান খেরকানী আর তাঁর পীর কয়েক মাধ্যমে শায়েখ বায়েজীদ বোস্তামী র. ও তাঁর পীর ইমাম জাফর সাদেক র.। আর তাঁর পীর স্বীয় সম্মানিত পিতা ইমাম বাকের র. এবং তাঁর পীর তাঁর সম্মানিত পিতা ইমাম জয়নুল আবেদীন র. এবং তাঁর পীর তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা ইমাম হোসেন রা. এবং তাঁর পীর স্বীয় পিতা আমিরুল মুমিনীন হজরত আলী রা. তাঁর পীর হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.।

'ছামরায়ে শাজারাহ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, হজরত আলী রা. এর সাথে রসূলুল্লাহ স. এর যেরূপ নেসবত (সম্পর্ক) ছিলো সেরূপ তাঁর পূর্ববর্তী তিন খলিফার সাথেও তাঁর নেসবত বিদ্যমান ছিলো। এ ব্যাপারে বিজ্ঞ আলেমগণের ঐকমত্য রয়েছে। হজরত আলী রা. বাতেনী তরবিয়ত তিন খলিফার নিকট থেকে লাভ করেছেন। পাশাপাশি হজরত ওসমান রা. এর সাথে তাঁর নেসবত ছিলো। আর হজরত ওসমান রা. এর নেসবত ছিলো হজরত ওমর ফারুক রা. এর সাথে। আর হজরত ওমর ফারুক রা. এর নেসবত ছিলো হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর সাথে। প্রকৃতপক্ষে সকল সিলসিলার সম্পর্ক ছিলো হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. এর সাথে। আর এই নকশ্‌বন্দিয়া আলিয়ার সিলসিলা ও অন্যান্য তরিকার সিলসিলা হজরত আলী রা. পর্যন্ত পৌঁছেছে।

১. হজরত সালমান ফারসী রা. এর নেসবত রসূলুল্লাহ স. এর ওফাতের পরে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর সাথে যেরূপ ছিলো তদ্রূপ হজরত আলী রা. এর সাথেও কায়েম (বিদ্যমান) ছিলো।

২. ইমাম জাফর সাদেক র. এর সম্পর্ক আপন নানা ইমাম কাসেম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবু বকরের সাথে যেরূপ ছিলো, তদ্রূপ স্বীয় পিতা ইমাম মোহাম্মদ বাকেরের সাথেও ছিলো। আর তাঁর সম্পর্ক ছিলো আপন

পিতা ইমাম জয়নুল আবেদীনের সাথে। তাঁর সম্পর্ক ছিলো আপন পিতা ইমাম হোসেন রা. এর সাথে। তাঁর সম্পর্ক ছিলো তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা হজরত আলী রা. এর সাথে।

৩. ইমাম কাসেম ইবনে মোহাম্মদ এর নেসবত ইমাম জয়নুল আবেদীনের সাথে, আর তাঁর নেসবত ছিলো স্বীয় পিতা ইমাম হোসেনের সাথে। তাঁর নেসবত ছিলো নিজ পিতা হজরত আলী রা. এর সাথে।

৪. শায়েখ আবুল কাসেম গুরগানী তুসীর সম্পর্ক ছিলো শায়েখ আবু ওসমান মাগরিবীর সাথে। তাঁর সম্পর্ক ছিলো শায়েখ আবু আলী কাতেবের সাথে। তাঁর সম্পর্ক ছিলো আবু আলী রুদবারীর সাথে। তাঁর সম্পর্ক ছিলো জুনায়েদ বাগদাদীর সাথে। তাঁর সম্পর্ক ছিলো সেররি সাকতীর সাথে। তাঁর নেসবত ছিলো হজরত মারুফ কারখীর সাথে। তাঁর নেসবত ছিলো ইমাম আলী মূসা রেজার সাথে। তাঁর নেসবত ইমাম মূসা কাজেমের সাথে। তাঁর সম্পর্ক ছিলো ইমাম জাফর সাদেক র. এর সাথে। তাঁর সম্পর্ক ইমাম জয়নুল আবেদীনের সাথে। তাঁর সম্পর্ক ইমাম হোসেনের সাথে। তাঁর সম্পর্ক হজরত আলী রা. সাথে। আর হজরত আলী রা. এর নেসবত ছিলো স্বয়ং রসূলুল্লাহ স. এর সাথে।

৫. তাছাড়া মারুফ কারখীর নেসবত ছিলো দাউদ তায়ীর সাথে। তাঁর নেসবত ছিলো হজরত হাবীব আজমীর সাথে। তাঁর নেসবত ছিলো হজরত হাসান বসরীর সাথে। তাঁর নেসবত ছিলো আমিরুল মুমিনীন হাসান ইবনে আলী রা. এর সাথে। আর আলী রা. এর নেসবত ছিলো রসূলুল্লাহ স. এর সাথে।

হজরত হাসান বসরী র. সরাসরি হজরত আলী রা. এর মুরিদ ছিলেন না, তবে বাস্তবতার বিপরীত এই কথাটি প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। মূলতঃ হাসান বসরী র. হাসান ইবনে আলী রা. এর মুরিদ ছিলেন। 'তাজকিরাতুল আউলিয়া'র এ মতটিকেই সঠিক বলা হয়েছে। তবে উক্ত গ্রন্থে এ কথাটিও রয়েছে যে, হাসান বসরী র. হজরত আলী রা. এর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। এ সকল বর্ণনা আমরা উল্লেখ করলাম যাতে করে মুরিদগণের জন্য স্মরণ রাখা সহজ হয়।

আমিরুল মুমিনীন হজরত আলী রা. এর সাথে হাসান বসরীর সাক্ষাতের ঘটনা এরূপ— হজরত আলী রা. উটের লাগাম নিজ কোমরে বেঁধে বসরায় আগমন করেন এবং তিন দিন অবস্থান করেন। তিনি আদেশ

দেন মিম্বারগুলো ভেঙে দাও এবং ওয়াজকারীদের ওয়াজ করতে নিষেধ করে দাও। অতঃপর তিনি হাসান বসরীর মজলিশে তসরীফ নিলেন এবং তাঁকে প্রশ্ন করলেন তুমি কি আলেম? না মুতাআল্লিম (শিক্ষক বা শিক্ষার্থী) তিনি উত্তর করলেন, আমি দু'জনের একজনও নই। তবে রসূল স. এর যে সকল হাদিস আমার নিকট পৌঁছেছে আমি সেগুলো মানুষের নিকট পৌঁছে দেই। এ কথা শুনে আলী রা. তাঁকে ওয়াজ করার অনুমতি দেন এবং বলেন, হে যুবক! তুমি সুন্দর জবাব দিয়েছো। অতঃপর তিনি চলে যান। হাসান বসরী র. তাঁকে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা চিনতে পেরে তাঁর খোঁজে বের হলেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। সাক্ষাতে হাসান বসরী বললেন, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আপনি আমাকে ওজু শিক্ষা দিন। হজরত আলী রা. পানি আনালেন এবং হাসান বসরী র. কে ওজু শেখালেন।

এ ছাড়া খাজা আরেফ রেওগাড়ীর নেসবত ছিলো খাজা মোহাম্মদ মা'শুকের সাথে, তাঁর নেসবত ছিলো খাজায়ে মাওয়ারাউন্নাহারের সাথে, তাঁর নেসবত ছিলো খাজা আবুল হাসান খেরকানীর সাথে, তাঁর নেসবত ছিলো আবুল মোজাফফর মওলানা তব্‌ক তূসীর সাথে। তাঁর নেসবত ছিলো খাজা আরাবী বায়েজীদ এশকীর সাথে। তাঁর নেসবত ছিলো খাজা মোহাম্মদ মাগরেবীর সাথে। তাঁর নেসবত ছিলো সুলতানুল আরেফীন শায়েখ বায়েজীদ বোস্তামী র. এর সাথে। এরূপ পরম্পরা শেষ পর্যন্ত রয়েছে।

কতিপয় বন্ধু এই পবিত্র পরম্পরাকে কাব্যিক রূপ দান করেছেন। যাতে মুরিদগণ সহজে মুখস্ত করে নিতে পারেন।

চার খলিফার গুণাবলী ও মর্যাদা

চার খলিফার গুণাবলী ও মর্যাদা সম্পর্কে যেসব আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ও হাদিস বর্ণিত হয়েছে, প্রথমে সেগুলো উল্লেখ করা হলো। অতঃপর প্রত্যেকের মর্যাদা সম্পর্কে পৃথক পৃথক হাদিসগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ে উল্লেখ করা হবে। অতঃপর নকশ্‌বন্দিয়া সিলসিলার মাশায়েখদের হালাতসমূহ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হবে। আয়াত ও হাদিসসমূহ অর্থসহ উদ্ধৃত করা হবে।

১. রসূলে পাক স. বলেন, নিশ্চয় মহান আল্লাহ্‌ নবীগণের পরে আমার সাহাবীদেরকে জগদ্বাসীর উপর মর্যাদা দান করেছেন। আবার সাহাবীদের মধ্যে চারজনকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন। তাঁরা হলেন— আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম।

এই হাদিসের প্রবক্তা হজরত আনাস রা. থেকে সামান্য মতপার্থক্যের সাথে সংকলন করেছেন। 'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৬৩ পৃষ্ঠা থেকে হাদিসটি সংকলন করা হয়।

২. নবী করীম স. বলেন, আল্লাহ্তায়ালা আবু বকরকে আমার পিতা (শ্বশুর)রূপে, ওমরকে আমার পরামর্শদাতা, ওসমানকে আমার অবলম্বন এবং আলীকে আমার সহায়তাকারীরূপে মনোনীত করেছেন।

এই হাদিসটি দায়লামী তাঁর 'দিমানুন ফেরদাউস' গ্রন্থে হজরত সালমান ফারসী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩. রসূল স. ইরশাদ করেন, আল্লাহ্তায়ালা চার ব্যক্তি সম্পর্কে লাওহে মাহফুজে দৃঢ় অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছেন। ইমানদার ছাড়া কেউ তাঁদেরকে ভালোবাসবে না। পাপিষ্ঠ ছাড়া কেউ তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে না। তাঁরা আমার নবুওয়াতের খলিফা। আমার দ্বীনের বাহু, আমার উম্মতের পবিত্রতা ও আমার ইলমের খনি। তাঁদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট কোরো না, তাঁদেরকে হিংসা কোরো না।

হাদিসটি ইবনে আসাকির হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে উল্লেখ করেন। মুনতাখাবুল কানয্ ৫ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৬৩।

শায়েখ আবু তালেব মক্কী র. তাঁর 'কুতুল কুলূব' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, প্রত্যেক যুগের কুতুব কিয়ামত পর্যন্ত নিজ মর্যাদা ও মাকামে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর স্থলাভিষিক্ত থাকবেন। আর তিন আওতাদ অবশিষ্ট তিন খলিফার স্থলাভিষিক্ত থাকবেন। অর্থাৎ আমিরুল মুমিনিন হজরত ওমর ফারুক রা., হজরত ওসমান জুন্নুরাইন রা. ও আমিরুল মুমিনিন হজরত আলী রা.। আওতাদগণ কুতুবের নিচের স্তরের হয়ে থাকেন। তাঁদের কাজকর্ম, তাঁদের গুণাবলী, অবস্থা ও ইয়াকীন অনুযায়ী হয়ে থাকেন। বাকী ছয়জন সিদ্দিক, যাঁদের অবস্থা এমন— তাঁদের বরকতেই পৃথিবী কায়েম থাকে, পৃথিবীবাসীদের বিপদ আপদ দূরীভূত হয় এবং তাঁদের বরকতেই রিজিক দান করা হয় ও বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়।

তাঁরা সকল যুগে আশারায়ে মুবাশ্শারার অবশিষ্ট ছয়জন সাহাবীর স্থলাভিষিক্ত।

এই বর্ণনায় প্রবন্ধকার তিনটি হাদিসকে একত্রে বর্ণনা করেছেন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য। যা আল্লামা সুয়ূতি রচিত 'জামেউস্ সগীর' নামক কিতাবের ১২১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে।

৪. রসূল স. বলেন, আবু বকর আমার উজীর এবং আমার পরে উম্মতের মধ্যে আমার স্থলাভিষিক্ত। ওমর আমার বন্ধু। ওসমান আমার থেকে, আলী আমার ভাই ও আমার পতাকাবাহী।

এ হাদিসটি তিরমিজি সামান্য শাব্দিক মতপার্থক্যের সাথে হজরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে সংকলন করেন এবং কানয্ নামক কিতাবের ৫মে খণ্ডের ৬২, ৬৩ পৃষ্ঠায় সামান্য পার্থক্যের সাথে হজরত আনাস রা. হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেন।

৫. রসূল স. বলেন, মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো অন্তরে এই চার ব্যক্তির ভালোবাসা একত্রিত হয় না। তাঁরা হলেন আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী। কানয্ নামক কিতাবের রচয়িতা ইবনে আসাকিরের বরাত দিয়ে হজরত আনাস রা. থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেন।

৬. আবু বকর আমার চোখের জ্যোতি, ওমর আমার ভাষায় কথা বলে। ওসমান আমার রূহ, যা থাকে দেহের ভিতরে। আলী আমার থেকে আর আমি আলী থেকে। এ হাদিসটি ইবনে খতিব তিরমিজি থেকে উল্লেখ করেন।

৭. রসূল স. আরও বলেন, আমি সত্যবাদিতার শহর। আর আবু বকর তার ছাদ। আমি দৃঢ়তার শহর আর ওমর তার খুঁটি। আমি লজ্জাশীলতার শহর, ওসমান তার প্রাচীর। আমি জ্ঞানের শহর আর আলী এর তোরণ।

আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ূতী র. তাঁর 'আল আলাইয়া মাসনূআহ' নামক কিতাবের মানাকিব অধ্যায়ে উল্লেখ করেন, হজরত রসূল স. বলেন, আমি জ্ঞানের শহর, আর আবু বকর তার ভিত্তি, ওমর এর প্রাচীর, ওসমান এর ছাদ, আলী এর দরজা। প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৩৬।

৮. রসূল স. বলেন, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্তায়ালা আমার গোটা উম্মতকে আমার কবরের কাছে সমবেত করবেন। সিদ্দিকগণকে হজরত আবু বকরের সাথে এবং তারা তাঁর সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সৎকাজের আদেশকারীদেরকে ওমরের সাথে, লজ্জাশীলদেরকে ওসমানের সাথে, দানশীল ও অনুপম চরিত্রের অধিকারীদেরকে আলীর সাথে, আলেমদেরকে মুয়াজ ইবনে জাবালের সাথে, ক্বারীদেরকে উবাই ইবনে কাবের সাথে, দরিদ্রদেরকে আবু দারদার সাথে, সংসার বিরাগীদেরকে আবু যর গিফারীর সাথে, শহীদগণকে হামযার সাথে, মুয়াজ্জিনদেরকে বেলালের সাথে। অতঃপর তারা সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্তায়ালা

আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিশাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। রসূল স. এরশাদ করেন, আমার দশজন সাহাবী জান্নাতী। আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, তালহা, যোবায়ের, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ এবং সাঈদ ইবনে যায়েদ (তিরমিজি, ইবনে মাজা, নাসাঈ, মেশকাত হজ অধ্যায়)। আল্লাহ্তায়ালা ইরশাদ করেন—

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

(আল্লাহ্ তো মুমিনগণের উপর সন্তুষ্ট হইলেন, যখন তাহারা বৃক্ষস্থলে তোমার নিকট বায়আত গ্রহণ করছিলো। সূরা ফাতাহ্ আয়াত ১৮)।

মহান আল্লাহ্তায়ালা চার সাহাবীর আলোচনা কোরআনুল কারীমের বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে কয়েকটি আয়াত তুলে ধরা হলো—

اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ -

(তাহারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থী। সূরা আলে ইমরান আয়াত ১৭)। তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতে ধৈর্যশীল বলে স্বয়ং নবী করীম স. উদ্দেশ্য, সত্যবাদী বলে হজরত আবু বকর, অনুগত বলে হজরত ওমর, ব্যয়কারী বলে হজরত ওসমান জুন্নূরাইন এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী বলে হজরত আলী রা.কে বুঝানো হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ্তায়ালা বলেন—

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ
بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا -

(মোহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল, তাহার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল, আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাহাদিগকে রুকু ও সেজদায় অবনত দেখিবে। সূরা ফাতাহ্ আয়াত ২৯)। মোহাম্মদ স. আল্লাহ্র রসূল। তাঁর সাথী বলে বুঝানো হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. আর কাফিরদের প্রতি কঠোর বলে ওমর ফারুক রা. উদ্দেশ্য। আর তাদের প্রতি দয়ালু মেহেরবান বলে

ওসমান রা.কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদাকারী অর্থাৎ অনুগত দেখতে পাবেন। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন—

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ

النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا

(আর কেহ আল্লাহ্ এবং রসূলের আনুগত্য করিলে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ — যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন— তাহাদের সংগী হইবে এবং তাহারা কত উত্তম সংগী! সূরা নিসা আয়াত ৬৯)। এখানে নবীগণ বলে হজরত মোহাম্মদ স. আর সত্যনিষ্ঠ বলে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা., শহীদ বলে হজরত ফারুকে আজম ওমর রা., সৎকর্মপরায়ণ বলে হজরত ওসমান গনী রা., আর উত্তম বন্ধু বলে হজরত আলী রা. উদ্দেশ্য।

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ -

(তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্ তাঁহার রসূল ও মুমিনগণ যাহারা বিনত হইয়া সালাত কায়েম করে ও জাকাত দেয়। সূরা মায়েদা আয়াত ৫৫)।

এখানে বন্ধু বলে বুঝানো হয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালা এবং তাঁর রসূল হজরত মোহাম্মদ স. কে, আর যারা ইমান এনেছে বলে বুঝানো হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.কে। যারা নামাজ কায়েম করে বলে বুঝানো হয়েছে হজরত ওমর ফারুক রা.কে, যারা জাকাত দেয় বলে বুঝানো হয়েছে হজরত ওসমান জুন্‌নূরাইন রা.কে, আর রুকুকারী বলে বুঝানো হয়েছে হজরত আলী রা.কে। আল্লাহ্‌তায়ালা আরও বলেন—

فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ

وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ

(তাহারা ওই সকল লোক যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন তাঁহারা হইলেন নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্ম পরায়ণ। সূরা নিসা

আয়াত ৬৯)। তারা ওই সকল লোক যাদের উপর আল্লাহ্ অনুকম্পা, দয়া, অনুগ্রহ করেছেন, তাঁরা হলেন নবী অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ স.। সত্যনিষ্ঠ অর্থ হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. ও শহীদগণ অর্থ ওই তিন খলিফা, যাঁরা শাহাদতবরণ করেছেন। যথা— হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত আলী রা. এবং সৎকর্মপরায়ণ অর্থ সকল সাহাবায়ে কেরাম। আল্লাহ্তায়ালা আরও বলেন—

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ -

(যাহারা অদৃশ্যে ইমান আনে, সালাত কায়েম করে ও তাহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে এবং তোমার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে যাহারা ইমান আনে। সূরা বাকারা আয়াত ৩, ৪)।

যারা অদৃশ্যের উপর ইমান এনেছে অর্থ হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.। তিনি বয়স্কদের মধ্যে প্রথম ইমান গ্রহণকারী। যারা নামাজ কায়েম করে অর্থ হজরত ওমর ফারুক রা. আর আমি যা প্রদান করেছি তা থেকে যারা ব্যয় করে অর্থ হজরত ওসমান গনী রা. আর যা আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি যারা ইমান এনেছে অর্থ হজরত আলী রা. যিনি যুবকদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।

অধমের মাথায় এসেছে যে, হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর ইসলাম গ্রহণের অবস্থাটিও এ আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যশীল। কেনোনা তিনি কোনো প্রকার মোজেজা দেখা ব্যতীরেকেই নূরে বাতেনী তথা অভ্যন্তরীণ বিচক্ষণতার আলোকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম মোজেজা দেখার পর চিন্তা-ভাবনা করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মহান আল্লাহ্তায়ালা এ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

আল্লাহ্তায়ালা আরও এরশাদ করেন—

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ...وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا -

(আল্লাহ্প্রেমে অর্থ ব্যয় করে .... সালাত কায়েম করে ও জাকাত প্রদান করে এবং প্রতিশ্রুতি পূরণ করে। সূরা বাকারা আয়াত ১৭৭)।

এখানে আল্লাহ্প্রেমে অর্থ ব্যয়কারী দ্বারা উদ্দেশ্য হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা., নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী দ্বারা উদ্দেশ্য হজরত ওমর ফারুক রা., জাকাত প্রদানকারী বলে উদ্দেশ্য হজরত ওসমান জুন্নূরাইন রা., আর প্রতিশ্রুতি পূরণকারী বলে উদ্দেশ্য হজরত আলী মুরতজা রা.।

আল্লাহ্তায়ালা আরও বলেন—

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

(যাহারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদিগকে ভালোবাসেন। সূরা আলে ইমরান আয়াত ১৩৪)। এখানে সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয়কারী বলে হজরত আবু বকর সিদ্দিককে বুঝানো হয়েছে। আর 'ক্রোধ সংবরণকারী' বলে হজরত ওমর ফারুক রা. এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল বলে হজরত ওসমান জুন্নূরাইন রা. আর সৎকর্মপরায়ণ বলে হজরত আলী রা.কে বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ্ আরও বলেন—

وَالْعَصْرِ ۙ﴿۱﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ﴿۲﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ۬ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾

(কালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু উহারা নহে যাহারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়। সুরা আসর. আয়াত ১-৩)। এখানে 'মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত' এর দ্বারা উদ্দেশ্য আবু জাহেল। যারা ইমান এনেছে দ্বারা উদ্দেশ্য হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.। যারা সৎকর্ম করে দ্বারা উদ্দেশ্য হজরত ওমর রা.। যারা সত্যের উপদেশ দেয় দ্বারা উদ্দেশ্য হজরত ওসমান রা.। যারা ধৈর্যের উপদেশ দেয় দ্বারা উদ্দেশ্য হজরত আলী রা.।

নবী করীম স. বলেন, আমার সাহাবীদের মন্দ বোলো না, কেনোনা তারা আল্লাহ্র ভয়ে ইমান এনেছে আর অন্যান্য মানুষ তরবারীর ভয়ে ইমান এনেছে।

তিরমিজি হজরত ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিবরানী সামান্য পার্থক্যের সাথে ইবনে আব্বাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আমিরুল মুমিনিন হজরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু যখন খেলাফতে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং মিম্বরে তশরিফ আনলেন তখন প্রাঞ্জল ও অলংকারশাস্ত্রসম্বলিত ভাষায় ভাষণ দিলেন। মহান আল্লাহ্র স্তব-স্তুতি এবং মহানবী স. এর উপর দরূদ পাঠের পর বললেন, হে মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ! জেনে রাখো, মহানবী স. এর পর মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম হজরত আবু বকর সিদ্দিক, তারপর ওমর, তারপর ওসমান। যারা তাঁদেরকে মন্দ বলবে বা তাঁদের উপর মিথ্যারোপ করবে তাদের উপর আল্লাহ্, রসূল, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিসম্পাত।

মোহাম্মদ হানাফিয়া বলেন, একদা আমি আমার পিতা আমিরুল মুমিনিন হজরত আলী রা.কে জিজ্ঞেস করলাম রসূল স. এর পর সকল মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম কে? তিনি জবাব দিলেন, আবু বকর। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি জবাব দিলেন, ওমর। আমি আবার বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, ওসমান। আমি বললাম, হে আমিরুল মুমিনিন! তারপর আপনি। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দা।

ইমাম বোখারী হাদিসটি মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। মূল কথা হলো, তিন খলিফার পর হজরত আলী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কিন্তু অতি বিনয়ের খাতিরে তিনি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করেননি।

প্রথম খলিফা আমিরুল মুমিনীন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. মহানবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রথম খলিফা ছিলেন। তিনি জাহেরী ও বাতেনী এলেম রসূল স. এর নিকট থেকেই গ্রহণ করেন। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর বংশপরম্পরা মহানবী স. এর সাথে মিলিত হয়েছে মুররা ইবনে কাব পর্যন্ত গিয়ে।

বংশপরম্পরা নিম্নরূপ ঃ

১. হজরত আবু বকর বিন আবু কুহাফা বিন ওসমান বিন আমের বিন কাব বিন সাদ বিন তাঈম বিন মুররা। তাঁর মাতার নাম সালমা উপনাম উম্মুল খায়র বিনতে সখর বিন আমর। জন্ম— হাতীর বৎসর থেকে দুই বছর চার মাস থেকে কয়েক দিন কম। রসূলুল্লাহ স. এরশাদ করেন—

مَا صَبَّ اللهُ فِيْ صَدْرِ شَيْئًا اِلَّا صَبَبْتُهُ صَدْرِ اَبِيْ بَكْرٍ-

(আল্লাহ্‌তায়ালা আমার বক্ষে যা প্রক্ষেপ করেছেন, আমি তা আবু বকরের বক্ষে ঢেলে দিয়েছি)।

হাদিসটি হাকেম তাঁর 'মুসতাদরাক' নামক গ্রন্থে হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

২. হজরত মোহাম্মদ স. বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুতালিব বিন হিসাম বিন আবদে মানাফ বিন কুসায়ী বিন কিলাব বিন মুররা।

রসূল স.তাঁর জীবনসায়াহ্নে এক ভাষণে বলেন—

মহাপরাক্রমাধিকারী আল্লাহ্ তোমাদের সাথীকে খলিল-হাবীব নির্বাচিত করেছেন। আমি যদি আমার প্রভুপালক ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু বানাতাম তাহলে আবু বকরকে বানাতাম। কিন্তু তিনি আমার দ্বীনের সাথী। আমি তাকে আমার গুহার (গারে সওর) সাথী নির্বাচন করেছি এবং তিনি আমার উম্মতের খলিফা। হাদিসটি বিভিন্ন সনদে মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বোখারী ও মুসলিম হজরত আবু সাঈদ খুদরী রা., জুবাইর ইবনে আওয়াম রা. ও ইবনে আব্বাস রা. থেকে। ইমাম তিরমিজি হজরত ইবনে ওমর রা. থেকে। ইমাম আহমদ হজরত যোবায়ের থেকে। আর সামান্য পরিবর্তন করে বর্ণনা করেছেন আবু ইয়ালা। মেশকাত ও তরিখুল খুলাফায় এর সমর্থনে হাদিস পাওয়া যায়।

অন্যত্র তিনি এরশাদ করেন—

নিশ্চয় মহাশক্তিধর আল্লাহ্ ইব্রাহীমকে খলিল এবং মূসাকে নাজী এবং আমাকে হাবীব নির্বাচিত করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেন, আমার ইজ্জত ও জালালের শপথ! নিশ্চয়ই আমার হাবীবকে খলিল ও নাজীর উপর প্রধান্য দিবো। হাদিসটি হাকেম তিরমিজিতে এবং তিবরানী কাবীরে উল্লেখ করেছেন। দায়লামী এবং ইবনে আসাকের হজরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম সুয়ূতী র. এর 'তা'কিবাতের' 'মানাকিব' অধ্যায়ে হাদিসটি বিদ্যমান।

জ্ঞানী ও গবেষকগণ এই দুই হাদিসের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— খুল্লাত তথা বন্ধুত্বের মাকাম দুটি— ১. প্রেমিকত্বের শেষ সীমানা। এ মাকামই দ্বিতীয় হাদিসের উদ্দেশ্য। ২. প্রেমাস্পদত্বের শেষ সীমানা। প্রথম

হাদিসে এই মাকামের কথাই বলা হয়েছে, যে মাকামে রসূল স. এর সাথে আর কেউ শরীক নেই। এই মাকামই মাকামে মাহমুদ। এখানে এই মাকামেরই সর্বশেষ সীমার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

রসূল স. এরশাদ করেন, কেউ আমার এই বিশেষ মাকামে শরীক হলে আবু বকরই শরীক হতো। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এলমে বাতেন ও বিশেষ জ্ঞানের কারণে এ উম্মতের ওলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলেম। নবীগণের পর সকল সিদ্দিকগণের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ। মনীষীগণ এ ব্যাপারে একমত।

রসূল স. এরশাদ করেন—

وَاللهِ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَىٰ اَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ عَلَىٰ اَفْضَلِ مِنْ اَبِىْ بَكْرٍ

(আল্লাহ্‌র শপথ! নবী-রসূলগণের পর আবু বকর ব্যতীত কোনো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপর সূর্য উদিত ও অস্তমিত হয়নি)।

রসূল স. আরও বলেন, আমি আবু বকরকে তোমাদের চেয়ে উত্তম জানি তার নামাজ রোজার কারণে নয় বরং ওই বস্তুর কারণে যা তার বক্ষে বিদ্যমান।

আমাদের খাজা সাহেব লিখেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর সুলুক (পরিভ্রমণ) ঊর্ধ্বজগতের সুলুকের সাথে সম্পৃক্ত। হজরত আলী রা.ও এর সাথে সম্পৃক্ত। এই সূক্ষ্ম বিষয়টি তিনি তাঁর নিজস্ব ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, তোমরা আমাকে আকাশের রাস্তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো, কেনোনা আমি পৃথিবীর রাস্তার তুলনায় আকাশের রাস্তা সম্পর্কে অধিক অবগত। এই সুলুক বা পরিভ্রমণ ঊর্ধ্বজগতের পরিভ্রমণের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ সায়েরে আনফুসী তথা আত্মিক পরিভ্রমণের সাথে। এ সুলুকের উপমা হচ্ছে জয্‌বার (প্রেমাকর্ষণের) গৃহ ভেদ করে অদৃশ্যের যাত পর্যন্ত রাস্তা তৈরী করা। এ পথেই সম্মুখে অগ্রসর হতে হয়। মহানবী স. এ রাস্তা দিয়েই সর্বশীর্ষ মাকামে স্থিত হয়েছিলেন। উঁচু স্তরের সুলুক যা সায়েরে আফাকীর সাথে সংশ্লিষ্ট তা মহানবী স. থেকে উৎসারিত। আর এ পথটি হজরত আলী রা. এর সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। অবশিষ্ট তিন খলিফা অন্য পথে আলেমুল গায়েব তথা অদৃশ্য সত্তা পর্যন্ত পৌঁছেছেন। হজরত আবু

বকর সিদ্দিক রা. এর সুলুকের (পরিভ্রমণের) পথ পূর্বেই জানানো হয়েছে। হজরত ফারুকে আজম এবং হজরত ওসমান জুন্নূরাইনের সুলুকের পথ ভিন্ন ভিন্ন। সালেকগণ এ চার পথেই গন্তব্যস্থলে উপনীত হয়ে থাকেন। আর হজরত আলী রা. এর সুলুকের (পরিভ্রমণের) পথ তো সুপ্রসিদ্ধ। অধিকাংশ সালেক এ পথেই গন্তব্যস্থলে উপনীত হয়েছেন। নক্শবন্দী বুজর্গগণের সিলসিলা বিশেষভাবে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর সাথে সম্পৃক্ত। অন্যান্য তরিকার মাশায়েখগণও সিদ্দিকিয়া তরিকায় রাস্তা অতিক্রম করে সফল হয়েছেন।

এ ফকির (গ্রন্থকার) কিছুসংখ্যক মাশায়েখকে এমন দেখেছেন, যাঁরা ফারুকে আজমের পরিভ্রমণের পথে পরিভ্রমণ করেছেন। হজরত গাউসে আজম আবদুল কাদের জিলানী র. এ পথেই আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছেছেন। হজরত আলী রা. এর তরিকায় বেলায়েতের প্রথম স্তর ফানা-বাকা স্তরে তিনি অনেক উন্নীত হয়েছেন। হজরত আবু সাঈদ কুদ্দিসা সিররুহু ফারুকে আজমের পরিভ্রমণের পথে পথ অতিক্রম করেছেন। পাঠক জ্ঞাত আছেন যে, রসূল স. হজরত ওমর ফারুক রা. সম্পর্কে বলেন—

لَوْ كَانَ بَعْدِىْ نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرُ-

(আমার পর নবী হলে ওমরই নবী হতো)। এ কথায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর মধ্যে নবুয়তের পূর্ণতার গুণাবলী বিদ্যমান ছিলো। হাদিসটি তিরমিজি, আহমদ, আবু ইয়ালা, তিবরানী, বায়হাকী, হাকেম, আবু নাঈম হজরত উকবা বিন আমের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

হজরত মালেক ইবনে উবায়দা রা. বলেন, রসূল স. এর অন্তিম অসুস্থতার সময় এরশাদ করেন, নামাজের ওয়াক্ত হয়েছে কি? উপস্থিতজনেরা বললেন, হ্যাঁ, নামাজের সময় হয়েছে। তিনি বললেন, বেলালকে আজান দিতে বলো এবং আবু বকরকে ইমামতি করতে বলো। একথা বলার পর তিনি স. হুঁশ হারিয়ে ফেলেন। দ্বিতীয় বার হুঁশ ফিরে এলে তিনি স. বললেন, বেলালকে বলো আজান দিতে, আর আবু বকরকে ইমামতি করতে। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল স.! আমার পিতা কোমল হৃদয়ের মানুষ। ইমামতি করলে আপনার স্থানে তাকে দাঁড়াতে হবে। তিনি শঙ্কিত ও বিচলিত হয়ে পড়বেন। সহ্য করতে পারবেন না। আপনি অনুগ্রহ করে অন্য কাউকে আদেশ করুন।

রসূল স. পুনরায় জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। জ্ঞান ফিরলে বললেন, বেলালকে বলো আজান দিতে আর আবু বকরকে ইমামতি করতে। তোমরা নবী ইউসুফের যুগের নারীদের মতো, যারা তাঁকে বিপদে ফেলেছিলো। হজরত আয়েশা রা. বলেন, লোকজন বেলালকে বললে তিনি আজান দিলেন। আবু বকর ইমামতির জন্য সামনে অগ্রসর হলেন। নামাজ শুরু হয়ে গেলো। অতঃপর রসূল স. কিছুটা সুস্থতা অনুভব করলেন। তিনি বললেন, এমন কাউকে ডাকো যার উপর ভর দিয়ে আমি মসজিদে যেতে পারি। হজরত বারিদা রা. এবং অন্য একজন সাহাবী এলেন। তিনি স. তাদের উপর ভর দিয়ে মসজিদে উপস্থিত হলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. রসূল স. এর মহান উপস্থিতি টের পেয়ে পিছনে সরতে চাইলেন। তিনি স. বললেন, আপন স্থানে স্থির থাকো।

ইমাম বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজা হাদিসটি সামান্য শাব্দিক পার্থক্যের সাথে হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন।

সহীহ্ মুসলিম শরীফে এসেছে, রসূল স. হজরত আয়েশা সিদ্দিকাকে বললেন, তুমি তোমার পিতা ও ভাইকে ডাকো। আমি একটি ওসিয়তনামা লিখে দিবো। কেনোনা আমার আশংকা, কোনো আকাঙ্ক্ষাকারী (খেলাফতের) দাবি করতে পারে। আল্লাহ্তায়ালা এবং আমি ও মুমিনগণ আবু বকররের খেলাফত ছাড়া অন্য কারো খেলাফতে খুশি নয়। মুসলিম।

এরপর রসূল স. ইন্তেকাল করেন। হজরত ওমর রা. উন্মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে বললেন, যে বলবে রসূল স. ইন্তেকাল করেছেন, আমি তার শিরশ্ছেদ করবো। এই হাদিসের শেষে রয়েছে, এরপর হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এলেন। রসূল স. এর পবিত্র ললাটে চুমু খেলেন এবং তাঁর স. এর মহান পবিত্র দেহে হাত রেখে পাঠ করলেন—

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ - (তুমি তো মরণশীল এবং উহারাও মরণশীল। সূরা যুমার আয়াত ৩০)।

তাঁর মুখে এই আয়াতের আবৃত্তি শুনে সকলে বুঝতে পারলেন, রসূল স. এই নশ্বর জগত থেকে বিদায় নিয়েছেন।

অন্য হাদিসে এসেছে, হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. রসূল স. এর নিকট থেকে বাইরে এলেন এবং এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন—

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ

(মোহাম্মদ একজন রসূল মাত্র । তাহার পূর্বে বহু রসূল গত হইয়াছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা সে নিহত হয় তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ পদর্শন করিবে? সূরা আলে ইমরান আয়াত ১৪৪)।

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে রসূলের হিজরতের সফরসঙ্গী! আপনি কি রসূল স. এর নামাজে জানাজা আদায় করবেন? সিদ্দিকে আকবর রা. বললেন, হ্যাঁ। একদল এসে তাকবীর বলে নামাজ পড়বে এবং দোয়া করে চলে যাবে। এরপর আরেক দল এসে নামাজ পড়ে চলে যাবে।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. আদেশ করলেন, রসূল স.কে হজরত আব্বাস, আলী এবং হজরত আব্বাসের ছেলে ফজল এবং কুছাম, উসামা বিন যায়েদ ও সালেহ হাবশী গোসল দিবে।

মুহাজিরগণ খেলাফতের বিষয়ে আনসারদের সমাবেশে উপস্থিত হলেন। আনসারগণ বললেন, আমাদের পক্ষ থেকে একজন আমীর হবেন আর তোমাদের পক্ষ থেকে একজন। হজরত ফারুকে আজম বললেন, সে কোন্ ব্যক্তি যার গুণাবলীতে নিম্নের তিনটি কালিমা রয়েছে—

إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا -

(সে ছিল দুইজনের দ্বিতীয়জন। যখন তাহারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, সে তখন তাহার সংগীকে বলিয়াছিল বিষণ্ন হইও না, আল্লাহ্ তো আমাদের সংগে আছেন। সুরা তওবা আয়াত ৪০)।

এরপর হজরত ওমর রা. বললেন, হে আবু বকর! আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। হজরত আবু বকর রা. হাত বাড়িয়ে দিলেন। হজরত ওমর রা. সর্বপ্রথম বায়াত গ্রহণ করলেন। তারপর সকল সহাবী সন্তুষ্টচিত্তে বায়াত গ্রহণ করলেন। (তারিখে ইমাম আল ইফায়ী)।

হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. এর মর্যাদা বর্ণনার ক্ষেত্রে রসূল স. বলেন, যখন আল্লাহ্তায়ালা আমাকে নবী করে প্রেরণ করেছিলেন, তখন

তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে। আর আবু বকর বলেছিলো, আপনি সত্য বলেছেন। সে তার জান-মাল দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছে। তোমরা কি আমার কারণে আমার বন্ধুকে বর্জন করবে?

ইমাম আল ইফায়ী বলেন, হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর ইমানের পরিপূর্ণতা ও পূর্ণ বিশ্বস্ততার এটা সর্বোচ্চ স্বীকৃতি।

রসূল স. এরশাদ করেন, আবু বকরের ইমানের সাথে যদি তামাম জিন ইনসানের ইমান ওজন করা হয়, তাহলে আবু বকরের ইমান ভারি হবে, নবী-রসূলগণ ব্যতীত।

হাদিসটি ইমাম বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ইমানে' হজরত ওমর রা. থেকে পরিণত সূত্রে বর্ণনা করেছেন এভাবে—

لَوْ وُزِنَ اِيْمَانُ اَبِىْ بَكْرٍ بِاِيْمَانِ اَهْلِ الْاَرْضِ لَرَجَّعَ بِهِمْ

(যদি হজরত আবু বকরের ইমান পৃথিবীবাসীর ইমানের সাথে মাপা হয়, তাহলে তাঁর ইমানই প্রাধান্য পাবে)। তারিখে খুলাফা ৪৪ পৃষ্ঠা।

একবার সাহাবায়ে কেরাম রা. রসূল স.কে জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রত্যাদেশিত পুরুষ! আপনার প্রিয় ব্যক্তি কে? উত্তরে তিনি বললেন, আয়েশা। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি স. বললেন, তার পিতা আবু বকর। বোখারী, মুসলিম।

রসূল স. এরশাদ করেন, মসজিদে আবু বকরের জানালা ছাড়া সকল জানালা বন্ধ করে দাও। মেশকাত।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেছেন, রসূল স. এর যুগে আমরা হজরত আবু বকরের সমতুল্য কাউকে মনে করতাম না। এরপর হজরত ওমর, তারপর হজরত ওসমান। মেশকাত।

বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে, একদিন রসূল স. জিজ্ঞেস করলেন, কে আছো যে আজ রোজা রেখেছো? হজরত আবু বকর রা. বললেন, আমি। রসূল স. বললেন, কে আছো যে আজ জানাযায় অংশগ্রহণ করেছো? হজরত আবু বকর রা. বললেন, আমি। রসূল স. বললেন, কে আছো যে আজ মিসকিনদেরকে আহার করিয়ে পরিতৃপ্ত করেছো? হজরত আবু বকর বললেন, আমি। রসূল স. পুনঃ প্রশ্ন করলেন, কে আছো এমন যে আজ রুগ্ন ব্যক্তির খোঁজ-খবর নিয়েছো? হজরত আবু বকর বললেন,

আমি। এরপর রসূল স. বললেন, এ সকল কাজ যার মধ্যে একত্রিত হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মুসলিম।

উলামা কেরাম বলেন, এর অর্থ হলো ওই ব্যক্তি হিশাব এবং আমলের শাস্তি ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেনোনা শুধু ইমান আনয়ন করাই আল্লাহ্‌র করুণাতে জান্নাত পাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

তিরমিজি বর্ণিত একটি হাদিসে রয়েছে, আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দয়াবান মেহেরবান আবু বকর। আমি যার কাছেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, সে সামান্য সময়ের জন্য হলেও ইতস্তত করেছে। ব্যতিক্রম শুধু আবু বকর। তিরমিজি, তিবরানী, ইবনে আসাকির।

হজরত আবু বকর যখন তাঁর সমস্ত ধন-দৌলত রসূল স. এর খেদমতে উপস্থিত করলেন, তখন তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, পরিবার-পরিজনের জন্য কী রেখে এসেছো? হজরত আবু বকর রা. উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে। তিরমিজি, আবু দাউদ।

রসূল স. বলেন, আকাশ ভ্রমণকালে আমি যখন যে আকাশ দিয়েই গমন করেছি, সেখানে আমার নাম মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ লিখিত দেখেছি। আর আবু বকর ছিলো আমার পশ্চাতে। আস্ সাওয়াইকুল মুহাররিকা ৭২ পৃষ্ঠা ।

রসূলুল্লাহ স. এরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসে আবু বকর ব্যতীত সকলকে দাঁড়াতে নির্দেশ দেওয়া হবে। আবু বকর ইচ্ছা করলে দাঁড়াবে অথবা চলে যাবে। আমলনামা দেওয়ার সময় তাঁকে বলা হবে, ইচ্ছা হলে পড়ো অথবা পোড়ো না। ঊর্ধ্বজগতে লাল ইয়াকুতের একটি গম্বুজ থাকবে যাতে চার হাজার দরজা থাকবে। হজরত আবু বকর যখন আল্লাহ্‌তায়ালার সাথে দীদারের ইচ্ছা প্রকাশ করবেন, তখন তা থেকে একটি দরজা খুলে যাবে। তিনি কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা ব্যতীতই আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করবেন।

রসূল স. এরশাদ করেন, একদিন আমি হজরত জিব্‌রাইলকে জিজ্ঞেস করলাম, কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের হিশাব হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে হজরত আবু বকর ব্যতীত। তাঁকে বলা হবে, আবু বকর! জান্নাতে চলে যাও। তিনি বলবেন, আমি ততোক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবো না যতোক্ষণ না আমার সাথে মহব্বত স্থাপনকারীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলবেন, হে আবু বকর! তোমার বন্ধুদেরকে

বেহেশতে নিয়ে যাও। কেনোনা আমি ওই দিন ওয়াদা করেছিলাম, যে দিন তোমাকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি। আর আমি বেহেশতকে বলে দিয়েছি— যে আবু বকরকে ভালোবাসবে, সে তোমাতে প্রবেশ করবে।

রসূল স. বলেন, যে দিন আবু বকর জন্মগ্রহণ করলো, সেদিন আল্লাহ্তায়ালা জান্নাতে আদনকে জানিয়ে দিলেন, আমার সম্মান ও মর্যাদার শপথ! তোমাতে তাকেই প্রবেশ করাবো যারা এই শিশুকে ভালোবাসবে। আল লায়লীল মাসনুআ, পৃষ্ঠা ২৯২, ২৯৩।

একবার রসূল স. হজরত আয়েশা সিদ্দিকাকে বললেন, আমি কি তোমাকে একটি খবর দিবো? তিনি বললেন, অবশ্যই। রসূল স. বললেন, তোমার পিতার নাম সূর্যের অন্তরে লিপিবদ্ধ আছে। প্রতিদিন সূর্য কাবার মুখোমুখী হলে কাবার উপর দিয়ে অতিক্রম করা থেকে বিরত থাকে। সূর্যের সাথে নিয়োজিত ফেরেশতা বলে, ওই পবিত্র নামের বরকতে অতিক্রম করো যা তোমার মধ্যে রয়েছে। অতঃপর সূর্য অতিক্রম করে। কুর্‌রাতুল আইনাইন পৃষ্ঠা ১৩।

একদিন রসূল স. সাহাবায়ে কেরাম রা.কে সম্বোধন করে বললেন, আমি তোমাদেরকে কিয়ামতের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করব কি? কিয়ামত দিবসে পুলসিরাতের ডানে একটি মিম্বর স্থাপন করা হবে। আমি তাতে উপবেশন করবো। অতঃপর আর একটি মিম্বার স্থাপন করা হবে তাতে উপবেশন করবেন হজরত ইব্রাহীম। উভয় মিম্বারের মাঝে একটি আসন রাখা হবে। তাতে উপবেশন করবে আবু বকর।

অতঃপর একজন ফেরেশতা আমার মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে উঠে ঘোষণা করবেন, হে মুসলিম জনতা! যে আমাকে চিনে তো চিনেই আর যে চিনে না সে জেনে নিক আমি জাহান্নামের দারোগা ফেরেশতা। আল্লাহ্তায়ালা আমাকে আদেশ করেছেন আমি যেনো জাহান্নামের চাবি মোহাম্মদ স. এর হাতে অর্পণ করি। আর মোহাম্মদ স. আদেশ করবেন আমি যেনো সেই চাবি আবু বকর সিদ্দিককে দেই। অতঃপর আরেকজন ফেরেশতা এসে আমার মিম্বরের দ্বিতীয় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিবেন, হে মুসলিম জনতা! যারা আমাকে চিনে তারাতো চিনেই, আর যারা চিনে না তারা জেনে নিক আমি জান্নাতের প্রধান ফেরেশতা রিদ্বওয়ান। আল্লাহ্তায়ালা আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেনো বেহেশতের চাবি মোহাম্মদ স. এর হস্তে ন্যস্ত করি। আর তিনি স. আদেশ করেছেন, চাবিটি

হজরত আবু বকরকে দেওয়ার জন্য। অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের উপর নূরের তাজাল্লি বিকশিত করে এরশাদ করবেন, বরকতময় হোক আমার খলিল, আমার হাবীব ও সিদ্দিকে আকবর।

একবার রসূল স. বললেন, হে আবু বকর! আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাকে মহাসন্তুষ্টি দান করবেন। হজরত আবু বকর সিদ্দিক বললেন, মহাসন্তুষ্টি কী? রসূল স. বললেন, মহান আল্লাহ্‌তায়ালা মুসলমানদেরকে সাধারণ তাজাল্লি দিবেন। আর তোমার জন্য রয়েছে বিশেষ তাজাল্লি। কুররাতুল আইনাইন পৃষ্ঠা ১৩ ।

বর্ণিত আছে, একদা আবু বকর সিদ্দিক রা. আশি হাজার দিনার ও নিজের মালিকানাধীন সকল কিছু আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করলেন এবং নিজে ফকিরী অবলম্বন করলেন। কম্বল পরিধান করে বোতামের অভাবে কাঁটা লাগিয়ে রসূল স. এর দরবারে উপস্থিত হলেন। রসূল স. জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু বকর! এ কী অবস্থা! হজরত আবু বকর উত্তর দেওয়ার পূর্বেই হজরত জিব্‌রাইল আ. হজরত আবু বকরের মতো কম্বল পরিধান করে কাঁটা লাগাতে লাগাতে রসূল স. এর নিকট পৌঁছে গেলেন। এ অবস্থা দেখে রসূল স. আশ্চর্যান্বিত হলেন। বললেন, ভাই জিব্‌রাইল! এ পোশাক কেনো? তিনি বললেন, সিদ্দিকে আকবরের সঙ্গে সামঞ্জস্যতার জন্য। নৈকট্যধন্য ফেরেশতাদেরকে আজ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেনো আবু বকরের মতো পোশাক পরিধান করে। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন এজন্য যে, আপনি যেনো আবু বকরকে আল্লাহ্‌র সালাম পৌঁছে দেন। তাঁকে বলে দিন এই ফকিরী হালের মধ্যেও তিনি যেনো আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। রসূল স. আল্লাহ্‌র সালাম ও পয়গাম বাণী হজরত আবু বকরের নিকট পৌঁছে দিলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. খুশিতে বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবর। তারপর তিনবার বললেন, আমি আমার প্রভুপালকের প্রতি সন্তুষ্ট। রসূল স. হজরত আবু বকর রা.কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু বকর! তুমি কী এমন আমল করেছো যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাকে সালাম প্রেরণ করেছেন। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর জবাবের পূর্বেই হজরত জিব্‌রাইল আ. বললেন, আপনার হয়তো জানা নেই, তিনি তাঁর সকল সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করেছেন। সাতজন মুসলমান, যাঁদেরকে কাফেরেরা জুলুম ও অত্যাচারের নিশানা বানিয়েছিলো, হজরত আবু বকর তাদেরকে দশগুণ অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে

ক্রয় করে মুক্তি দিয়েছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন— বেলাল, আমের, নাহদিয়া, নাহদিয়ার কন্যা মারিয়াহ, দুবায়রা, উম্মে উবায়দা ও কানিযা। এমন সময় হজরত জিব্‌রাইল সূরা লাইল নিয়ে অবতরণ করেন, যেখানে বলা হলো—

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى - فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى - وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى -

(সুতরাং কেহ দান করিলে, মুত্তাকী হইলে এবং যাহা উত্তম তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, আমি তাহার জন্য সুগম করিয়া দিবো সহজ পথ। সূরা লাইল ৫-৭)।

ইমাম জাফর সাদেক এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন اَعْطٰى অর্থ আল্লাহ্ যাঁকে উভয়জগত দান করেছেন অথবা যিনি আল্লাহ্ ব্যতীত উভয়জগতের কোনো বিষয়েই মনোনিবদ্ধ করেন না। وَ اتَّقٰى অর্থ যিনি অনর্থক কাজ ও গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকেন। وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى অর্থ যিনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্যলাভ কামনা করেন এবং এই উদ্দেশ্যের উপর কায়েম থাকেন। যখন তিনি এই আয়াতে পৌঁছলেন—

وَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى -
لَسَوْفَ يَرْضٰى -

(এবং তাহার প্রতি কাহারও অনুগ্রহের প্রতিদানে নহে, কেবল তাহার মহান প্রভুপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়, সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করিবে। সূরা লাইল আয়াত ১৯-২১)। রসূল স. বললেন, আবু বকর তাদেরকে এ জন্য মুক্ত করেনি যে, কেউ তাকে বিনিময় প্রদান করবে, বরং সে এই নিয়তে আমল করেছে যে, আল্লাহ্তায়ালা যেনো দয়া করে সন্তুষ্ট হয়ে যান। আর সৎকর্মটি যেনো অতি দ্রুত আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছে যায়। রসূল স. একদিন তাঁর জন্য দোয়া করলেন— হে আল্লাহ্! কিয়ামত দিবসে আবু বকরকে আমার সাথে আমার স্তরে রেখো। ওহী অবতীর্ণ হলো– আল্লাহ্ আপনার দোয়া কবুল করেছেন।

রসূল স. বলেন, প্রত্যেকের অনুদান আমি পরিশোধ করে দিয়েছি। কিন্তু আবু বকরের অনুদান আমার কাছে রয়ে গেছে, যার বিনিময় আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে দিবেন। তিরমিজি ও কুর্‌রাতুল আইনাইন **১১** পৃষ্ঠা।

রসূল স. আরও বলেন, কারো মাল দ্বারা আমি এতো উপকার লাভ করিনি, যতোখানি আবু বকরের মাল দ্বারা উপকৃত হয়েছি। আমি যদি আল্লাহ্‌ ছাড়া কাউকে বন্ধু বানাতাম, তাহলে আবু বকরকে বানাতাম। হাদিসটি শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী র. তাঁর রচিত কিতাব 'কুর্‌রাতুল আইনাইন' এর ১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

সিদ্দিক— বর্ণিত আছে যে, রসূল স. কে যখন হিজরতের আদেশ দেওয়া হলো তখন তিনি হজরত জিব্‌রাইলকে বললেন, আমার সাথে কে হিজরত করবে? তিনি বললেন, সিদ্দিকে আকবর। সেই দিনই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে সিদ্দিক নামে ভূষিত করেন।

আতিক— তাঁর আতিক নামের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। কতিপয় আলেম বলেন, তাঁর আতিক নামের কারণ এরকম— তাঁর মর্যাদার ব্যাপারে রসূল স. বলেন, কেউ যদি দোযখ থেকে মুক্ত কোনো ব্যক্তিকে দেখতে চায়, সে যেনো আবু বকর ইবনে আবু কুহাফাকে দেখে নেয়। এটাই আতিক নামের কারণ। উল্লেখ্য, আতিক অর্থ দোযখবিমুক্ত। অন্যান্য আলেম বলেন, তাঁর সুন্দর দৌহিক সৌন্দর্যের জন্যই তাঁকে আতিক উপাধি দেওয়া হয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, তিনি যে দিন খেলাফতের মঞ্চে উপবিষ্ট হলেন, সেদিন বিশিষ্ট মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে বায়াত হলেন। শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণ আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে একে অপরের অগ্রগামী হবার চেষ্টা করলেন। হজরত ওমর রা. বলেন, যদি লোকজন আমাকে গ্রেফতার করে আমার গরদান উড়িয়ে দেয়, তবুও আমি আবু বকরের উপস্থিতিতে অন্য কারো আমীর হওয়াকে পছন্দ করবো না।

হজরত আলী রা. বলেন, হে আবু বকর! রসূল স. দ্বীনের কাজে সর্বদা আপনাকেই আগে রাখতেন। তাঁর উপস্থিতিতেই আপনাকে ইমাম বানিয়ে আপনার এক্তেদা করেছেন। আমরাও দুনিয়ার সকল কাজে আপনাকেই সামনে রাখতে চাই। আপনি হাত এগিয়ে দিন। আমি আপনার হাতে বায়াত হবো।

হজরত আবু সিদ্দিক রা. এর শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব, সততা ও বিশ্বাসভভাজনতার ব্যাপারে সাহবায়ে কেরামের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য ছিলো না। তিনি বিধর্মীদের ষড়যন্ত্রকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন। তাঁর যুগেই মুসলিমবাহিনী শাম, ইরাক ও বিভিন্ন রাষ্ট্র জয় করেছিলেন। তিনি সাধারণ লোকদেরকে জালেম বাদশাহ্‌র অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন। রসূল স. এর সময় যেরূপ সদকা, জাকাত, জিযিয়া আদায় হতো, হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর সময়েও অনুরূপ আদায় হয়েছিলো। সামান্যও হ্রাস হয়নি। তাঁর যুগেই ভণ্ড মুসাইলামাতুল কায্‌যাব নবুওয়াতের দাবি করেছিলো। আসওয়াদ আনাসি প্রভুত্বের দাবি করেছিলো। ফলে বিরাট ফেত্‌না মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো। তাদের দলে সত্তর-আশি হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিলো। তিনি তাদেরকে সমূলে উৎখাত করেন।

ইমান আনার পূর্বের একটি স্বপ্নঃ তিনি বলেন, রসূল স. এর নবুওয়াতের ঘোষণার পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখি আকাশ হতে কাবার ছাদে একটি নূর অবতীর্ণ হলো, মক্কার সকল গৃহে এর আলো প্রতিফলিত হলো। এরপর নূরটি পূর্বের রূপ ধারণ করলো। তারপর আমার গৃহে প্রবেশ করলো। আর আমি তা সংরক্ষণ করলাম। সকালে এক গণককে স্বপ্নের তাবির সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। সে বললো, এটা একটি দুঃস্বপ্ন। এর বেশী সে কিছু বললো না। এরপর এক যুগ কেটে গেলো। বাণিজ্য উপলক্ষে আমি বুহায়রা রাহেবের বাড়ি পৌঁছলাম। আমি তার নিকট স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, তোমার পরিচয়? আমি বললাম, আমি কুরায়েশ। পাদরী বললো, আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের সম্প্রদায়ে একজন নবী প্রেরণ করবেন। তুমি তাঁর মন্ত্রী হবে এবং তাঁর ইন্তেকালের পর হবে তাঁর খলিফা। ইমাম সুয়ূ্যতী, ওমদাতুত্‌ তাহকিক।

হজরত মোহাম্মদ স. যখন রসূল হিশাবে প্রেরিত হলেন, তখন তিনি আমাকে মুসলমান হতে বললেন। আমি বললাম, প্রত্যেক নবীর নবুওয়াতের দলিল থাকে। আপনার নবুওয়াতের দলিল কী? তিনি স. বললেন, আমার নবুওয়াতের দলিল তোমার ওই স্বপ্ন যা তুমি দেখেছিলে। প্রথম গণনাকারী বলেছিলো, এটি এক দুঃস্বপ্ন। আর বুহায়রা ব্যাখ্যা করেছিলেন, তোমার সম্প্রদায়ে একজন নবী আসবেন, তুমি তাঁর উজির হবে, তাঁর ইন্তেকালের পর হবে তাঁর খলিফা। আমি বললাম, আপনার নিকট এ সংবাদ কে দিয়েছে? তিনি বললেন, জিব্‌রাইল। আমি বললাম, আপনার নবুওয়াতের

ব্যাপারে আমি আর কোনো দলিল-প্রমাণ অনুসন্ধান করবো না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি— আপনি তাঁর বান্দা ও রসূল।

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তিঃ ইমাম জুহুরী বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম যখন তাঁর মোবারক হস্তে খেলাফতের বায়াত গ্রহণ করলেন, তখন তিনি মিম্বরে উঠে ভাষণ দিলেন। বললেন, আমি কোনো দিন খেলাফতের প্রতি লোভী ছিলাম না। আমার হৃদয়ে এমন ধারণা কখনোই জাগ্রত হয়নি। মহান আল্লাহ্তায়ালার কাছে প্রকাশ্যে বা গোপনে এর জন্য কোনো দোয়াও আমি করিনি। খেলাফতে আমার কোনো আনন্দও নেই।

'কাশফুল মাহজুব' প্রণেতা ইমাম সুয়ূতী বলেন, আল্লাহ্তায়ালা যখন কোনো বান্দাকে সত্যের উঁচু আসনে আসীন করতে চান ও তাকে মর্যাদা দান করেন তখন বান্দাও আল্লাহ্র ইচ্ছার অপেক্ষায় থাকেন। কামনা করেন, প্রাপ্ত নির্দেশানুসারে যেনো অটল থাকতে পারেন। ফকির হওয়ার আদেশ এলে ফকির হয়ে যান। যেমন সিদ্দিকে আকবর রা. এর প্রথম জীবন। আর আমীর হওয়ার আদেশ হলে হন আমীর। যেমন সিদ্দিকে আকবরের শেষ জীবন। সুখ-দুঃখ, জমিদারী ও ফকিরীর ইচ্ছাপোষণে অনাসক্তি, মর্যাদা বর্জনের অগ্রপথিক হজরত সিদ্দিকে আকবর রা.। আর এই দল (নেসবতে সিদ্দিকীভুক্ত) সিদ্দিকে আকবরের এই সুউচ্চ তরিকার অনুসরণ ও অনুকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর উপর সন্তুষ্ট।

হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. বলেন, আমাদের বাড়ী ক্ষণস্থায়ী। আমাদের অবস্থা শূন্য, আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস গণনা করা হয়। অথচ আমাদের মধ্যে অলসতা বিদ্যমান। কাশ্ফুল মাহজুব।

দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের কোনো মূল্য নেই। সে দুনিয়ার কাজে মশগুল হয়ে পড়ে। যখন তুমি নশ্বর জগতের প্রতি ব্যস্ত হয়ে পড়বে, তখন তুমি স্খলিত হবে অবিনশ্বর জগত থেকে। দুনিয়াপ্রীতি ও দুনিয়া উভয়টি আল্লাহ্প্রাপ্তির অন্তরায়। আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ উভয়টি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তাঁরা অবগত যে, দুনিয়া লয়শীল। সম্পদ মানুষের। এ জন্য তাঁরা মানুষের সম্পদে হস্তক্ষেপ করা থেকে হাত গুটিয়ে নেন। জীবনের কয়েকটি শ্বাসের উপর মনোনিবেশ করাকে তাঁরা উদাসীনতা মনে করেন। তাঁরা জানেন যে, তাঁদের শরীর কাজের বাহন।

বর্ণিত আছে, একবার হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. আল্লাহ্‌র দরবারে আবেদন করলেন—

হে আল্লাহ্! আমার জন্য দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দাও এবং এর আপদ থেকে আমাকে রক্ষা করো। আমাকে এতোটুকু দুনিয়া দান করো, যাতে আমি শুকরিয়া আদায় করতে পারি এবং এমন তাওফিক দান করো যাতে আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য তা থেকে দূরে থাকি এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই। আর তোমার কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন, তোমার রাস্তায় খরচ করার মর্যাদা, ধৈর্য ও সন্তুষ্টির মাকাম লাভ করতে পারি। কাশ্‌ফুল মাহজুব।

এই দোয়ায় এই রহস্যটি রয়েছে যে, আমার অভাব অনটন অনিচ্ছাধীন নয় বরং ইচ্ছাধীন। সকল মাশায়েখ ও সুফীয়ায়ে কেরামের একই মত। কিন্তু এক বুজর্গ বলেন, ইচ্ছাধীন অভাব অনটনের চেয়ে অনিচ্ছাধীন অভাব অনটন উত্তম। হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. নবী ও রসূলগণের পর সৃষ্টজীবের মধ্যে সর্বোত্তম। কারো জন্য তাঁর চেয়ে অধিক অগ্রগামি হওয়া বৈধ নয়। হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. তাহাজ্জুদ নামাজে ক্বেরাত নিচু আওয়াজে পড়তেন। হজরত ওমর রা. পড়তেন উঁচু আওয়াজে। রসূল স. হজরত আবু বকর রা.কে জিজ্ঞেস করলেন, নামাজে ক্বেরাত আস্তে পড়ো কেনো? তিনি বললেন, আমি যাকে শোনাই, তিনি তো অনুপস্থিত নন। আর ফারুকে আজম রা. কে জিজ্ঞেস করেন, তুমি নামাজে উঁচু আওয়াজে ক্বেরাত পড়ো কেনো? তিনি বললেন, ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করি, আর শয়তানকে তাড়াই। এ কারণেই মাশায়েখগণ মাকামে মুশাহাদায় হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. কে সম্মুখবর্তী রাখেন। আর মুজাহাদার ক্ষেত্রে ফারুকে আজমকে মনে করেন অগ্রবর্তী। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. মুশাহাদা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। আর হজরত ওমর রা. দেন মুজাহাদার সংবাদ। মাকামে মুশাহাদার তুলনায় মাকামে মুজাহাদা বিশাল সমুদ্রে একটি বিন্দু মাত্র। এ জন্য মহানবী স. হজরত ওমর রা. কে বলেন, তুমি আবু বকরের নেকীসমূহ থেকে একটি নেকী। যখন হজরত ওমর রা. এর অবস্থান ইসলামী মানদণ্ডে আবু বকরের তুলনায় এক নেকী তুল্য, তখন অন্যদের ব্যাপারে তাঁর অবস্থান সহজেই অনুমেয়।

কারামত ১ ঃ হজরত আয়েশা রা. বলেন, হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. যখন ইন্তেকাল করেন, তখন কতিপয় সাহাবী বলতে থাকেন, আমরা তাঁকে শহীদগণের সাথে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করবো। আর আমি

বলেছিলাম, আমার কক্ষে তাঁর বন্ধুর সাথে দাফন করবো। এমন সময় আমার উপর নিদ্রা প্রবল হলো। আমি আওয়াজ শুনতে পেলাম, হাবীবকে হাবীবের কাছেই রাখো। আমি জাগ্রত হলে বুঝতে পারলাম, এ আওয়াজ সবাই শুনতে পেয়েছে। এমন কি যারা মসজিদে অবস্থান করছিলো তারাও।

কারামত ২ ঃ 'শাওয়াহিদুন্ নবুওয়াত' গ্রন্থে রয়েছে, আমিরুল মু'মিনীন মৃত্যুর সময় ওসিয়ত করেছিলেন, আমার লাশের খাটটি রসূল স. এর রওজা মোবারকে নিয়ে যাবে এবং আস্সালামু আলাইকুম ইয়া রসূলুল্লাহ বলে এই মর্মে আবেদন করবে যে, আবু বকর আপনার রওজায় উপস্থিত। কবুল করলে দরজা খুলে যাবে। তখন তোমরা আমাকে সেখানে দাফন করবে। অন্যথায় জান্নাতুল বাকীতে নিয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা হজরত আবু বকর রা. এর ওসিয়ত অনুযায়ী তাঁর শবাধার রওজা মোবারকে নিয়ে গিয়ে তাঁর ওসিয়তকৃত বাক্যটি শেষ করার আগেই দরজা খুলে গেলো। আওয়াজ ভেসে এলো, হাবীবকে হাবীবের কাছে পৌঁছে দাও।

এ বর্ণনাটি খাসাইসুল কুবরা থেকে উদ্ধৃত করেন মাওলানা জাকারিয়া সাহেব তাঁর রচিত ফাযায়েলে হজ্ব নামক কিতাবের ৩৬-৪৬ পৃষ্ঠায়।

শায়েখ আবু বকর আবু মোহাম্মদ শামবাকী র. বলেন, আমাদের শায়েখ আবু বকর হার্‌রার প্রথম জীবনে বাত্হা নামক স্থানে প্রসিদ্ধ ডাকাত ছিলেন। যখন তিনি সততার সাথে একনিষ্ঠ তওবা করলেন এবং সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক হলেন, তখন তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, তিনি নিজেকে এমন এক ব্যক্তির নিকট সমর্পণ করবেন, যিনি তাঁকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে দিবেন। সে সময়ে ইরাকে প্রসিদ্ধ কোনো শায়েখ ছিলো না। তিনি নবী করিম স. এবং হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. কে স্বপ্নে দেখেন এবং আরজ করেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমাকে একটি খেরকা পরিধান করিয়ে দিন। নবী করিম স. এরশাদ করেন, আমি তোমার নবী। আর আবু বকর তোমার শায়েখ। অতঃপর নবী করিম স. হজরত আবু বকরের দিকে মনোনিবেশ করে বলেন, হে আবু বকর! তোমার ভক্তকে খেরকা পরিধান করিয়ে দাও। আদেশানুযায়ী হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. জামা এবং টুপি পরিধান করিয়ে দিলেন এবং স্বীয় হস্ত মোবারক তাঁর কপাল ও মাথায় বুলিয়ে দিলেন। বললেন, আল্লাহ্ তোমার মধ্যে বরকত দিন।

এরপর নবী করিম স. হজরত আবু বকর ইবনে হার্‌রারকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবু বকর ইবনে হার্‌রার! তোমার মাধ্যমে আমার তরিকতের

সুন্নত জীবিত হবে। আল্লাহ্‌তায়ালার প্রিয় বন্ধুগণ হ্রাস পাওয়ার পর তোমার সত্তা থেকে জারী হবে। ইরাকে তরিকতের পন্থা কিয়ামত পর্যন্ত তোমার মাধ্যমে স্থির থাকবে। তোমার আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহের শীতল বায়ু প্রবাহিত হবে। আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে তাঁর সন্তুষ্টির ধারাবাহিকতা তোমার মাধ্যমে বিস্তার ঘটবে। আবু বকর ইবনে হাররার জাগ্রত হলেন। দেখলেন, যে জামা এবং টুপি হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. দান করেছিলেন সেই জামা এবং টুপি হুবহু তাঁর পরিধানে বিদ্যমান। শায়েখের মাথায় একটি ফোঁড়া ছিলো তাও দূরীভূত হয়েছে। পৃথিবীতে প্রচারিত হলো— শায়েখ আবু বকর আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সর্বদিকের সৃষ্টজীব শায়েখের দিকে মনোনিবেশ করলো এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্যের নিদর্শন দেখতে পেলো। শায়েখের বাণী প্রকাশিত হতে লাগলো।

ঘটনাটি ইমাম শা'রানী তাঁর 'তাবাকাতুল কুবরা' নামক কিতাবের ২য় খণ্ডের ২৫০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন এবং ইমাম ইয়াফায়ী উল্লেখ করেন 'হেকায়েতে ছালাছা' নামক গ্রন্থে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি কয়েকবার শায়েখ আবু বকরের পাশে সিংহ উপবিষ্ট অবস্থায় দেখেছি। কতক সময় তাঁর কদম মোবারকে লুটিয়ে পড়তেও দেখেছি। শায়েখ ইবনে হাররার সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি রেসালাতের যুগের মাশায়েখদের অতিবাহিত হওয়ার পর ইরাকে সুলুকের ভিত্তি স্থাপন করেন। আমি তাঁর ভক্ত ছিলাম।

কারামাত ৩ ঃ শায়েখ আলি ইবনে ওয়াহাব সাজারী কুদ্দিসা সিররুহু বলেন, আমি স্বপ্নে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.কে দেখলাম। তিনি বললেন, হে আলী ইবনে ওয়াহাব! আমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে এই টুপিটি তোমাকে পরিধান করাতে। তিনি নিজের আস্তিন মোবারক হতে টুপি বের করে আমার মাথায় পরিয়ে দিলেন। আমি জাগ্রত হলে হুবহু সেই টুপি আমার মাথায় দেখতে পেলাম।

ইমাম ইয়াফায়ী র. রাওজুর রায়াহীনের তাকমিনায় লিপিবদ্ধ করেন, মদিনা মুনাওয়ারায় রওজা মোবারকের নিকট এই কিতাবের পাঠ শোনার সময় নবী করিম স., হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. ও হজরত ওমর রা. তশরীফ রাখেন। মজলিশ শেষে আমি দোয়া করলাম, তখন রসূল স. হজরত সিদ্দিকে আকবরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। এ ঘটনাটি আমি জাগ্রত অবস্থায় মোশাহাদা (প্রত্যক্ষ) করি।

হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. এর অন্যান্য কারামত ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী 'কারামতে আউলিয়া' নামক গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. এর খেলাফতকাল ছিলো দুই বছর চার মাস। কোনো বর্ণনায় দুই বছর তিন মাস ৭ দিন। আবার কোনো বর্ণনায় এসেছে আড়াই বছরের কথা। তাঁর বয়স রসূল স. এর বয়সের সমান ৬৩ বছর হয়েছিলো। ইন্তেকালের তারিখ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কারো মতে ২৩ বা ২৮ জমাদিউল উলা। আবার কারো মতে ২৩ জমাদিউল আখের মঙ্গলবার মাগরিব ও ইশার মাঝামাঝি সময়ে। কারো মতে ২৩ হিজরীতে ৯ই জমাদিউল আখের।

তাঁর অন্তিম ওসিয়ত অনুযায়ী তাঁর বিবি আসমা বিনতে ওমায়স তাঁকে গোসল দেন। পুরাতন দুটি কাপড়ে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। কেনোনা নতুন কাপড় উপকারে লাগবে জীবিত মানুষের।

আমিরুল মুমিনীন হজরত ওমর ফারুক রা. সাহাবায়ে কেরামগণকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর নামাজে জানাযা আদায় করেন এবং রসূল স. এর রওজা মোবারকে তাঁকে দাফন করা হয়। নবী ও রসূলগণের পর বনী আদমের মধ্যে তিনি সর্বোত্তম ছিলেন। এজন্য কালিমায়ে أَحَدٌ দ্বারা তাঁর ইন্তেকালের তারিখ নির্ধারণ করা যায়।

আমিরুল মুমিনীন হজরত ওমর ফারুক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু

এলমে জাহের, এলমে বাতেন, আল্লাহ্‌র নৈকট্য ইত্যাদি বিষয়ে রসূল স. এর সাহচর্যে সিদ্দিকে আকবরের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেন। তাঁর সম্পর্কে রসূল স. বলেন—

لَوْ كَانَ بَعْدِيْ نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لٰكِنْ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ -

(আমার পর যদি কেহ নবী হতো, তাহলে সেই নবী হতো ওমর ইবনে খাত্তাব। কিন্তু আমি খাতামুন নাবিয়্যীন— শেষ নবী)। এই হাদিসের ইশারা ইঙ্গিত অনুযায়ী সিদ্দিকে আকবর হজরত আবু বকর রা. এর পর হজরত

ওমর খলিফা নির্বাচিত হন। হাদিসটি তিরমিজি, হাকেম, তিবরানী ও ইবনে আসাকির তাঁদের পুস্তকসমূহে বর্ণনা করেন।

হজরত ওমর ফারুক রা. ছিলেন দীর্ঘদেহী, স্বাস্থ্যবান, শক্তিশালী ও প্রশস্ত পদাধিকারী। ছিলেন দ্রুতগামী, লোহিতাভ শুভ্র। তাঁর উভয় স্কন্ধের মধ্যদেশ ছিলো সুপ্রশস্ত। অবশ্যই ছিলেন বীর ও সুস্পষ্টভাষী। তাঁর আট ছেলে ও চার মেয়ে ছিলো।

ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ঃ যখন হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. এর অন্তিম সময় সমুপস্থিত হলো, তখন তিনি ফারুকে আজম হজরত ওমর রা. এর নাম একটি কাগজে লিপিবদ্ধ করালেন এবং ছোটো-বড়ো সকল সাহাবীকে একত্র করে বললেন, এই কাগজে যার নাম লেখা হয়েছে, একে তোমরা খলিফা হিশাবে মেনে নিয়ো। সকলে এ ব্যাপারে একমত হলেন। আমিরুল মুমিনীন হজরত আলী রা. বললেন, আমি গ্রহণ করলাম, যদি এর মধ্যে মান্যবর ওমরের নাম লেখা থাকে।

বায়াত ঃ হজরত ওমর রা. যখন খলিফা মনোনীত হলেন তখন হজরত ওসমান, আলী, হাসান হোসেন ও সকল সাহাবী তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করলেন।

বংশ ঃ হজরত ওমর রা. এর বংশপরম্পরা নবী করিম স. এর বংশের সাথে কাব পর্যন্ত গিয়ে মিলে যায়। হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ইবনে নুফাইল ইবনে আব্দুল উজ্জা ইবনে রাবাহ ইবনে কুরত ইবনে রাজাহ্ ইবনে আদী ইবনে কাব লুয়াই। হাতীর বছরের পর মক্কা মোকাররমাতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রসূল স. তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, اَلْحَقُّ يَنْطِقُ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ - (সত্য ওমরের জবানে কথা বলে)। তিরমিজি, আবু দাউদ, বায়হাকী মানাকিবে ওমর অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ও কুররাতুল আইনাইন কিতাবের ১৫ পৃষ্ঠায় হাদিসখানা উল্লেখ করা হয়েছে। রসূল স. একবার হজরত ওমর রা. ও আবু জেহেলকে একত্রে বসে থাকতে দেখলেন। তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! এই দু'জনের মধ্যে তোমার নিকট যে প্রিয়, তার দ্বারা তোমার দ্বীনকে সুদৃঢ় করো। হাদিসটি তিরমিজি ও আহমদ মানাকিবে ওমর অধ্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে আর ইবনে মাজা কুর্‌রাতুল আইনাইনে ১৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ্তায়ালা হজরত ওমর রা. কে ইসলাম কবুলের তৌফিক প্রদান করেন। যেদিন হজরত ওমর রা. ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন জিব্রাইল আ. রসূল স. এর নিকট হাজির হয়ে বলেন, হে মোহাম্মদ! ওমরের ইসলাম গ্রহণের কারণে আকাশের সকল ফেরেশতা আনন্দিত। ইবনে মাজা, কুররাতুল আইনাইন পৃষ্ঠা ১৮। যেমন আল্লাহ্তায়ালা বলেন—

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

(হে নবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। সূরা আনফাল ৬৪)। আল্লাহ্তায়ালার এ বাণীর উদ্দেশ্য হজরত ওমর রা.। রসূল স. বলেন, ওমরের দুররার (আঘাতের) মাধ্যমে ইসলাম শক্তিশালী হয়েছে। বায়হাকী।

রসূল স. এরশাদ করেন— শয়তান ওমরের ছায়া থেকে পলায়ন করে। মেশকাত, তরিখে খুলাফা, কুর্রাতুল আইনাইন ও কুনুযে হাকায়েক। এক হাদিসে এসেছে, রসূলুল্লাহ স. আজ্ঞা করেন, একদা আমি জিব্রাইল আমিনকে বললাম, হে জিব্রাইল! ওমরের ফযীলত বর্ণনা করুন। ফেরেশতারা তাকে কেমন মনে করেন, হজরত জিব্রাইল বললেন, আকাশবাসীর নিকট ওমরের মর্যাদা কীরূপ, তা যদি বলতে শুরু করি তাহলে এ পরিমাণ সময় লাগবে, যে পরিমাণ সময় নবী নূহ তাঁর জাতিকে দাওয়াত দিতে ব্যয় করেছেন, অর্থাৎ সাড়ে নয়শত বছর। তথাপি ওমরের মর্যাদা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না।

হাদিসখানা আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূ্তী র. তাঁর তারিখে খুলাফা নামক কিতাবে হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন। ফাওয়ায়েদে রাযী ও শারফুন নবুওয়াত গ্রন্থেও হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে।

রসূল স. আরও বলেন, যে ওমরকে ভালোবাসে সে আমাকে ভালবাসে, আর যে ওমরের সাথে শত্রুতা করে সে আমার সাথে শত্রুতা করে। তারিখে খুলাফা, মুসতাদ্রাক, কামেল।

রসূল স. আরও বলেন, মহান আল্লাহ্তায়ালা আরাফার দিন সন্ধ্যায় মুমিনগণের আমলের কারণে ফখর করতে থাকেন সাধারণভাবে। আর ওমরের আমলের কারণে বিশেষভাবে গর্ব করতে থাকেন অর্থাৎ তাঁর নাম উল্লেখ করে করে বলতে থাকেন। তিবরানী, ইবনে আসাকির, তারিখে খুলাফা।

রসূল স. আরও বলেন, ওমর থেকে উত্তম কোনো ব্যক্তির উপর সূর্য উদিত হয়নি। তিরমিজি, মেশকাত। অপর হাদিস ও এজমায়ে উম্মত দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, নবী-রসূলগণ ও সিদ্দিকে আকবর ব্যতীত।

রসূল স. আরও বলেন, যখন তোমরা নেককারগণের আলোচনা করো তখন ওমরের আলোচনা কোরো)।

রসূল স. আরও বলেন, প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন করে মুহাদ্দাস থাকে আর আমার উম্মতের মুহাদ্দাস হলো ওমর। মুহাদ্দাস দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ্তায়ালা যার কাছে কোনো মাধ্যম ব্যতিরেকে ইলহাম করে থাকেন। বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি, হাকেম, মেশকাত।

সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমে রয়েছে, একবার কয়েকজন কুরায়েশ রমণী রসূল স. এর দরবারে উপস্থিত হলো। তাদের কণ্ঠস্বর রসূল স. এর পবিত্র বাণীর চেয়ে উঁচু হচ্ছিলো। ইতোমধ্যে হজরত ওমর রা. রসূল স. এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। রমণীরা হজরত ওমরের আওয়াজ শুনেই ভিতরে চলে গেলো। রসূল স. অনুমতি দিলে হজরত ওমর ভিতরে প্রবেশ করলেন। তিনি স. মৃদু হাসলেন। হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল! মৃদুহাস্যের কারণ কী? রসূল স. বললেন, ওই রমণীরা বিস্ময়কর বৈ কী। তারা আমার কাছে এসে কথা বলছিলো। আর তোমার আওয়াজ শোনা মাত্রই পর্দার ভিতরে চলে গেলো। হজরত ওমর রা. দরজার দিকে মুখ করে বললেন, হে নিজের নফসের দুশমনেরা! ওমরকে ভয় করো অথচ আল্লাহ্র রসূলকে ভয় করো না। তারা ভিতর থেকে উত্তর দিলেন, আপনি কঠিন লোক আর আল্লাহ্র রসূল সহিষ্ণু এবং দয়ালু। তখন রসূল স. এরশাদ করলেন, হে ওমর! তুমি যে রাস্তা দিয়ে চলবে, শয়তান সে রাস্তা দিয়ে চলবে না। সে অন্য রাস্তা ধরবে।

ফারুক উপাধি লাভ ঃ এক ইহুদী ও মুনাফিকের মধ্যে ঝগড়া হলো। ইহুদী বললো, চলো আমরা মোহাম্মদের কাছে যাই, তিনি আমাদের বিচার করে দিবেন। মুনাফিক বললো, চলো, কাব এর কাছে যাই। তিনি আমাদের বিবাদ মীমাংসা করে দিবেন। অবশেষে ইহুদী মুনাফিককে নিয়ে রসূল স. এর দরবারে উপস্থিত হলো। মুনাফিক তার দাবির পক্ষে সঠিক প্রমাণ দিতে পারলো না। রসূল স. ইহুদীর পক্ষে রায় দিলেন। ইহুদী নিজের অধিকার আদায়ের জন্য দাঁড়ালো। মুনাফিক ইহুদীকে বললো, আমি মোহাম্মদের বিচার মানি না। কাব এর নিকট চলো। ইহুদী বললো, চলো। আমরা

ওমরের নিকট যাই। মুনাফিক এ প্রস্তাবে সম্মত হলো। উভয়ে হজরত ওমরের গৃহে উপস্থিত হলো। ইহুদী নিজের দাবি, রসূল স. এর মীমাংসা এবং মুনাফিকের অস্বীকার সম্পর্কে সবিস্তারে বিবরণ দিলো। হজরত ওমর কোষ থেকে অসি বের করে মুনাফিকের মস্তক দেহ থেকে পৃথক করে দিলেন। বললেন, যে ব্যক্তি রসূল স. এর বিচার মানে না, তার বিচার হলো মস্তকছেদন। তখনই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জিব্‌রাইল আমীন বার্তা শোনালেন, ওমরের নাম ফারুক রাখুন। কেনোনা তিনি হক ও বাতেলের পার্থক্য প্রতিষ্ঠাকারী।

হাদিসটি আবুল ফুরুজ ইবনে জাওজি মিনহাযুল আসাবাহ্ ফী তামীজে সাহাবা নামক গ্রন্থে হজরত ছা'লাবী রা. থেকে বর্ণনা করেন।

উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা রা. তাঁর পিতা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. থেকে হাদিস বর্ণনা করেন এভাবে— তিনি অন্তিম সময়ে বলেছেন, ওমরের চেয়ে অধিক প্রিয় আমার কোনো বন্ধু নেই। তারিখে খুলাফা, ইবনে আসাকের পৃষ্ঠা ৮৫ ।

হজরত ওমর রা. এর বাণী

মন্দ সঙ্গ থেকে নির্জনে থাকা উত্তম। তিনি আরও বলেন, দুনিয়ার গৃহের ভিত্তি হলো পরীক্ষার উপর, আর পরীক্ষা থেকে মুক্ত থাকা অসম্ভব।

বর্ণিত আছে, হজরত ওমর রা. এর যুগে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠরাজ্যসমূহ মুসলমানদের দখলে এসেছে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে শরীয়তে মোহাম্মদীর কানুন জারী হয়েছিলো। ইসলামের পতাকা এবং শরীয়তের ঝাণ্ডা উঁচু ছিলো। আরব, হেজাজ, ইয়েমেন, সিরিয়া এবং মিশর মুসলমানদের অনুগত ছিলো। রোমের কিছু অংশ, খুরাসান ও মাওয়ারাউন্নাহারের বেশির ভাগ অঞ্চল বিজিত হয়। কুফা ও বসরায় মুসলমান বসতি স্থাপিত হয়। কুফর, শিরিক ও অগ্নিপূজারীদের ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত হানা হয়। অগ্নিপূজকদের পুরাতন মাযহাব যা হাজার বছর ধরে প্রবহমান ছিলো, তা মৃতপ্রায় হয়ে গেলো। বিজিত রাজ্যে জিজিয়া কর আরোপ করে তা নিয়মিত আদায় হতে লাগলো। অভাবী ও দরিদ্র সাহাবীগণ প্রতাপশালী রাজাদের রাজত্বের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হলেন। রাজা-বাদশাহ্‌রাও অনুগত হয়ে গেলো। ইরানের বাদশাহ্ দীর্ঘদিন যাবত ধন-সম্পদ সঞ্চয় করছিলো। সম্পদ ও শক্তির অহমিকা ও দাপটে তারা খোদায়ীত্ব দাবি করছিলো। তাদের সে

সকল রত্নভাণ্ডার, ধন-সম্পদ মুসলমানদের করায়ত্ব হলো। ইরাক, সিরিয়া, মিশর ও অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে মালে গনিমত মদিনা মুনাওয়ারায় আসতে লাগলো।

হজরত ওমর রা. ঘোষণা দিলেন, ধনভাণ্ডার এবং গনিমতের মাল মদিনার মাঠে নিক্ষেপ করো। স্বর্ণ, রূপা, হীরা, পান্না, সুগন্ধি দ্রব্য, মূল্যবান কার্পেট, জাযিম, রেশমী পোশাকের স্তূপ জমা হয়ে গেলো। এ দ্বারা ইসলামের শান-শওকত ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেলো। আর দুনিয়াপূজারীদের জন্য লাঞ্ছনা ও অপমান প্রকাশিত হলো। উদ্দেশ্য, একথা বুঝিয়ে দেওয়া যে, মহান আল্লাহ্তায়ালার নিকট দুনিয়ার কোনো মূল্য নেই। যদি থাকতো তাহলে তিনি এতো ধন-সম্পদ তাঁর শত্রুদের দিতেন না।

হজরত ওমর রা. এ সকল ধন-সম্পদের স্তূপ মদিনার বাইরে রেখেই মুহাজির, আনসার ও রসূল স. এর ইন্তেকালের পর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। বণ্টনের সময় প্রত্যেকের মান মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। বণ্টন শেষে শূন্য হাতেই বাড়ি ফিরতেন। নিজের জন্য কিছুই রাখতেন না। অথচ তাঁর অধীনে কয়েকটি দেশ পরিচালিত হচ্ছিলো। তিনি নিজে অভাব-অনটনের মাঝে স্বাভাবিকভাবে দিনাতিপাত করতেন।

রসূল স. এর খাদেম হজরত আনাস রা. বলেন, একবার আমি হজরত ওমরের খেলাফতকালে জুমআর নামাজে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুত্বা দিচ্ছিলেন। আমি তাঁর জুব্বার তালি হিশাব করলাম। তাতে নয়টি তালি ছিলো। অথচ রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অবস্থা ছিলো এই যে, বারো হাজার তাজি ঘোড়া কাফেরদের সাথে জিহাদ করা ও বিধর্মী রাজা-বাদশাহ্দের সংশোধনার্থে (যারা অহংকারের টুপি পরিধান করে সম্পদের নেশায় খোদায়ী দাবি করছিলো) বিদ্যমান ছিলো।

জমশেদ ও সিকান্দারীর শান-শওকতকে অভাবের সাথে মিলানো এবং তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করে সম্পদ বণ্টন করা হজরত আদম আ. থেকে শুরু করে পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত হজরত ওমর ব্যতীত দ্বিতীয় কাউকে পাওয়া যাবে না। যা কিছু তিনি অর্জন করেছিলেন তার সকলই ছিলো রসূল স. এর কৃপাদৃষ্টি এবং ছিলো রসূল স. এর জীবন্ত মোজেযা।

হক প্রশাসক ও মুজাহিদদেরকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রতি বছর নিয়মিত সম্মানী প্রদান করতেন। মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম খলিফা

যিনি কয়েকটি শহর আবাদ করেন। তিনি সাহাবী এবং তাবেয়ীগণের অনুদান বণ্টনের স্তর নির্ধারণ করেছিলেন। ইসলামী দপ্তর নির্মাণ করেন। ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বে নিয়োজিতদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন। প্রত্যেক শহরে বিচারক নিযুক্ত করেন।

কারামত ১ ঃ কারামত ও অত্যাশ্চর্য ঘটনা তাঁর নিত্যদিনের ব্যাপার ছিলো। এমনকি তাঁর বাঁদীদের থেকেও আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রকাশ পেতো। একদিন তাঁর বাঁদী হজরত যায়েদা রসূল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সালাম দিলেন। রসূল স. বললেন, যায়েদা আজ বিলম্বে এলে কেনো? তুমি তো মাকামে রিদ্বওয়ানে অবস্থানকারীদের একজন। এ জন্য তোমাকে ভালোবাসি। যায়েদা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আজ এক অত্যাশ্চর্য বিষয় নিয়ে আপনার সকাশে উপস্থিত হয়েছি। রসূল স. বললেন, বলো। তিনি বললেন, আজ সকালে জঙ্গলে লাকড়ি সংগ্রহ করার জন্য গিয়েছিলাম। যখন আমি লাকড়ির বোঝা বাঁধলাম, তখন তা অনেক ভারি অনুভব হলো। আমি বোঝা বহনের জন্য একটি পাথরের উপর রাখলাম। এমন সময় আকাশ থেকে জমিনে একজনকে অবতরণ করতে দেখলাম। তিনি আমাকে সালাম দিয়ে বললেন, হে যায়েদা! রসূল স. এর খেদমতে আমার সালাম দিয়ে বোলো হে সায়্যিদুল মুরসালিন! জান্নাতের প্রধান ফেরেশতা রিদ্বওয়ান আপনাকে সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন, আপনার উম্মতকে তিন স্তরে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। এক দল বিনা হিশাবে জান্নাতে যাবে। দ্বিতীয় দল সহজ হিশাব দিয়ে বেহেশতে যাবে, আর তৃতীয় দল আপনার সুপারিশে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্‌তায়ালার অপার করুণাতে আপনার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই বলে সে আকাশপানে রওয়ানা হলো। আকাশ ও জমিনের মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছে আমার দিকে তাকালো এবং বোঝা ভারি হওয়ার কারণে যে উঠাতে পারছিলাম না, তা প্রত্যক্ষ করলো। বললো, হে যায়েদা! বোঝাটা পাথরের উপর রাখো। তাহলে তোমার জন্য সহজ হবে। এরপর সে পাথরকে নির্দেশ দিলো, বোঝাটা আমিরুল মুমিনীন হজরত ওমর রা. এর বাড়িতে পৌঁছে দাও। একথা বলে সে আকাশপানে চলে গেলো। পাথর লাকড়ির বোঝা আমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে স্বস্থানে ফিরে গেলো। রসূল স. যায়েদার কথা শুনে দ্রুত উঠে পড়লেন এবং সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে হজরত ওমরের বাড়িতে গেলেন। পাথর আগমন-নির্গমনের নিদর্শন স্বচক্ষে অবলোকন করলেন। আল্লাহ্‌তায়ালার স্তব-স্তুতি বর্ণনার পর

বললেন, আল্লাহ্তায়ালা আমাকে দুনিয়া থেকে উঠানোর পূর্বেই জান্নাতের চাবিওয়ালা রিদ্বওয়ানকে প্রেরণ করে আমার সকল উম্মতের জান্নাতে যাওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। আর আমার উম্মতের এক নারীকে মহীয়সী মরিয়মের স্তরে উপনীত করেছেন।

কারামত ২ ঃ আমিরুল মুমিনীন হজরত ওমর রা. এর যুগে একবার নীল দরিয়ার পানি শুকিয়ে গেলো। জাহেলী যুগে লোকেরা এক তরুণীকে সাজিয়ে গুছিয়ে তাতে নিক্ষেপ করতো। গণক কিছু পাঠ করতো। এরপর নদীতে পানি প্রবাহিত হতো। আমিরুল মুমিনীন হজরত ওমর ফারুক রা.কে জানানো হলে তিনি একটি কাগজে লিখলেন, হে নীল নদ! তুমি যদি নিজের ইচ্ছায় প্রবাহিত হয়ে থাকো, তাহলে প্রবাহিত হয়ো না। আর যদি মহান আল্লাহ্র নির্দেশে প্রবাহিত হয়ে থাকো তা হলে ওমর বলছে, তুমি প্রবাহিত হয়ে যাও। তিনি নির্দেশ দিলেন এই পত্রটি নীলনদে নিক্ষেপ করো। চিরকুটটি নীলনদে নিক্ষেপ করা হলে নীলনদে পানিপ্রবাহ হয়ে গেলো।

কারামত ৩ ঃ এক বাদশাহ্ একজন ঘাতককে হজরত ওমর ফারুক রা. কে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করে। সে মদিনায় এসে লোকজনকে জিজ্ঞেস করলো, আমিরুল মুমিনীন কোথায়? তারা বললো, আমিরুল মুমিনীন এখানেই কোনো বাড়ীতে অবস্থান করছেন অথবা বাইরে কোথাও গিয়েছেন। আমিরুল মুমিনীনের বাইরে অবস্থানের খবর জানতে পেরে লোকটি তাঁর অনুসন্ধানে বের হলো। কবরস্থানে হজরত ওমর রা. কে শায়িত অবস্থায় পেলো। মাথার নিচে দুররা দেখতে পেলো। লোকটি ভাবতে লাগলো, এ লোকের এতো প্রভাব যে, দুনিয়ার বড় বড় বাদশাহ্ তাঁর ভয়ে কম্পমান ও তটস্থ হয়ে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। অথচ তাঁকে বাগে পাওয়া কতো সহজ। লোকটি তলোয়ার কোষমুক্ত করে তাঁর নিকট যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলো। হঠাৎ বিশাল দেহের দুটি সিংহ আত্মপ্রকাশ করলো। লোকটি অনিচ্ছাকৃতভাবেই চিৎকার করে বলতে লাগলো, আমাকে সাহায্য করুন! আমাকে সাহায্য করুন! হে আমিরুল মুমিনীন! হজরত ওমর রা. জাগ্রত হয়ে তাঁর সামনে দুটি সিংহ দেখতে পেলেন। সিংহ দুটো লোকটিকে হত্যা করতে উদ্যত। লোকটি হজরত ওমর রা. কে সকল ঘটনা বর্ণনা করে মুসলমান হয়ে গেলো। সিংহ দুটি অদৃশ্য হয়ে গেলো। তারিখে খুলাফা, ইবনে আসাকের, ওয়াকেদী।

কারামত ৪ ঃ একদা আমিরুল মুমিনীন হজরত ওমর রা. মিম্বরে খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ খুত্‌বার মাঝে তিনি বললেন, হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে তাকাও। পাহাড়ে আশ্রয় লও। উপস্থিত মুসল্লিগণ একথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলেন। তাঁর এ কথার দিন-তারিখ নির্দিষ্ট পত্রে লিখে রাখা হলো এজন্য যে, নিশ্চয়ই এতে কোনো রহস্য রয়েছে। হজরত ওমর রা. কয়েক দিনের রাস্ত ার দূরত্বে যে বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, সে বাহিনী যখন ফিরে এলো তারা বললো, অমুক দিন অমুক তারিখে শত্রুদের সাথে আমাদের ভয়াবহ যুদ্ধ চলছিলো। আমাদের পরাজয়ের লক্ষণ ফুটে উঠেছিলো। এমন সময় আমরা আমিরুল মুমিনীনের কণ্ঠে শুনতে পেলাম, হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে তাকাও। পাহাড়ে আশ্রয় লও। আওয়াজ শোনার সাথে সাথে আমরা পাহাড়ের দিকে ছুটে গেলাম। এরপর আমরা শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করলাম। আমাদেরই জয় হলো। হাদিসটি বায়হাকী এবং আবু নাঈম তাঁদের দালাইলুন নবুওয়াত এ উল্লেখ করেছেন। তারিখে খুলাফা।

কারামত ৫ ঃ একদা হজরত হাসান ও হোসেন রা. আমিরুল মুমিনীন হজরত ওমর রা. এর নিকটে এলেন। তাঁরা তাঁদের পিতা হজরত আলী রা. থেকে আর তিনি রসূল স. থেকে শুনেছেন, রসূল স. বলেন, ওমর ইবনে খাত্তাব দুনিয়াতে ইসলামের আলোকবর্তিকা আর জান্নাতে জান্নাতবাসীদের প্রদীপ। হজরত ওমর রা. হাদিসটি একটি কাগজে লিখে ছেলের হাতে দিয়ে বললেন, এ কাগজটি আমার মৃত্যুর পর আমার কাফনে ভরে দিয়ো। যখন তিনি এই নশ্বর জগৎ থেকে বিদায় নিলেন, তখন সেই কাগজটি কাফনে ভরে দেওয়া হলো। দ্বিতীয় দিন তাঁর কবরের উপর একটি কাগজ পাওয়া গেলো। এতে লেখা ছিলো হাসান হোসেন সত্য বলেছেন, তাঁদের পিতা আলী সত্য বলেছেন, তাঁদের নানা হজরত মোহাম্মদ সত্য বলেছেন। দুনিয়াতে ওমর আলোকবর্তিকা আর জান্নাতে জান্নাতবাসীদের প্রদীপ। হজরত ওমর রা. এর অন্যান্য কারামত 'কারামাতুল' আউলিয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাঁর খেলাফতকাল দশ বছর কয়েক মাস। জিলকদ মাসের ২৩ তারিখে ৬৩ বছর বয়সে ২৩ হিজরীতে তিনি শাহাদতবরণ করেন। নবী করিম স. এর কক্ষে হজরত আবু বকরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। হাদিসটি হাফেজ আবু সাইদ ইবনে আলী তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

আমিরুল মুমিনীন হজরত ওসমান জুন্নূরাইন রদ্বিয়াল্লাহু আনহু

হজরত ওসমান রা. এলমে জাহের ও বাতেন, বরকত ও মর্যাদা রসূল স. এর সান্নিধ্যে থেকেই লাভ করেন। হজরত ওমর ফারুক রা. এর পর খেলাফত লাভ করেন। বংশধারা আবদে মানাফ পর্যন্ত গিয়ে রসূল স. এর সাথে মিলিত হয়েছে। ওসমান ইবনে আফ্ফান ইবনে আবিল আস ইবনে উমাইয়া ইবনে আব্দে শামস্ ইবনে আব্দে মানাফ। তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তৃতীয় খলিফা, নবী-রসূল এবং শায়খাইনের পর শ্রেষ্ঠ মানুষ। আমিরুল মুমিনীন হজরত ওমর রা. এর ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এলে খেলাফতের দায়িত্ব ছয়জন মহান ব্যক্তির হাতে অর্পণ করেন। হজরত ওসমান রা. ব্যতীত সবাই এই দায়িত্ব পালনে অনীহ হন। অবশেষে সাহাবায়ে কেরাম এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্য হজরত ওসমান রা. কে মনোনীত করেন। আনুগত্য, আগ্রহ ও সন্তুষ্টির সাথে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হজরত আলী রা. সহ সকল আনসার ও মুহাজির সাহাবী তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। তিনি সহনশীলতা, লজ্জাবোধ, দানশীলতা, আত্মমর্যাদাবোধ এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয় ইত্যাদি প্রশংসনীয় মর্যাদায় পূর্ণ ছিলেন। তিনি রসূল স. এর সকল যুদ্ধে স্বীয় সম্পদ মুক্ত হস্তে দান করতেন এবং সর্বদা এ চেষ্টা করতেন যে, রসূল স. এর পবিত্র হস্ত যেনো অনটনমুক্ত থাকে। তিনি কাতেবে ওহী ও হাফেজে কোরআন ছিলেন। তিনিই কোরআনুল করীমকে একত্রিত করেন। কোরআনুল করীমের অনেক অনুলিপি লিপিবদ্ধ করিয়ে বিভিন্ন মুসলিম প্রদেশে প্রেরণ করেন। তাঁর একত্রিত কোরআনুল করীম এর ব্যাপারে সাহাবা কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেন। রসূল স. তাঁর দুই কন্যাকে তাঁরই সঙ্গে বিবাহ দেন। তাঁরা উভয়ে রসূল স. এর জীবদ্দশাতেই পৃথিবী ত্যাগ করেন। ওই দুই নবী-নন্দিনীর স্বামী ছিলেন বলে তাঁকে জুন্নূরাইন (দুই নূরের অধিকারী) বলা হয়।

তাঁর শারীরিক গঠন ছিলো মধ্যমাকৃতির। চেহারা সুন্দর। শরীরের রঙ শাদা ও হলুদ বর্ণের ছিলো। চেহারায় সামান্য মেস্তার দাগ ছিলো। দন্ত মোবারক ছিলো শাদা ও পরিপাটি। দাড়ি মোবারক ছিলো খুবই ঘন। মাথার চুল ছিলো কোঁকড়ানো। দুই কাঁধের মধ্যস্থল ছিলো সুপ্রশস্ত। স্বাস্থ্যবান ছিলেন। বাহুযুগল দীর্ঘ ও লোমশ ছিলো। তারিখে খুলাফা।

রসূল স. এরশাদ করেন, আল্লাহ্তায়ালা আমার নিকট এই মর্মে ওহী প্রেরণ করেছেন যে, আমি যেনো আমার দুই কন্যাকে ওসমানের সাথে

বিবাহ দেই। তিনি স. আরও বলেন, আমার যদি তৃতীয় আর একটি মেয়ে থাকতো, তাহলে তাকেও আমি ওসমানের সাথে বিবাহ দিতাম। ইবনে খতীব ও ইবনে আসাকির।

তিনি হজরত ওসমান সম্পর্কে আরও বলেন, দুনিয়া ও আখেরাতে তুমি আমার বন্ধু। আবু নাঈম, হাকেম। তিনি আরও বলেন, মেরাজ রজনীতে আমাকে একটি ফল দেওয়া হলো। ফলটি সাথে সাথেই ফেটে গেলো এবং এর মধ্য থেকে একটি হুর বের হলো। তার চোখের পলক লাল ছিলো। আমি তাকে বললাম, তুমি কার জন্য। সে বললো, আমি ওই খলিফার জন্য যাকে অন্যায়ভাবে শহীদ করা হবে। অর্থাৎ হজরত ওসমান রা.। হাদিসটি খতীব ইবনে ওমর থেকে মারফু সনদে এবং উকবা ইবনে আমের জুহানী ও আমর ইবনে মালেক, আওস ইবনে আওস থেকে তিবরানী বর্ণনা করেন।

রসূল স. এরশাদ করেন, আল্লাহ্তায়ালা ওসমানের উপর দয়া প্রদর্শন করুন, ফেরেশতারাও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। মেশকাত, তারিখে খুলাফা।

রসূল স. আরও বলেন, ওসমানের পরলোকগমনের সময় আসমান-জমিন ক্রন্দন করবে। জিজ্ঞেস করা হলো, এটা কি ওসমানের জন্য! তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। কেনোনা ওসমান লজ্জাবোধ করেন আল্লাহ্র অবাধ্য হওয়া থেকে। হাদিসটি ইবনে আদী সহল ইবনে সাদ রা. থেকে বর্ণনা করেন। রসূল স. আরও বলেন, জান্নাতে বিদ্যুৎ চমকাতে থাকবে। জান্নাত আলোকিত হয়ে যাবে। জান্নাতবাসীরা বলবে, এটা কিসের আলোক। এখানে তো বিদ্যুৎ নেই। বলা হবে, ওসমান জুতা পরিধান করছেন এক কক্ষ থেকে আরেক কক্ষে যাওয়ার জন্য। এটা তাঁর জুতার আলো। তারিখে খুলাফা নামক কিতাবে হজরত আলী রা. থেকে এ হাদিসটি বর্ণিত আছে। রসূল স. বলেন, প্রত্যেক নবীর একজন বন্ধু থাকবে। আর জান্নাতে আমার বন্ধু হবে ওসমান ইবনে আফ্ফান। তিরমিজি, মেশকাত, মানাকিবে ওসমান- ওসমান রা. অধ্যায়।

রসূল স. তবুক যুদ্ধে যাত্রা করলেন। সাথে বিশাল বাহিনী, ত্রিশ হাজার আরোহী। অনেকেই চললেন পায়ে হেঁটে। রসূল স. বলেন, সামর্থ্য অনুযায়ী অসহায় বন্ধুদের জন্য ব্যয় করো। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করলেন। হজরত ওসমান আস্তাবল থেকে নয়শত পঁচিশটি আরবীয় ঘোড়া গদি ও লাগামসহ উপস্থিত করলেন। ব্যবস্থা করলেন প্রত্যেক

সওয়ারীর জন্য একটি করে হাতিয়ারের। এছাড়া অস্ত্র ও আসবাব বহনের জন্য দিলেন পঞ্চাশটি উট। তখন রসূল স. হজরত ওসমানের জন্য দোয়া করলেনন— হে আল্লাহ্! আমি ওসমানের প্রতি সন্তুষ্ট। তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। নুজহাতুল মাজালেস দ্বিতীয় খণ্ডের মানাকিবে ওসমান অধ্যায়। সীরাতে জুন্নূরাইন নামক কিতাবেও এ দোয়ার উল্লেখ রয়েছে, তবে সেটা অন্য এক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। সেখানে বলা হয়েছে, রসূল স. একবার হজরত ওসমান রা. এর দানশীলতার উপর খুশী হয়ে এই দোয়া করেন। মরহুম মাওলানা আহমদ হোসেন তিবরানীর বরাত দিয়ে এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

এই হাদিসের বর্ণনাকারী বলেন, রসূল স. ওই রাতে ইশার নামাজের পর থেকে সকাল পর্যন্ত এই দোয়া করতে থাকেন। রসূল স. বলেন, ওসমান কতোইনা উত্তম। আল্লাহ্তায়ালা তাকে আমার নূরের সাথে একত্রিত করে দিয়েছেন। সে জীবদ্দশায় ভাগ্যবান, আর মৃত্যুর সময় শাহাদত লাভকারী।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে রেবাহ এবং হজরত আবু কাতাদা রা. বর্ণনা করেন, আমীরুল মুমিনীন হজরত ওসমান রা. এর শাহাদতের দিন আমরা তাঁর পাশে ছিলাম। যখন ফ্যাসাদকারীরা তাঁর দরজায় জমায়েত হলো, তখন তাঁর গোলামেরা মোকাবেলা করার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করলো। হজরত ওসমান রা. বললেন, যে অস্ত্র উত্তোলন করবে না, সে স্বাধীন। হজরত আবু কাতাদা বলেন, আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। আল্লাহ্র ফয়সালার উপর রাজি হয়ে গেলাম। এমন সময় তাঁকে বলা হলো, হজরত হাসান আসছেন। তিনি বললেন, কেনো? ইতোমধ্যে হজরত হাসান উপস্থিত হয়ে সালাম দিয়ে বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার আদেশ ছাড়া মুসলমানদের উপর তরবারি উঠাতে পারি না। আপনি ন্যায়পরায়ণ ইমাম। রসূলেপাক স. এর খলিফা। আমাকে আদেশ করুন। এদের অনিষ্টতা থেকে আপনাকে রক্ষা করি। আমিরুল মুমিনীন হজরত ওসমান রা. বললেন, হে ভ্রাতুষ্পত্র! ফিরে গিয়ে ঘরে অবস্থান করো আল্লাহ্র আদেশ আসা পর্যন্ত। রক্তপাত করার কোনো প্রয়োজন নেই।

এ হাদিসটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান এবং আবু কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন।

বিপদে ধৈর্যধারণ ও শান্ত থাকার মধ্যেই রয়েছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। এটাই উচ্চপর্যায়ের বন্ধুত্বের লক্ষণ। যেমন নমরুদ আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছিলো, আর হজরত ইব্রাহীম আ. কে রাখা হয়েছিলো মিনজানিকের পাল্লায়। জিব্‌রাইল আ. এসে বলেছিলেন, আপনার কোনো প্রয়োজন আছে কি? হজরত ইব্রাহীম আ. বললেন, তোমার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। হজরত জিব্‌রাইল আ. বললেন, তাহলে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চান। হজরত ইব্রাহীম আ. বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা আমার অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞাত আছেন। হজরত ওসমান রা. সেই সময় ওই অবস্থায় ছিলেন যেরূপ ছিলেন হজরত ইব্রাহীম আ. মিনজালিকের পাল্লায়। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা যেনো হজরত ইব্রাহীম আ. এর জন্য আগুন প্রস্তুত করতে গেলো।। আর ইমাম হাসান রা. ছিলেন হজরত জিব্‌রাইলের ভূমিকায়। কিন্তু হজরত ইব্রাহীম আ. বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন, আর হজরত ওসমান রা. শাহাদত লাভ করেছিলেন। মুক্তির সম্পর্ক বাকা এর সাথে, আর শাহাদত এর সম্পর্ক ফানা এর সাথে। জান-মাল খরচ, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও বিশুদ্ধ ইবাদতের ক্ষেত্রে ফকিরদের মহাঅগ্রনায়ক হজরত ওসমান রা. শরীয়ত ও তরিকতের ইমাম ছিলেন। কাশফুল মাহযুব, ওসমান রা. অধ্যায় পৃষ্ঠা ১২।

কারামত ১ ঃ সন্ত্রাসীরা যখন হজরত ওসমান রা. কে শহীদ করে, তখন জিনেরা তিন দিন পর্যন্ত মসজিদে নববীর ছাদে সমবেত হয়ে কেঁদেছিলো। শোকগাঁথা ও কবিতা আবৃতি করেছিলো।

কারামত ২ ঃ হজরত আদি ইবনে হাতেম রা. বলেন, হজরত ওসমান রা. এর শাহাদতের দিন আমি শুনতে পেলাম, হে ইবনে আফ্‌ফান! সুসংবাদ গ্রহণ করো, সুগন্ধি ও রায়হানের এবং প্রভুপালকের সাথে মিলনের। এমতাবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। আবার শুনতে পেলেন, হে ইবনে আফ্‌ফান! সুসংবাদ গ্রহণ করো ক্ষমা ও সন্তুষ্টির। এমতাবস্থায় আমি ঘুরে তাকালাম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না।

কারামত ৩ ঃ হাঙ্গামাকারীরা তাঁকে শহীদ করে দিলো। তিনদিন পর্যন্ত তাদের ভয়ে হজরতকে দাফন করা গেলো না। হঠাৎ অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এলো, তোমরা তাঁকে দাফন করে দাও। তাঁর জন্য নামাজে জানাজা পড়তে হবে না, কেনোনা মহান আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর নামাজে জানাজা পড়েছেন।

কারামত ৪ ঃ শাহাদতের তিন দিন পরে যখন তাঁর জানাজাকে জান্নাতুল বাকীতে নেওয়া হচ্ছিলো, তখন হঠাৎ দেখা গেলো পেছন থেকে এগিয়ে আসছে একদল লোক। তাদেরকে দেখে ফেত্নাকারীরা সন্ত্রস্ত হলো। তারা জানাযা ফেলে চলে যাওয়ার উপক্রম হলো, এমন সময় সেই দল থেকে আওয়াজ এলো, তোমরা ভয় পেয়ো না। নিজ নিজ স্থানে স্থির থাকো। আমরা তাঁর দাফনে অংশগ্রহণের জন্য এসেছি। উপস্থিত জনতা বলতে লাগলো, দলটি ফেরেশতাদের।

হজরত ওসমান রা. এর জানাযায় ফেরেশতাগণের উপস্থিতি সম্পর্কে এক বর্ণনায় ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। হাফেজ দামেশকী এক মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূল স. এরশাদ করেছেন—

يَوْمَ يَمُوْتُ عُثْمَانُ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَلٰٓئِكَةُ السَّمَآءِ -

(যেদিন ওসমান পরলোকগমন করবে সে দিন আকাশের ফেরেশতাগণ তার জানাযা পড়বে)। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, এটা কি বিশেষভাবে ওসমানের জন্য। না কি অন্যদের জন্যও। তিনি বললেন, শুধু ওসমানের জন্য।

তাঁর অন্যান্য কারামতসমূহ কারামাতুল আউলিয়া নামক গ্রন্থে আমি উল্লেখ করেছি। অনুসন্ধানীরা সেখানে দেখে নিতে পারেন। তিনি বারো বছর খেলাফত পরিচালনা করেন। বিরাশি বছর বয়সে ১৮ই জিলহজ্ব ৩৬ হিজরী শুক্রবারে আসওয়াদ জাঞ্জি সিয়ারুর হাতে শাহাদতবরণ করেন। সীরাতে জুন্নূরাইন পৃষ্ঠা ৫৮৭-৫৮৮।

আমিরুল মুমিনীন হজরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু

তিনি এলমে জাহের, এলমে বাতেন, কামালাত ও মাকামাত, সোহবত ও বরকত রসূল স. থেকে হাসিল করেন। তিনি হজরত ওসমান রা. এর পরে খেলাফত লাভ করেন। তিনি চতুর্থ খলিফা ছিলেন। ছিলেন সকল নবী-রসূল ও তিন খলিফার পর বনি আদমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ। হজরত ওসমান রা. শাহাদতবরণ করলে সকল মুহাজির, আনসার ও বিশিষ্ট সাহাবা তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। সকল উম্মত এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, এলেম, হেলেম, ফকিরী সাধনার ক্ষেত্রে সকল আম্বিয়া কেরাম ও তিন খলিফার পর হজরত আদম থেকে কিয়ামত পর্যন্ত রসূল স. এর

দোয়ার বরকতে এক ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বদান্যতা, বীরত্ব, সূক্ষ্মদর্শীতা ও কারামতে একক ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। তরিকতের ক্ষেত্রে তাঁর মর্যাদা ঊর্ধ্ব ও সুউচ্চ ছিলো।

রসূল স. এরশাদ করেন, আরশের পায়ে লিখিত দেখতে পেলাম— আমি এক আল্লাহ্। আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। জান্নাত আমার সৃষ্টি। মোহাম্মদ আমার সকল সৃষ্টজীব হতে উত্তম। আমি তাকে আলী দ্বারা সহযোগিতা ও শক্তি দান করেছি।

তাঁর বংশপরম্পরা আবু তালিবের মাধ্যমে আবদুল মুত্তালিব পর্যন্ত গিয়ে মহানবী স. এর সাথে মিলিত হয়েছে। মাতা ফাতেমা বিনতে আসাদ বিন হাশেম বিন আবদে মানাফ। শরীরের রঙ ছিলো গোধুম বর্ণের। ছিলেন সুস্বাস্থ্যাধিকারী ও প্রশস্ত স্কন্ধবিশিষ্ট। তাঁর দাড়ি ছিলো লম্বা ও ঘন, চোখ কালো, উদর প্রশস্ত আর শরীরে ছিলো অনেক পশম। তিনি মধ্যম আকৃতির ছিলেন। দশ বারো বা পনেরো বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন।

রসূল স. বলেন, জান্নাতের দরজায় লেখা আছে আল্লাহ্তায়ালা ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। মোহাম্মদ স. আল্লাহ্র রসূল। আলী রসূলুল্লাহ স. এর ভাই। একথা দুনিয়া সৃষ্টির দু' হাজার বছর পূর্বেই লেখা হয়েছে।

এ হাদিসটি ইমাম আহমদ মানাকিব অধ্যায়ে হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেন। আর মাওলানা আবদুর রহমান সাফওয়ারী র. নুজহাতুল মাজালিশ কিতাবে হজরত আলী রা. এর অধ্যায়ে উল্লেখ করেন।

রসূল স. বলেন, কিয়ামত দিবসে আরশ থেকে আহ্বান করা হবে, হে মোহাম্মদ! আপনার পিতা ইব্রাহীম খলীল কতোইনা উত্তম। আর আপনার উত্তম ভাই আলী ইবনে আবী তালিব।

রসূল স. বলেন, হে আলী! তোমাকে তিনটি এমন গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে, যেগুলো আমাকে দেওয়া হয়নি। হজরত আলী বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমাকে কী দেওয়া হয়েছে? রসূল স. বলেন, আমাকে তোমার শ্বশুর করা হয়েছে। আমাকে এমন প্রদান করা হয়নি। তোমাকে ফাতেমার মতো স্ত্রী প্রদান করা হয়েছে। আমাকে এমন প্রদান করা হয়নি। তোমাকে হাসান হোসাইনের মতো সন্তান প্রদান করা হয়েছে, যা আমাকে দেওয়া হয়নি। শারফুন্ নবুওয়াত।

রসূল স. এরপর বললেন, হে আনাস! আরবদের সরদার অর্থাৎ আলীকে ডাকো। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেন, আপনি কি আরবদের

সরদার নন? রসূল স. বললেন, আমি আদম সন্তানদের সরদার, আর আলী আরবদের সরদার। হাকেম, মুসতাদ্‌রাক।

রসূল স. বলেন, হে আনসারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয়ে অবহিত করবো না, আমার পর যা শক্তভাবে ধারণ করলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! বলুন। তিনি বললেন, আলীকে আমার ভালোবাসার কারণে ভালোবাসবে। আর আমার সম্মানের কারণে তাকে সম্মান করবে। কেনোনা জিব্‌রাইল আমাকে এমন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। নুজহাতুল মাজালিশ, ২য় খণ্ড, মানাকিবে হজরত আলী অধ্যায় পৃষ্ঠা ১২০।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন,

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا -

(আহার্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহারা অভাবগ্রস্ত ইয়াতিম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। সূরা দাহর আয়াত ৮)। এ আয়াতটি হজরত আলী রা. এর শানে নাজিল হয়েছে।

বর্ণিত আছে— একবার রসূল স. হজরত আলী রা. এর বাড়িতে গেলেন। তিনি স. হজরত হাসান-হোসেন রা. কে কৃশকায় দেখতে পেলেন। দয়া পরবশ হয়ে বললেন, তোমার সন্তানেরা দেখছি দুর্বল হয়ে গেছে। তাদের সুস্থতার জন্য মান্নত করো। হজরত আলী রা., ফাতেমা রা. ও ফিজ্‌জা তিন দিন রোজা রাখার মান্নত করলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁদেরকে সুস্থ করে দিলেন। তাঁরা মান্নত পূর্ণ করলেন। ইফতারের জন্য তিনটি রুটি তৈয়ার করলেন। ইফতারের সময় এক ভিক্ষুক এসে বললো, হে আহলে বায়াতগণ! আমি ক্ষুধার্ত, অসহায় ও মিসকীন। হজরত আলী রা. নিজের অংশের একটি রুটি দান করলেন। হজরত ফাতেমা এবং বাঁদী ফিজ্‌জাও নিজ নিজ অংশের রুটি তাকে দান করলেন। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় দিন সবাই রোজা রাখলেন। পরদিন ইফতারের সময় এক এতিম দরোজায় এলো। তাঁরা তাকে নিজ নিজ অংশ দিয়ে দিলেন। তৃতীয় দিনেও সকলে রোজা রাখলেন। ইফতারের সময় এলো এক সদ্যমুক্ত বন্দী। সে যাচনা করলো। তিনজনই তাঁদের নিজ নিজ অংশ দিয়ে দিলেন। তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলো।

আমিরুল মুমিনীন হজরত আলী রা. এর বুজর্গী সূর্যের মতো স্পষ্ট। তিনি রসূল স. এর চাচাতো ভাই ও জামাতা ছিলেন। রসূল স. তাঁর পিতার তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। তিনি হজরত হাসান-হোসেনের পিতা এবং হজরত ফাতেমা রা. এর স্বামী ছিলেন। তিনি সাহাবা কেরামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর, বাহাদুর, বড় আলেম ও জাহেদ ছিলেন। রসূল স. এর নবুওয়াতের দায়িত্বপ্রাপ্তির পূর্বেও তাঁর মনে কুফর ও শিরিকের ধারণা জন্মেনি। তিনি এলমে নাহু ও গণিতশাস্ত্রের আবিষ্কারক।

তাঁকে হায়দার (বাঘ, সিংহ) এজন্য বলা হয় যে, তিনি জন্মের পর দুধ পান করতেন না, বরং আঁচড় কাটতেন। একদিন রসূল স. এলেন এবং তাঁকে কোলে নিয়ে চুমু খেতে চাইলেন। তাঁর মা (আলীর মা) বললেন, মোহাম্মদ ওকে চুমু খেয়ো না। সে হায়দার অর্থাৎ সিংহের মত থাবা মারে, আঁচড় কাটে। রসূল স. তাঁর মায়ের কথা না শুনে তাঁকে চুমু দিলেন। পবিত্র লালা তাঁর মুখে দিলেন। রসূল স. তাঁর পবিত্র লালা সর্বপ্রথম আলীর মুখেই দেন।

কারামত ১ ঃ তাঁকে কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলার কারণ এই যে, যখন তিনি তাঁর মায়ের উদরে ছিলেন, তখন তাঁর মা মূর্তির জন্য সেজদা করতে ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর মায়ের পেটে এমনভাবে পেঁচিয়ে যেতেন যে, তাঁর মা সেজদা করতে পারতেন না। তাই আল্লাহ্তায়ালা তাঁর চেহারা মোবারককে মুকাররম বা সম্মানিত করেছেন। তিনি যতোদিন তাঁর মায়ের পেটে ছিলেন, ততোদিন তিনি (তাঁর মা) মূর্তিকে সেজদা করতে পারেনি।

কারামত ২ ঃ হজরত ইমাম হোসেন রা. বলেন, যখন আমিরুল মুমিনীন হজরত আলী রা. এর ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এলো, তখন আমি অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম, বাইরে চলে যাও। আর খোদার বান্দাকে আমাদের জন্য ছেড়ে দাও। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এরপর ঘর থেকে আওয়াজ এলো, মোহাম্মদ অতিবাহিত হয়েছেন আর তাঁর ভাই শহীদ হলেন। এখন উম্মতের দেখা শোনা কে করবে? অন্য একজন জবাব দিলো, যে ব্যক্তি তাঁর আদর্শ অবলম্বন করবে, তারা তাঁর অনুসরণ করবে। আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেলো। আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। এরপর তাঁকে গোসল দিয়ে কাফন পরিধান করালাম। জানাযার নামাজ শেষে দাফন করে দিলাম। শাওয়াহিদুন্ নবুওয়াত, হজরত আলী অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৯৬, ২৯৭।

কারামত ৩ ঃ বর্ণিত আছে, আমিরুল মুমিনীন হজরত আলী রা. এর কবর মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ জন্য তা গোপন রয়েছে। একবার খলিফা হারুনুর রশীদ শিকারে বের হলেন। গারিবিনের আশে পাশে পৌঁছে গেলেন। কেনোনা হরিণগুলো গারিবিনের নিকট আশ্রয় নিয়েছিলো। শিকারীরা হরিণগুলোকে ভয় দেখানোর জন্য কুকুর ছেড়ে দিলো কিন্তু কুকুরগুলো হরিণ পর্যন্ত পৌঁছতে পারলো না। খলিফা হারুনুর রশীদ গারিবিন এলাকার কিছুসংখ্যক বৃদ্ধকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললেন, আমরা বড়দের কাছে শুনেছি, এখানে হজরত আলী রা. এর কবর বিদ্যমান। বাদশাহ্ হারুনুর রশীদ তাঁদের কথা মেনে নিলেন এবং বাকী জীবন তিনি প্রতিবছর একবার জিয়ারতের জন্য সেখানে যেতেন।

কারামত ৪ ঃ ইমাম জয়নুল আবেদীন ইবনে হোসেন ইবনে আলী রা. থেকে বর্ণিত রয়েছে, ইব্রাহীম হিশাম আল হার্‌রার মদীনার গভর্নর ছিলো। প্রতি জুমায় আমাদেরকে মিম্বরের কাছে বসাতো আর হজরত আলী রা. সম্পর্কে কটুক্তি করতো। আমি স্বপ্নে দেখলাম, রসূলুল্লাহ স. এর কবর বিদীর্ণ হলো। ভেতর থেকে শাদা কাপড় পরিহিত একজন বেরিয়ে এসে আমাকে বললো, হে আবদুল্লাহ! ওই নিকৃষ্ট লোকটির কথা শুনতে তোমার খারাপ লাগে না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, চোখ খোলো এবং দেখো মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাঁর সাথে কেমন আচরণ করছেন। আমি চোখ খুললাম। দেখতে পেলাম, যে লোকটি হজরত আলী রা. সম্পর্কে মন্দ আলোচনা করেছে হঠাৎ সে লোকটি মিম্বর থেকে পড়ে মারা গেলো।

কারামত ৫ ঃ জনৈক পুণ্যবান বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, কিয়ামত সংঘটিত হয়েছে। সকল সৃষ্টজীব একস্থানে সমবেত হয়েছে। আমি পুলসিরাত অতিক্রম করছি। হঠাৎ রসূল স. এর উপর দৃষ্টি পড়লো। তিনি হাউজে কাওসারের নিকট তশরীফ এনেছেন। ইমাম হোসেন রা. লোকদেরকে পানি পান করাচ্ছেন। আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে পানি চাইলাম। রসূল স. বললেন, তোমাকে পানি দেওয়া হবে না। কেনোনা তোমার এক প্রতিবেশী আলীকে গালমন্দ ও অভিসম্পাত করতো অথচ তুমি তাকে নিষেধ করতে না। তিনি আমাকে একটি ছুরি দিয়ে বললেন, যাও, তাকে হত্যা করো। আমি ছুরি দিয়ে তাকে হত্যা করে ফিরে এলাম। তখন তিনি স. হোসেন রা. কে বললেন, হোসেন! তাকে পানি পান করাও। আমি ইমাম হোসেনের

কাছ থেকে পানির পেয়ালা নিলাম। কিন্তু আমার মনে পড়ে না আমি পানি পান করলাম কি না। স্বপ্ন ভঙ্গ হলো। একটু পরেই এইমর্মে সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো যে, অমুক ব্যক্তিকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে।

জন্ম ও ইন্তেকাল ঃ জন্ম কাবাগৃহে। শুক্রবার দিন শাবান মাসের তেরো-চৌদ্দ তারিখে। রসূল স. এর নবুওয়াতের দায়িত্বপ্রাপ্তির সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো পনেরো, ভিন্ন ভিন্ন মতে তেরো, দশ, নয় অথবা সাত বৎসর। তবে প্রথম মতটি অধিক বিশুদ্ধ।

তাঁর বয়স সম্পর্কে চারটি মত এসেছে— তেষট্টি, পঁয়ষট্টি, সাতান্ন, আটান্ন। তবে প্রথম মতটি অধিক বিশুদ্ধ।

১৭ই রমজান চল্লিশ হিজরীতে কুফা নগরীতে কুখ্যাত আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম তাঁকে আহত করে। আল্লাহ্তায়ালা ইবনে মুলজিমকে জাহান্নামের লাগাম পরিয়ে দিন। আমিন। ঊনিশ তারিখ রবিবার দিবাগত রাতে আবার কারো মতে একুশ অথবা ছাব্বিশ তারিখ জুমার রাতে তিনি শাহাদতবরণ করেন। তবে একুশ তারিখ অধিক যুক্তিযুক্ত ও বিশুদ্ধ। তাঁর মাজার শরীফ নাজাফে আশরাফে অবস্থিত।

হজরত সালমান ফারসী রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

হজরত সালমান ফারসী রা. রসূল স. এর সান্নিধ্য লাভের সাথে সাথে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. থেকে এলমে বাতেন অর্জন করেন। তিনি হজরত আলী রা. এর সান্নিধ্যও লাভ করেন। তিনি যৌবন কালেই সত্যধর্মের অনুসন্ধানে উদ্গ্রীব ছিলেন। এ জন্য তিনি ইহুদী, খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মের উলামাগণের নিকট যাতায়াত করতেন। সত্যের সন্ধানে তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। এমন কি সত্যধর্মের খোঁজে তিনি দশজন লোকের কাছে একের পর এক ক্রীতদাস হিশাবে হস্তান্তরিত হয়েছেন। অবশেষে তিনি রসূল স. এর নিকট পৌঁছেন। রসূল স. তাঁকে ইহুদীদের নিকট থেকে বহু মূল্য দিয়ে ক্রয় করেন।

কারামত ঃ হজরত সালমান ফারসী রা. এর নিকটাত্মীয় রসূল স. এর দরবারে এসে এই মর্মে আবেদন জানালেন যে, সালমানকে আমাদের হাতে অর্পণ করুন। রসূল স. হজরত সালমান রা.কে তাদের সাথে চলে যাওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন। কিন্তু তিনি নিজ আত্মীয়দের সাথে চলে যাওয়ার চেয়ে রসূল স. এর সান্নিধ্যকে প্রাধান্য দিলেন এবং তাদেরকে রসূল স. এর সান্নিধ্যের মহিমার প্রতি আহ্বান জানালেন।

ইমাম আবুল কাসেম তাঁর নিজের তাফসীরে লিখেছেন, যখন কোরআনুল করীমের অধিকাংশ অবতীর্ণ হলো, তখন রসূল স. সেগুলোর অনুলিপি অনেক দেশে পাঠালেন। হজরত সালমান ফারসীর মাধ্যমে যখন পারস্যে পৌঁছলো, তখন পারস্যবাসী কোরআনুল করীমকে তাদের বক্ষদেশে রাখলো এবং মুসলমান হয়ে গেলো। হজরত সালমান ফারসী পারস্য থেকে দুলদুল, মারিয়া কিবতিয়া ও ধন-সম্পদ-হাদিয়াসহ রসূল স. এর খেদমতে রওয়ানা হন। কোরআনুল করীম যখন তুর্কীদের কাছে পৌঁছলো, তখন তারা কোরআন মজীদকে মাথার উপর রাখলো এবং রসূল স. এর মহান দরবারে হাদিয়া তোহফা প্রেরণ করলো। যখন এ সকল অবস্থা রসূল স.কে অবহিত করা হলো তখন তিনি স. এরশাদ করলেন, পারস্যবাসীদের হৃদয় গৃহীত এবং বক্ষদেশ সত্য। কিয়ামত পর্যন্ত আমার বংশধরদের মহব্বত তাদের বক্ষ থেকে বের হবে না। আর তুর্কীরা সরদার হবে।

মোটকথা হজরত সালমান ফারসী রা. এর সাথে রসূল স. এবং তাঁর বংশধরদের ভালোবাসা, হৃদ্যতা, একনিষ্ঠতা এমন স্তরে পৌঁছেছিলো যে, রসূল স. স্বয়ং বলেছিলেন, سَلْمَانُ مِنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ (সালমান আমার পরিবারভুক্ত)। আকমাল ফী আসমায়ে রিজাল পৃষ্ঠা ১২ ও কুনুযে হাকায়েক পৃষ্ঠা ১৪২।

শায়েখ মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী এ হাদিসের দ্বারা হজরত সালমান ফারসী সম্পর্কে দলিল পেশ করেন যে, তিনি গোনাহ্ থেকে সংরক্ষিত ও পবিত্র। স্বীয় গ্রন্থ ফতুহাতে মক্কীয়াতে লিখেন, রসূল স. এরশাদ করেন, সালমান আহলে বায়াতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্তায়ালা আহলে বায়েতের জন্য পবিত্রতার সাক্ষ্য দেন এবং নবীপরিবার থেকে অপবিত্রতা দূর হওয়ার সংবাদ দেন। বলেন, তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান।

ইমাম জাফর সাদেক র. স্বীয় সনদে বলেন, হজরত আলী রা. থেকে বর্ণিত سَلْمَانُ مِنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ (সালমান আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত) এ হাদিসের মর্ম হলো রসূল স. এরশাদ করেছেন مِنْهُمْ مَوْلَى الْقَوْمُ (কোনো সম্প্রদায়ের দাস তাঁদের অন্তর্ভুক্ত)। রসূল স. এর এই হাদিসখানা

হজরত সালমান ফারসী রা. এর পবিত্রতা ও গোনাহ্ থেকে সংরক্ষিত হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। কেনোনা গুনাহ্ থেকে পবিত্র ব্যক্তিই রসূল স. এর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। এটা আল্লাহ্তায়ালার বড় অনুগ্রহ ও দয়া। এবার পাঠকবর্গের চিন্তা করা উচিত যে, শুধু নবীপরিবারের সাথে সুসম্পর্ক রাখলে যদি এমন সৌভাগ্য লাভ হয়, তাহলে নবী পরিবারের মর্যাদা কীরূপ হতে পারে।

মহান আল্লাহ্তায়ালা রসূল স. এর আহলে বায়েত ও সালমান ফারসী রা. কে নিম্নের আয়াত দ্বারা একত্রিত করেছেন।

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ-

(যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন। সূরা ফাত্হ্ আয়াত ২)। রসূল স. এর পরিবারের লোকজন পুতঃপবিত্র ও ক্ষমাপ্রাপ্ত। আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ দয়া ও রসূল স. এর বুজর্গীর কারণে নবীপরিবারের এই মর্যাদা। হজরত সালমান ফারসী নবী পরিবারের লোক। আমরা আশাবাদী যে, হজরত আলী রা. এর সকল সন্তান এবং হজরত সালমান ফারসীকে মহান আল্লাহ্তায়ালা অফুরন্ত অনুগ্রহের মধ্যে রাখবেন।

হজরত সালমান ফারসী রা. খন্দক যুদ্ধে এবং এর পরবর্তী সকল যুদ্ধে রসূল স. এর সাথে ছিলেন। তিনি আহলে সুফ্ফাগণের একজন। তিনি তাঁদের একজন, যে সকল সাহাবীর জন্য জান্নাত উন্মুখ।

আমিরুল মুমিনীন হজরত ওমর রা. তাঁকে মাদায়েনের গভর্নর নিযুক্ত করেন। বায়তুল মাল হতে তাঁকে বাৎসরিক পাঁচ হাজার টাকা সম্মানি দেওয়া হতো। তিনি তাঁর এ বেতন গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। যাম্বিল তথা থলে, ব্যাগ বানিয়ে নিজের ব্যয়ভার চালাতেন। তাঁর নিকট উটের পশমের একটি কম্বল ছিলো। তিনি দিনে সেটি পরিধান করতেন, আর রাতে গায়ে দিতেন। তিনি সারা বৎসর জেহাদ করতেন এবং বকরির পশম পরিষ্কার করে রশি বানাতেন। আর বকরির চামড়া দিয়ে থলে বানাতেন। যুদ্ধের সময় কারো রশি বা থলের প্রয়োজন হলে তিনি তাকে তা দান করতেন।

কথিত আছে, একদিন তিনি বাজারে যাচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি এক ঝুড়ি আপেল ক্রয় করে ঘরে পৌঁছানোর জন্য শ্রমিক খুঁজছিলো। লোকটি হজরত সালমান ফারসীকে দেখে ভাবলেন লোকটি হয়তো শ্রমিক। সে তাঁকে ডেকে

বললো, আপেলগুলো আমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো। হজরত সালমান ফারসী রা. আপেলের ঝুড়িটি মাথায় উঠিয়ে নিলেন। পরিচয় গোপন রাখলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর রাস্তায় এক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। সে বললো, আল্লাহ্‌তায়ালা আমীরকে ভালো রাখুন। আপেলের বোঝা পিঠে নেয়ার কারণ কী? তখন লোকটি বুঝতে পারলো, ইনি তো অন্য কেউ নন স্বয়ং হজরত সালমান ফারসী রা.। লোকটি তাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করলো। তিনি বললেন, তুমি আমাকে তোমার ঘর পর্যন্ত যেতে বলেছিলে। সুতরাং আমি তোমার বাড়িতে আপেলগুলো না পৌঁছে দিয়ে ফিরে যাবো না।

বর্ণিত আছে, হজরত সালমান ফারসী রা. বনি কিন্দা গোত্রের এক মহিলাকে বিবাহ করেন। তাঁদের দুটি ছেলে জন্মগ্রহণ করে। তাঁদের মাধ্যমে তাঁর বংশধারা জারী আছে। সেখানে আজ পর্যন্ত তাঁর বংশের লোক বিদ্যমান রয়েছে। তাঁরা সকলে জ্ঞানী ও গুণী।

অন্তিমযাত্রার সময় অনেক লোক তাঁকে দেখতে যান। তাঁরা দেখতে পান তিনি তাঁর উরুদ্বয়ের উপর হাত রেখে উচ্চস্বরে কাঁদছেন। বলছেন, আমার ক্রন্দন ও বিলাপ মৃত্যুর ভয়ে নয়। দুনিয়ার মোহেও নয়। রসূল স. আজ্ঞা করেন, কিয়ামত দিবসে আমার সাক্ষাৎ পেতে হলে এবং আমার কাছে পৌঁছতে হলে দুনিয়া থেকে দূরে থাকতে হবে। দুনিয়া থেকে এভাবে বিদায় নিতে হবে, যেভাবে আমি বিদায় নিচ্ছি। আর এখন আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছি, অথচ আমার কাছে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের মাল-দৌলত বিদ্যমান। ওই সময় হজরত সালমান ফারসী রা. এর ঘরে ছিলো একটি ঢোল-ডঙ্কা, একটি লোটা, একটি পানপাত্র, একটি চামড়ার পোশাক ও তাঁর পরিধানের একটি কম্বল। তা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।

বর্ণিত আছে, তিনি ২৫০ বৎসর হায়াত পেয়েছিলেন। কোনো বর্ণনায় ৩৫০ বছর উল্লেখ রয়েছে। ৩৬ হিজরীতে তিনি মাদায়েনে ইন্তেকাল করেন। হজরত আলী রা. মদিনা থেকে মাদায়েনে তাশরীফ আনেন এবং তাঁকে গোসল দিয়ে সে রাতেই মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

ইমাম কাসেম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর সিদ্দিক র.

বাতেনী সম্পর্ক ঃ ইলমে বাতেনে তিনি হজরত সালমান ফারসী রা. এর সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর বংশের ঊর্ধ্বতনদের মহাদৌলত

হজরত সালমান ফারসী রা. থেকে অর্জন করেন। তিনি ইমাম জয়নুল আবেদীন র. এর সান্নিধ্য লাভ করেন। এভাবে তাঁর মাধ্যমে হজরত আলী রা. এর নেসবত লাভে ধন্য হন।

তিনি উঁচু পর্যায়ের তাবেয়ী ছিলেন। মক্কার প্রসিদ্ধ সাত ফকীহ্দের একজন ছিলেন। ছিলেন সে যুগের প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন ও বিশ্বাসীদের মধ্যমণি। তিনি সাহাবাগণের এক জামাতের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁদের সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেন। অনেক তাবেয়ী তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাইদ র. বলেন, আমি ইমাম কাসেম ইবনে মোহাম্মদের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আর কাউকে দেখিনি। ইমাম মালেক ইবনে আনাস রা. সূত্রে বলেন, কাসেম এই উম্মতের সাত ফকীহ্দের একজন। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক র. বর্ণনা করেন— এক ব্যক্তি ইমাম কাসেম র. কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বড় আলেম, নাকি সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বড় আলেম? উত্তরে তিনি বলেন, সালেম পুণ্যবান মানুষ। তাঁর ইচ্ছা ছিলো হজরত সালমান রা. কে বড় আলেম বলতে, কিন্তু তিনি এজন্য বলেননি যে, যাতে তার কথা মিথ্যা না হয়। কেনোনা এতে সংশয় বিদ্যমান। এটাও বলেননি যে, আমি বড় আলেম, যাতে আত্মঅহমিকা সৃষ্টি হয়। ইমাম কাসেম র. ইমাম জয়নুল আবেদীনের খালাত ভাই। ইমাম সাহেবের জননী ইয়াজ দজর শাহরিয়ারের কন্যা ছিলেন। ইয়াজ দজর ছিলেন ইরাকের সম্রাট। ইমাম কাসেমের ইন্তেকালের তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।

গ্রহণযোগ্য মত হলো ১০১ হিজরীতে তিনি পরলোকগমন করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭০ বা ৮০ বৎসর।

হজরত ইমাম জাফর সাদেক র.

তিনি ইলমে বাতেনের দিক দিয়ে স্বীয় নানা কাসেম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর সিদ্দিক রা. এর সাথে সম্পর্কিত। দ্বিতীয় নেসবত বা সম্পর্ক সম্মানিত পিতা ইমাম বাকের র. এর সাথে। আর তাঁর সম্পর্ক ছিলো সম্মানিত পিতা ইমাম জয়নুল আবেদীনের সাথে। তাঁর সম্পর্ক ছিলো বুজর্গ পিতা শহীদগণের সরদার ইমাম হোসেন রা. এর সাথে । আর তাঁর সম্পর্ক ছিলো আমিরুল মুমিনীন হজরত আলী রা. এর সাথে।

ইমাম জাফর সাদেক র. বলেন, হজরত আবু বকর রা. থেকে আমি দু'বার জন্মলাভ করেছি। প্রথম জন্ম বাহ্যিক কেনোনা আমার নানা হলেন, হজরত আবু বকরের রা. এর নাতি কাসেম ইবনে মোহাম্মদ। দ্বিতীয় জন্ম রূহানী (গোপনীয়) কেনোনা এলমে বাতেন আমি আমার নানাজী থেকে লাভ করেছি।

সত্যকথা বলার কারণে তাঁর উপাধি ছিলো সাদেক। তাঁর সম্মানিত নানার উপাধি ছিলো সিদ্দিক। এই উপাধি তিনি রসূল স. থেকে লাভ করেছিলেন, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হজরত জিব্‌রাইল আ. রসূল স.কে জানিয়েছেন।

ইমাম জাফর সাদেক র. সাইয়েদ (নবী) বংশের খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা এবং নানা কাসেম ইবনে মোহাম্মদ র. ও নাফে, আতা, মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদির, জুহ্‌রী প্রমুখ থেকে ইলমে হাদিস অর্জন করেন। তাঁর থেকে ইমামে আজম আবু হানিফা, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী র. এবং ইবনে জুরাইজ, ইমাম মালেক, মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক এবং তাঁর ছেলে হজরত মুসা ইবনে জাফর, সুফিয়ান সওরী, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা এবং আরও অনেকে ইলমে হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন মান্যবর ইমাম ও মুসলিম জনতার কর্ণধার। এ ব্যাপারে সকলেই একমত ছিলেন। আমর ইবনে মেকদাম রা. বলেন, ইমাম জাফর সাদেককে দেখলেই আমার মনে হতো ইনি নবীবংশোদ্ভূত। তাঁর অনুপম চরিত্রমাধুর্য, অসীম সাহস, পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, কোরআনুল কারীমের তাফসীর জগদ্বিখ্যাত। বরং তাঁর ইঙ্গিত ও রহস্যতত্ত্ব সারা বিশ্বে সুবিস্তৃত। তাঁর সূক্ষ্ম কথা, অর্থবোধক বাণী বড় বড় মাশায়েখগণের নিকট সুবিদিত ও উজ্জ্বলতম নিদর্শনরূপে স্বীকৃত।

সুফীতত্ত্বে তাঁর কয়েকটি সুফীতত্ত্বসমৃদ্ধ গ্রন্থ রয়েছে। কথিত আছে— সুফী-মাশায়েখদের এলেম যা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগ পর্যন্ত বিদ্যমান তা ইমাম জাফর সাদেক র. পর্যন্ত পৌঁছেছে। তারপর তা ওই মহান ব্যক্তিদের অর্জিত হয়েছিলো, যাঁরা মাশায়েখগণের পবিত্র সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর যুগে নবীপরিবারের মধ্যে জ্ঞানে গুণে সবার শীর্ষে ছিলেন। তিনি দুনিয়াবিরাগী ও মুত্তাকী (খোদাভীরু) ছিলেন। কুপ্রবৃত্তি ও পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে দূরে থাকতেন। অত্যন্ত সজ্জন ছিলেন। বেশ কিছু সময় মদীনায় অবস্থান করেছেন। সুসমৃদ্ধ ও সুবিশাল জ্ঞানভাণ্ডার দ্বারা

মুরিদগণকে আলোকিত করতেন। অতঃপর তিনি ইরাকে তশরিফ আনেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। তিনি কখনো ইমামত বা বাদশাহীর ইচ্ছা পোষণ করতেন না। খেলাফত নিয়ে কারো সাথে সংঘাত করেননি। কারণ তিনি ছিলেন মারেফতের নিঃসীম সমুদ্রে সতত সন্তরণরত। তাই ছিলেন পৃথিবীর সম্মানাকাঙ্ক্ষা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

নেসবতে সিদ্দিকী ঃ আমাদের শায়েখ ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেসানী আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী র. লিখেন, হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. থেকে ওই নেসবত সালমান ফারসী রা. এর নিকট পৌঁছে এর ধারাবাহিকতা চলে এসেছে কাসেম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর সিদ্দিক র. পর্যন্ত। তারপর এ নেসবত কাসেম র. থেকে ইমাম জাফর সাদেক র. পর্যন্ত পৌঁছে। ইমাম কাসেম ছিলেন ইমাম জাফর সাদেকের নানা। এভাবে তিনি স্বীয় পিতা এবং মাতামহ উভয়ের থেকে ফয়েজ হাসিল করেন। এ জন্য তিনি ছিলেন সুলুকের পথে অগ্রগামী। জয্‌বা হাসিলের পর সুউচ্চ সুলুকের মাধ্যমে মকসুদে উপনীত হন। আর তিনি ছিলেন উভয় নেসবতের কেন্দ্রবিন্দু। এরপর এ নেসবত হজরত ইমাম জাফর থেকে আমানত হিশাবে সুলতানুল আরেফীনের আধ্যাত্মিক রাস্তায় সেটা ওয়াইসী ওলীর তরিকায় পৌঁছেছে। এ নূরকে তাঁর পৃষ্ঠদেশে আমানত রাখা হয়, যাতে করে তিনি তা উত্তরসূরীদের নিকট পৌঁছে দেন। কিন্তু সুলতানুল আরেফীনের মনোনিবেশ ছিলো অন্য দিকে। এই আমানত গ্রহণের পূর্বে এই নেসবতের সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিলো না। এরপর এই নেসবত উল্লেখিত ধারায় সুলতানুল আরেফীন থেকে শায়েখ খিরকানী র. এর নিকট পৌঁছে। তাঁর থেকে আবু আলী ফারমেদী র. এর নিকট পৌঁছে। তাঁর থেকে খাজা ইউসুফ হামাদানী র. পর্যন্ত পৌঁছে। হজরত খাজা ইউসুফের পর এ আমানত খাজা আবদুল খালেক গাজদাওয়ানী র. পর্যন্ত পৌঁছে, যিনি খাজেগানে সিলসিলার সরদার। এ অবস্থায় জয্‌বা ও উঁচুস্তরের সুলুকের মাধ্যমে পুনরায় এই নেসবত বিকশিত হয় (যা ইমামের জন্য বিশেষ অবস্থা ছিলো)। নতুন করে এই নেসবত সতেজতা ও সজীবতা লাভ করে। তিনি উক্ত মাকাম থেকে উরুজ (ঊর্ধ্বারোহণ) করে মাকামে সিদ্দিকীর স্তরে উপনীত হন। তিনি পূর্ণতার স্তর উঁচু রাখেন। হজরত খাজা আবদুল খালেক কুতুবগণের প্রধান ছিলেন।

এ ধারার মাশায়েখগণ এই নেসবতের জয্‌বার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। খাজা আবদুল খালেক এই নেসবতকে স্মরণীয় ও বরণীয় হিশাবে পরিগণিত করেন। খাজা আবদুল খালেকের পর খাজা নকশ্‌বন্দ কুদ্দিসা সিররুহু পর্যন্ত এ সিলসিলার মাশায়েখগণ অদৃশ্যে পরিভ্রমণ ও সিয়ারে আনফুসী বা আত্মিক পরিভ্রমণে মনোনিবেশ করে স্ব স্ব যোগ্যতা অনুযায়ী অংশ পেয়েছেন। এরপর যখন খাজা নকশ্‌বন্দের যুগ আত্মপ্রকাশ করে, তখন খাজা আবদুল খালেক র. রূহানিয়াতের মাধ্যমে তাঁকে তালিম-তরবিয়ত করেন। এই নেসবত জয্‌বা ও সুলুকের মাধ্যমে হজরত খাজা নকশ্‌বন্দ র. পর্যন্ত গিয়ে পূর্ণতার স্তরে উপনীত হয়। তাঁর খলিফাগণ হতে হজরত আলাউদ্দিন আত্তার, খাজা মোহাম্মদ পারসা কুদ্দিসা সিররুহু এই নেসবত হাসিল করেন। মুকাশিফাতে আয়নিয়া।

বাণী ঃ হজরত ইমাম বলেন,

مَنْ عَرَفَ اللّٰهُ اَعْرَضَ عَنْ مَّا سِوَاهُ -

(যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করলো, সে অন্য সকল বস্তু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো) আরেফ বিল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌র পরিচয়ধন্য ব্যক্তি) সকল কিছু থেকে দূরে সরে যান এবং সকল আসবাবকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেন। কেনোনা আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ অন্য সকল বস্তুকে অপরিচিত করে দেয়। আরেফ হক তায়ালা ব্যতীত অন্য সকল কিছু থেকে পৃথক হয়ে যান এবং আল্লাহ্‌র মিলন লাভ করেন। আরেফের হৃদয়ে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকে না। কাশফুল মাহ্‌যুব।

উপদেশ ঃ বর্ণিত আছে, একবার দাউদ তায়ী হজরত ইমাম সাহেবের দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূলের বংশধর! আমাকে কিছু নসিহত করুন। কেনোনা আমার হৃদয় কলুষিত হয়ে গেছে। তিনি বললেন, হে আবু সুলায়মান! তুমি নিজেই জামানার (এ যুগের) আবেদ ও জাহেদ। আমার উপদেশ তোমার কী প্রয়োজন?

দাউদ তায়ী বললেন, হে নবী পরিবারের নির্বাচিত ব্যক্তিত্ব! আপনার বুজর্গী সর্বজনস্বীকৃত। সকলের জন্যই আপনার নসিহত প্রয়োজন। তিনি বললেন, হে আবু সুলায়মান! আমি ওই কথার জন্য আশংকা করি, কিয়ামতের পরে যে দিন নানাজী আমাকে বলবেন, তুমি কেনো আমার অনুসরণ করোনি? তখন আমি কী বলবো? কেনোনা তাঁর আনুগত্য

অভিজাত ও উন্নত বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং আল্লাহ্তায়ালার দরবারে তাঁর পছন্দনীয় আমল গ্রহণযোগ্য, কুলীনতা নয়। একথা শুনে দাউদ তায়ী কেঁদে ফেললেন। ফরিয়াদ করতে লাগলেন, হে আমার আল্লাহ্! যাঁর জন্মউপাদান নবুওয়াতের খামির দ্বারা, যাঁর স্বভাব গঠিত রিসালাতের নিদর্শন দ্বারা, যাঁর নানা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যাঁর মাতৃকুলে রয়েছেন মহাপবিত্রা হজরত ফাতিমা রা. তিনি যদি এতো চিন্তিত হন, তাহলে দাউদের কী অবস্থা হবে? কীভাবে সে নিজেকে নিশ্চিত ও নিরাপদ মনে করবে?

তওবা ও ইবাদত ঃ তিনি বলেন, তওবা ছাড়া ইবাদত পরিশুদ্ধ হয় না। সুতরাং ইবাদাতের পূর্বে তওবা করে নাও। আল্লাহ্তায়ালা তওবাকারীদের নাম আগে উল্লেখ করেছেন। যেমন এরশাদ হচ্ছে— তারা তওবাকারী, ইবাদতকারী। তওবা হলো প্রথম স্তর আর দাসত্ব, ইবাদত শেষ স্তর ।

শাফায়াতের অঙ্গীকার ঃ বর্ণিত আছে, তিনি একবার তাঁর গোলামদের সাথে উপবিষ্ট ছিলেন। বললেন, এসো আমরা সবাই পরস্পর এই মর্মে অঙ্গীকার করি যে, আমাদের মধ্য থেকে কিয়ামত দিবসে যে মুক্তি পাবে, সে সবার জন্য সুপারিশ করবে। তারা বললো, হে রসূলুল্লাহ্র বংশধর! আমাদের সুপারিশে আপনার কী প্রয়োজন? আপনার সম্মানিত নানাজান সকলের সুপারিশকারী। তিনি বলেন, নিজের অবস্থা ও আমলের প্রতি লক্ষ্য করে আমার এরকম মনে হচ্ছে, কিয়ামত দিবসে সম্মানিত নানাজির চেহারা মোবারক দেখতে পাবো কি?

ওসিয়ত ঃ সুফিয়ান সাওরী র. ওসিয়ত করার জন্য আবেদন করলেন। তিনি বললেন, সুফিয়ান! শোনো, মিথ্যাবাদীর মধ্যে গাম্ভীর্য থাকে না। হিংসাকারীর শান্তি মিলে না। আর দুশ্চরিত্রের বুজর্গী নসিব হয় না। বাদশাহ্রা বন্ধু পায় না। সুফিয়ান র. বলেন, দয়া করে আরও কিছু উপদেশ দান করুন। তিনি বললেন, হে সুফিয়ান! আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বস্তু হতে বিরত থাকো, তাহলে আবেদ হতে পারবে। আল্লাহ্তায়ালা ভাগ্যে যা রেখেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকো, তাহলে মুসলমান হতে পারবে। অসৎ লোকদের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকবে। অন্যথায় অসৎ তোমার উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে। নিজের কাজে সেসকল লোকের পরামর্শ নিবে, যারা আল্লাহ্র অনুগত। সুফিয়ান আবেদন করলেন, আরও কিছু বলুন। তিনি বললেন, হে সুফিয়ান! যে ব্যক্তি বংশীয়, গোত্রীয় আধিপত্য ছাড়া সম্মানপ্রার্থী হয় এবং

শান-শওকত ব্যতীত প্রভাব-প্রতিপত্তি চায়, সে যেনো অবাধ্যতার লাঞ্ছনা থেকে বের হয়ে আনুগত্যের সম্মানের দিকে ধাবিত হয়। সুফিয়ান বললেন, হজরত আরও কিছু শুনতে চাই। তিনি বললেন, হে সুফিয়ান! যে ব্যক্তি অসৎ বন্ধুর সান্নিধ্যে থাকে সে নিরাপদ নয়। আর যে মন্দ রাস্তায় চলে তার বদনাম হয়। আর যে তার জিহ্বাকে সংযত রাখে না, সে লজ্জিত হয়। তাজকেরাতুল আউলিয়া।

মোরাকাবা ও মহব্বত সম্পর্কে বাণী ঃ যে মারেফাত দ্বারা আল্লাহ্-তায়ালার সাথে মোরাকাবায় মিলিত হওয়া যায় না, যে মহব্বত দ্বারা চিরস্থায়ী ভালোবাসা লাভ হয় না, তা ধোকা ও প্রতারণা।

বাণী ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার সাথে মহব্বত রাখে, সে সৃষ্টজীব থেকে পৃথক হতে সক্ষম। আর যে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের সাথে বন্ধুত্বাভিলাষী, সে কুমন্ত্রণাপ্রভাবিত।

বাণী ঃ অনেক অবাধ্যতা বান্দাকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দেয়। আবার অনেক আনুগত্য বান্দাকে আল্লাহ্তায়ালা থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করে দেয়। কেনোনা অনেক সময় আনুগত্যশীল আত্মঅহমিকা অবাধ্যতায় পর্যবসিত হয়। আর লজ্জিত গুনাহ্গার হয়ে যায় আনুগত্যশোভিত। তাজকেরাতুল আউলিয়া, প্রথম অধ্যায়।

চিন্তার ঔষধ ঃ তিনি বলেন, যদি কেউ কষ্টে নিপতিত হয় এবং দুশ্চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তবে পাঁচবার 'রব্বানা' 'রব্বানা' বলবে। আল্লাহ্-তায়ালা তাঁকে চিন্তা ও পেরেশানী থেকে মুক্তি দিবেন। আর সে যা চাইবে তা-ই পাবে। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াত তেলাওয়াত করলেন—

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ.......فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى

(আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রহিয়াছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য .... অতঃপর তাহাদের প্রভুপালক তাহাদের ডাকে সাড়া দিয়া বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কর্মে নিষ্ঠ কোনো নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না .....। সূরা আলে ইমরান আয়াত ১৯০-১৯৫)।

তিনি বলেন, এই আয়াতের গুণাবলী অবগত হয়ে লোকেরা শুধু 'রব্বানা' 'রব্বানা' পড়তো এতেই তাদের দোয়া কবুল হতো।

বাণী ঃ একদা ইমাম জাফর সাদেক র. অনেক দরবেশসহ একস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো কতিপয় বিত্ত ব্যক্তিত্ব। তিনি তাদেরকে তাঁর সম্মুখভাগে বসতে বললেন। এতে কেউ কেউ অস্বস্তি প্রকাশ করে বসলেন। তিনি বললেন, এরা সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। যদি প্রজাসাধারণ বাদশাহ্র সামনে উপবেশন করে, তাহলে এতে কোনো দোষ হয় না।

বাণী ঃ ইমাম জাফর সাদেক র. একবার জিজ্ঞেস করলেন, বুদ্ধিমান কে? তারপর নিজেই জবাব দিলেন, তিনিই বুদ্ধিমান, যিনি ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম। তিনি বলেন, চতুষ্পদ প্রাণীও প্রহারকারী এবং খাদ্যদানকারীকে চিনে। ইমাম আবু হানিফা র. একদা ইমাম জাফর সাদেক র. কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নিকট জ্ঞানী কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি দু'টি ভালো ও দু'টি মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। যাতে করে দু'টি ভালোর মধ্যে অধিক ভালোকে গ্রহণ করা যায় আর দু'টি মন্দ থেকে যেটা বেশি মন্দ তা থেকে বেঁচে থাকা যায়। তাজকিরাতুল আউলিয়া।

দিদারে ইলাহী

কারামাত ১ ঃ একবার এক ব্যক্তি তাঁর নিকট নিবেদন করলো, আমাকে আল্লাহ্র দীদার লাভ করিয়ে দিন। তিনি বললেন, তুমি কি শোনোনি, নবী মূসা আ. কে বলা হয়েছে لَنْ تَرَانِىْ (তুমি আমাকে কখনো দেখতে পাবে না)। লোকটি বললো, সেটা ছিলো নবী মূসার যুগ। আর এটা তো মোহাম্মদ স. এর জামানা। رَاٰى قَلْبِىْ رَبِّىْ (আমার হৃদয় আমার প্রভুপালককে দেখেছে)। আরেকজন বলেন, আমি ওই আল্লাহ্র ইবাদত করতাম না, যাকে দেখিনি। ইমাম জাফর সাদেক র. বললেন, লোকটিকে বেঁধে দজলা নদীতে নিক্ষেপ করো। তাই করা হলো, পানিতে সে হাবুডুবু খেতে লাগলো। ফরিয়াদ করতে লাগলো। হে রসূলুল্লাহর সন্তান! আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বললেন, হে পানি! তুমি

তাকে উপরে নিচে উঠা-নামা করতে থাকো। লোকটি পুনরায় বললো, হে রসূলুল্লাহর বংশধর! আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে সাহায্য করুন। তিনি পানিকে নির্দেশ দিলেন, তুমি তাকে পুনঃ পুনঃ উপরে নিচে উঠা-নামা করতে থাকো। পানি তা-ই করতে লাগলো। সে পুনঃ পুনঃ ইমাম জাফর সাদেক র. এর কাছে সাহায্য চাইলো। যখন তার আশা ভরসা শেষ হলো আর পানি তাকে নিচে নিয়ে গেলো, তখন সে বলতে লাগলো, ইয়া ইলাহী! আমাকে সাহায্য করো, আমাকে বাঁচাও। তখন ইমাম জাফর সাদেক র. বললেন, এবার তাকে পানি থেকে বের করে আনো। তাকে তীরে তুলে আনা হলো। কিছুক্ষণ পর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আল্লাহ্‌কে দেখেছো? সে বললো, যতোক্ষণ পর্যন্ত আমার দৃষ্টি অন্যের দিকে ছিলো ততোক্ষণ পর্যন্ত আমার ও আল্লাহ্‌তায়ালার মধ্যে অন্তরায় ছিলো। কিন্তু যখন একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করলাম, তখন আমার হৃদয়বলয়ে একটি ছিদ্র উন্মোচিত হলো। আমি সেই ছিদ্রপথে আল্লাহ্‌তায়ালার দীদার লাভ করলাম। তিনি বললেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত অপারগ, অক্ষম না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত এরকম হবে না। আল্লাহ্‌তায়ালা অপারগের দোয়া কবুল করেন, যখন সে তাঁকে ডাকে। যতোক্ষণ তুমি জাফর সাদেককে ডাকছিলে, ততোক্ষণ তুমি ছিলে মিথ্যাবাদী। এখন তুমি ওই ছিদ্রকে সংরক্ষণ করো। তাহলে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হবে। তাজকিরাতুল আউলিয়া ১ম খণ্ড।

ইমাম জাফর সাদেক বলেন, যে ব্যক্তি এমন বলবে, আল্লাহ্‌তায়ালা বস্তুর উপর বা কোনো বস্তুতে বিদ্যমান তাহলে সে কাফের হবে।

তাজকিরাতুল আউলিয়া গ্রন্থে এটা ইমাম সাহেবের উক্তি হিশাবে বর্ণিত হয়েছে। আর রিসালায়ে কুশায়রিয়ায় প্রথম পরিচ্ছেদে কথাটি আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কেউ যদি বলে, আল্লাহ্‌তায়ালা কোনো বস্তুর ভিতর বা কোনো বস্তুতে বা কোনো বস্তুর উপর বিদ্যমান, তাহলে ওই বস্তুটি আল্লাহ্‌তায়ালাকে বহনকারী হবে, আর আল্লাহ্‌তায়ালা বহনকৃত হবেন। যদি আল্লাহ্‌তায়ালা কোনো বস্তুর ভিতর থাকেন, তাহলে তিনি সীমাবদ্ধ হয়ে যাবেন। আর যদি কোনো বস্তু থেকে বের হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি হাদেস বা বিনাশশীল সাব্যস্ত হবেন। অর্থাৎ প্রথমে তিনি বিদ্যমান ছিলেন না, পরে বিদ্যমান হয়েছেন বা অস্তিত্বে এসেছেন। এ সকল কথা অংশীবাদিতাদুষ্ট।

কারামত ২ ঃ এক বুজর্গ বলেন, একবার আমি ইমাম জাফর সাদেক র. এর সাথে মক্কা শরীফ গমন করি। হঠাৎ এক নারীর পাশ দিয়ে যেতে হলো। দেখলাম, তার সামনে একটি মৃত গাভী পড়ে আছে। আর ওই মহিলা বাচ্চাদের নিয়ে কান্নাকাটি করছে। ইমাম সাহেব প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। মহিলা বললো, আমি ও আমার সন্তানাদি এই গাভীর দুধ খেয়ে জীবন যাপন করতাম। গাভীটি মরার কারণে আমরা অভুক্ত ও অসহায়। ইমাম সাহেব বললেন, তুমি কি চাও, আল্লাহ্তায়ালা তোমার গাভীটিকে পুনরায় জিন্দা করে দিন? মহিলা বললো, তুমি আমার বিপদের সময় আমার সাথে উপহাস করছো? তিনি বললেন, না, উপহাস নয়। অতঃপর তিনি দোয়া করলেন। তাঁর পা মৃত গাভীর উপর রাখলেন ও আওয়াজ দিলেন। গাভী উঠে দাঁড়ালো এবং সুস্থ হয়ে গেলো। হজরত ইমাম জাফর সাদেক র. লোকদের সাথে মিশে গেলেন, যাতে কেউ তাঁকে চিনতে না পারে। শাওয়াহিদুন্ নবুওয়াত পৃষ্ঠা ৩৩৩।

ইমাম জাফর সাদেক র. ৮০ হিজরীতে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। মদীনাতেই ১৪৮ হিজরীতে শাওয়াল মাসে ৬৮ বছর বয়সে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। আকমাল ফী আসমাইর রিজাল ও শাওয়াহিদুন্ নবুওয়াত পৃষ্ঠা ৩২৭ ।

হজরত বায়েজীদ বোস্তামী র.

এলমে বাতেনে তিনি হজরত জাফর সাদেক র. এর দীক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন। তবে তা ছিলো আত্মিকভাবে। কেনোনা শায়েখের জন্ম ইমাম জাফর সাদেক র. এর ইন্তেকালের পরে হয়েছে। তিনি ইমাম জাফর সাদেক থেকে উয়াইসী নিয়মে ফয়েজপ্রাপ্ত হন। তাজকিরাতুল আউলিয়া গ্রন্থে রয়েছে, তিনি ১১৩ জন পীরের খেদমত করেছেন এবং তাঁদের সকলের কাছ থেকে বরকত লাভে ধন্য হয়েছেন। তাঁদের প্রধানতম ছিলেন ইমাম জাফর সাদেক র.।

কোনো কোনো কিতাবে বাহ্যিক সাক্ষাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর ভাষ্যমতে তাঁর নেসবত— ইমাম আলী রেযা, ইমাম মূসা কাযেম, ইমাম জাফর সাদেক র.। এভাবে তিনি ছিলেন হজরত মারুফ কারখী র. এর পীর ভাই।

ইমাম জাফর সাদেক র. এর মাজারে উপস্থিত হলে কাশফের মাধ্যমে এ ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিলো। কেনোনা গ্রন্থকার নিজেই উল্লেখ করেছেন, শায়েখের জন্ম ইমাম জাফর সাদেকের ওফাতের পরে হয়েছিলো। আল্লাহ্তায়ালাই ভালো জানেন। নুফহাতুল উন্স, রিসালায়ে কুশাইরিয়া, তাবাকাতু সুফীয়া।

কথিত আছে, তিনি একবার ইমাম জাফর সাদেকের খেদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁকে বললেন, বায়েজীদ! ওই কিতাবটি তাক থেকে নামাও। বায়েজীদ জিজ্ঞেস করলেন, তাক কোথায়? ইমাম বললেন, এতোদিন ধরে এখানে থাকো, অথচ তাক কোথায় জানো না? তিনি বললেন, তাক দিয়ে আমি কী করবো। আমি তো মাথা ওঠাই না। ভ্রমণ ও দর্শনের জন্য আমি তো আপনার কাছে আসিনি। ইমাম বললেন, অবস্থা যখন এরকম, তখন কী আর করা। তুমি বোস্তামে চলে যাও। তোমার কাজ পূর্ণ হয়েছে।

নাম ও কামালত ঃ তাঁর নাম তাইফুর ইবনে ঈসা ইবনে আদম ইবনে সারুশান। দাদী অগ্নিপূজক ছিলেন। পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি আহমদ খাজরুইয়্যা র., আবু হাফস র. এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুয়াজ র. এর সমসাময়িক ছিলেন। শাকীক বলখীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিলো। তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ শায়েখ, বড় ওলী, সুলতানুল আরেফীন, বুরহানুস্ সিদ্দিকীন, আল্লাহ্র দলিল, খলিফা কুতুবে আলম ও আওতাদগণের শিরোমণি ছিলেন। তাঁর সাধনা, মুজাহাদা, মর্যাদা ও কারামত অনেক। তাঁর বাণী ও কামালত সুবিদিত। রেওয়ায়েত ও এলমে হাদিসে তাঁর সূত্রপরম্পরা ছিলো অতি উচ্চ। তরিকতের অর্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে লোকদের প্রশংসা অপেক্ষা ছিলেন অধিক ঊর্ধ্বস্তরের।

সায়্যিদুত্ তায়েফা হজরত জুনাইদ বাগদাদী র. বলেন, বায়েজীদ আমাদের দলে এমন, যেমন ফেরেশতাদের দলে হজরত জিবরাইল আ.। তিনি আরও বলেন, তাওহীদের ময়দানে গমনকারীদের শেষ স্তর এই খোরাসানীর (বায়েজীদ বোস্তামী র.) শুরু। আল্লাহ্র সৈনিকগণ যখন শুরু কদমে পৌঁছতো, তখন সেটাই হতো তাদের শেষ মাকাম। এজন্য তিনি সেই মাকামে অবতরণ করেন এবং সেখানেই অবস্থান করেন। এ কথার প্রমাণ হলো তাঁর এই বাণীখানি— তিনি বলেন, দুইশত বছর বাগানে ঘোরাফেরা করবেন, তাহলে আমাদের মতো একটি ফুল প্রস্ফুটিত হবে। শায়েখ আবু সাঈদ আবুল খায়ের র. বলেন, আঠারো হাজার আলমকে

বায়েজীদের সাথে উপস্থিত দেখতাম। কিন্তু তাঁকে আমাদের মধ্যে পেতাম না। অর্থাৎ বায়েজীদ আল্লাহ্‌র প্রেমে সতত ডুবন্ত ছিলেন।

সত্যের সন্ধান ঃ শৈশব কালেই আল্লাহ্‌ অন্বেষণের ইচ্ছা মনে জাগ্রত হয়েছিলো, একদিন তিনি ওস্তাদের কাছে কোরআনুল করীম পড়ছিলেন। যখন সূরা লোকমানের এই আয়াতে উপনীত হলেন—

اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ

(সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। সূরা লোকমান আয়াত ১৪) তখন এই বাণী তাঁর হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করলো। তিনি ওস্তাদের অনুমতি নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। পিতা মাতাকে বললেন, আমি কোরআন মজিদে এই আয়াতখানি পাঠ করলাম, যেখানে আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন— আমার প্রতি ও পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমি দুই ঘরের যথার্থ খেদমত করতে পারবো না। এ আয়াতের কারণে আমি চিন্তিত। হয় আপনারা আমাকে আল্লাহ্‌তায়ালা থেকে চেয়ে নিন, আমি শুধু আপনাদের হয়ে যাবো, অথবা আল্লাহ্‌র জন্য আমাকে ছেড়ে দিন— আমি শুধু তাঁরই হয়ে যাবো। তাঁর পিতা-মাতা বললেন, তোমাকে আল্লাহ্‌র জন্য ছেড়ে দিলাম। নিজেদের হক মাফ করে দিলাম। অতঃপর তিনি বোস্তাম নগরী থেকে চলে যান। ৩০ বছর পর্যন্ত সিরিয়ার জঙ্গলে ঘুরতে থাকেন। রিয়াজত ও মুজাহাদা করতে থাকেন। অধিকাংশ সময় ক্ষুধার্ত থাকতেন তিনি। যখন তিনি নামাজে দাঁড়াতেন, তখন আল্লাহ্‌তায়ালার মাহাত্ম্য ও শরীয়তের মর্যাদার প্রভাবে তাঁর বক্ষপিঞ্জরের অস্থি থেকে চটচট আওয়াজ বের হতো। লোকজন তা শুনতে পেতো। তাজকিরাতুল আউলিয়া ১৫৮ পৃষ্ঠা, কাশফুল মাহ্‌যুব ১৭১ পৃষ্ঠা, তানাকাতু সুফীয়া ৯০১ পৃষ্ঠা, নুফহাতুল উন্‌স ৬৫ পৃষ্ঠা।

শরীয়ত ও তরিকত ঃ তিনি বলেন, একবার লোকেরা আমাকে বললো, অমুক স্থানে একজন পীর রয়েছেন। আমি তাঁকে দেখার জন্য গেলাম। যখন নিকটে পৌঁছলাম, তখন সে কেবলার দিকে মুখ করে থুথু ফেললো। সাথে সাথে আমি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম। আমার মন বললো, যদি পীরের হৃদয়ে তরিকতের মর্যাদা থাকতো, তাহলে সে শরীয়তের অপছন্দীয় কাজ করতো না।

তাজকিরাতুল আউলিয়া এবং রেসালায়ে কুশাইরিয়াতে রয়েছে— এক লোক তাঁকে বললো, চলো আমরা এমন এক ব্যক্তিকে দেখে আসি, যিনি ওলী হিশাবে প্রসিদ্ধি পেয়েছেন। লোকটি সাধনার কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো। দূর দূরান্ত থেকে লোকজন তার কাছে আসতো। যখন আমরা তার কাছে গেলাম, তখন সে ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে যাচ্ছিলো। সে কেবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করলো। এটা দেখে বায়েজীদ ফিরে এলেন। তাকে সালামও বললেন না। বললেন, লোকটি রসূল স. এর আদবসমূহ থেকে একটি আদবেরও আমানতদার নয়। সে কীভাবে বেলায়েতের দাবিদার হতে পারে? কীভাবে হতে পারে নির্ভরযোগ্য। তাজকিরাতুল আউলিয়া পৃষ্ঠা ১২০।

বাণী ঃ একবার তিনি বললেন, আমার ঘর থেকে মসজিদ চল্লিশ কদম দূরে। মসজিদের সম্মানের খাতিরে আমি রাস্তায় থুথু নিক্ষেপ করি না। তাজকিরাতুল আউলিয়া।

হজের সফর ও জিয়ারত

বর্ণিত আছে, তিনি মক্কা মুয়াজ্জমায় সফর করেছিলেন। বারো বছরে সেখানে উপনীত হয়েছিলেন। কয়েক কদম গিয়ে জায়নামাজ বিছাতেন এবং দু'রাকাত নামাজ আদায় করতেন।

ইলহাম ঃ তিনি বলেন, আল্লাহ্র ঘর তো সাধারণ রাজা বাদশাহ্দের দরবার নয় যে, গিয়েই ঢুকে যাবো। এক বছরেই পৌঁছে যাবো। তিনি সে বছর মদিনায় না গিয়ে ফিরে এলেন। বললেন, মদিনার সফরকে মক্কার তাবে (অনুগত) বানানো ঠিক না। এটা আদবের পরিপন্থী। দ্বিতীয় বছর শুধু মদিনা জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর শুরু করলেন। এক শহরে প্রবেশ করলে মানুষের একটি বড় দল তাঁর পিছনে চলতে থাকে। তিনি শহরের বাইরে চলে এলেন। অনেক লোকের সমাগম দেখে তিনি তাঁদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললো, আমরা আপনার সাথে থাকতে চাই। আর তিনি চাইলেন, তাদের মহব্বত যেনো তাঁর কাছ থেকে দূর হয়ে যায়। তাই তিনি ফজরের নামাজ শেষে তাদের দিকে মুখ করে এই আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন - إِنَّنِىٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا فَٱعْبُدْنِى (আমিই আল্লাহ্, আমা ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। অতঃএব আমারই ইবাদত

করো। সূরা ত্বাহা আয়াত ১৪২)। লোকজন ধারণা করলো, তিনি পাগল। তারা তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেলো। মূলতঃ তিনি কোরআনুল করীমের একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছিলেন। কিন্তু লোকজন মনে করলো তিনি খোদায়ী দাবি করছেন। তাজকিরাতুল আউলিয়া পৃষ্ঠা ১২০।

পূর্ণতা ঃ যুন্নূন মিশরী র. এক ব্যক্তিকে বলে পাঠালেন, তুমি গিয়ে বায়েজীদকে বোলো, আপনি সারারাত শুয়ে থাকেন এবং আরামে ব্যয় করেন, অথচ কাফেলা চলে গিয়েছে। উত্তরে তিনি বলেন, মহান সে, যে সারারাত শয়ন করে থাকেন, আর সকালে উঠে সবার পিছনে রওয়ানা দিয়ে মনজিলে সবার আগে উপনীত হয়েছেন। যুন্নূন এ অবস্থা শুনে বলেন, বায়েজীদকে অভিনন্দন। তাঁর অবস্থা এ পর্যন্ত উপনীত হয়েছে।

বাণী ঃ তিনি এক ব্যক্তিকে মসজিদে নামাজ পড়তে দেখে বললেন, তুমি যদি এটা মনে করে বসে থাকো যে, নামাজ তোমাকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছাবে, তাহলে তুমি ভুল বুঝেছো। আর এটা স্পষ্ট অহমিকা। নামাজ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম বটে। তুমি সহীহ্ভাবে নামাজ না পড়লে কাফের হবে না। কিন্তু নিজেকে সামান্যতম আস্থাশীল জ্ঞান করলে মুশরিক হয়ে যাবে।

বাণী ঃ তিনি বলেন, কোনো কোনো লোক এমন যে, যাদের জন্য আমাদের সাক্ষাতের ফল অভিসম্পাত, আবার কারো জন্য রহমত। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, কীভাবে? তিনি বললেন, কেউ আমাদের কাছে আসে এমন সময়ে যখন আমরা বিশেষ অবস্থায় থাকি। তখন আমরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকি না। ওই অবস্থায় লোকটি আমাদের গীবত করে, ফলে তার পরিণাম হয় অভিসম্পাত। আবার কেউ এসে আমাদের উপর হককে বিজয়ী দেখে, তখন সে আমাদেরকে অপারগ মনে করে। ফলে তার উপর রহমত হয়।

সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া ঃ তিনি বলেন, আমি কামনা করি, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হোক আর আমার তাঁবু দোজখের কিনারায় স্থাপন করি, যাতে দোজখ আমাকে দেখে শীতল হয়ে যায় আর আমি সৃষ্ট জীবের জন্য দয়ার কারণ হতে পারি। তাজকিরাতুল আউলিয়া।

সহজ রাস্তা ঃ তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্তায়ালাকে স্বপ্নে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, হে দয়াময় প্রভুপালক! তোমার পর্যন্ত আসার রাস্তা কোনটি? তিনি এরশাদ করলেন, তুমি তোমার নফসকে বর্জন করো এবং

এসে যাও। অর্থাৎ যখন তুমি তোমার আমিত্বকে বর্জন করবে, তখনই আমার দেখা পাবে। নুফহাতুল উন্‌স।

তিনি আরও বলেন, নামাজে দাঁড়ানো ছাড়া, আর রোজার মাসে উপবাস ছাড়া আর কিছুই দেখিনি। যা কিছু আমি পেয়েছি আল্লাহ্‌তায়ালার অনুকম্পায়, আমল দ্বারা নয়। মেহনত ও উপার্জন দ্বারা কিছুই অর্জিত হয়নি।

'তাজকিরাতুল আউলিয়া' নামক গ্রন্থের ১৮৫ পৃষ্ঠায় শায়েখের এই অভিমত দ্বারা বাহ্যিকভাবে বোঝা যায় যে, আমল নিরর্থক। অথচ শায়েখের উদ্দেশ্য এটা নয়। কেনোনা তাজকিরাতুল আউলিয়া নামক কিতাবে শায়েখের আরও কিছু বাণী উল্লেখ আছে, যা এ সন্দেহকে দূর করে দেয়। যেমন শায়েখ বলেন, উভয় জগতের নেয়ামত হতে একথা ভালোভাবে বোঝা উচিত যে, মানুষের চেষ্টা, চিন্তা-গবেষণা দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার করুণা ছাড়া কিছুই লাভ হয় না। মানুষকে চেষ্টা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই চেষ্টা করা মানুষের জন্য অবশ্যকরণীয় কাজ। কিন্তু চেষ্টা করার পর যা অর্জিত হয় তা আল্লাহ্‌তায়ালার অনুকম্পা, দয়া। এটা নিশ্চিত ধারণা রাখবে। নিজের চেষ্টার বিনিময় মনে করবে না। কেনোনা চেষ্টার জন্য শক্তি আল্লাহ্‌তায়ালাই দান করেছেন।। শক্তি অর্জনে আমাদের চেষ্টার দখল নেই। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেন—

مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۖ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ-

(কল্যাণ যা তোমার হয় তা আল্লাহ্‌র নিকট হতে আর অকল্যাণ যা হয় তা তোমার নিজের কারণে। সূরা নিসা আয়াত ৭৯)।

অনুরূপ এমন একটি হাদিস বর্ণিত আছে, যে হাদিসটি শোনার পর উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. রসূল স. এর নিকট আবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার জন্যও কি আল্লাহ্‌র করুণা ও দয়াতে জান্নাত লাভ হবে। তিনি স. বলেন, হ্যাঁ। আমিও জান্নাত লাভ করবো আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুকম্পাতে।

আল্লাহ্‌র নিকট নবী ও ওলীদের কেমন বিনয় ও নম্রতা দেখুন। এ দৌলতের কারণেই মকবুলিয়াত অর্জিত হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদেরকেও সেই দৌলত দ্বারা ভরপুর করে দিন। আমীন।

অক্ষমতা প্রকাশ ঃ তিনি জীবনসায়াহ্নে বলেন, হে ইলাহী! আমি তোমার স্মরণ করেছি উদাসীনতার সাথে, আর তোমার ইবাদত করেছি খুবই অলসতার সাথে। নুফহাতুল উন্‌স ৬৫ পৃষ্ঠা, তাজকিরাতুল আউলিয়া ২০৭ পৃষ্ঠা, তাবাকাত ৯০ পৃষ্ঠা।

ইলহাম ঃ একদা তিনি একটি লাল আপেল হাতে নিলেন। বললেন, এটা কতোইনা লতীফ (সূক্ষ্ম)। তখনই তাঁর কলবে একটি আওয়াজ ভেসে এলো, হে বায়েজীদ! তোমার লজ্জা করে না। তুমি আমার লতীফ নামটি আপেলের সাথে মিলিয়েছো। এ ঘটনার পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাঁর অন্তর থেকে (ইসমে আজম) আল্লাহ্‌র মহান নাম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিলো। তিনি শপথ করে বলেন, যতোদিন জীবিত থাকবো, ফলের নাম নিবো না এবং বোস্তামের ফল খাবো না।

ইলহাম ঃ একবার আমার কঠিন অবস্থা যাচ্ছিলো। আমি ইবাদত করা থেকে নিরাশ হয়েছিলাম। বাজারে যাচ্ছিলাম একটি পৈতা ক্রয় করে কোমরে বাঁধার জন্য। একটি পৈতা লটকানো দেখতে পেলাম। আমি ভেবেছিলাম এক দিরহামেই পাবো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, পৈতা কত টাকায় বিক্রি করবে? সে বললো, এক হাজার দিনারে। আমি অবাক হলাম। এমন সময় গায়েব থেকে আওয়াজ এলো। তুমি জানো না, যে পৈতা তোমার কোমরে বাঁধা হবে তার দাম এক হাজার দিনার। আমি আনন্দিত হলাম এই ভেবে যে, মহান আল্লাহ্‌তায়ালা আমার উপর প্রসন্ন হয়েছেন। তাজকিরাতুল আউলিয়া পৃষ্ঠা ১৭২।

ইলহাম ঃ আমার হৃদয়ে প্রতিধ্বনি হলো, হে বায়েজীদ! তুমি যদি আমাকে চাও তাহলে গ্রহণযোগ্য অনুসরণ এবং পছন্দনীয় খেদমত যা তুমি আমার দরবারে এনেছো এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু আনো যা আমার নিকট নেই। আমি নিবেদন করলাম, হে আমার আল্লাহ্! সেটা কোন্ বস্তু, যা তোমার কাছে নেই? তিনি বললেন, অক্ষমতা, অপারগতা, হীনতা।

কারামত ১ ঃ সুলতানুল আরেফীনের জননী বলেন, গর্ভবতী অবস্থায় যখন আমি কোনো সন্দেহযুক্ত খাদ্য খেতাম তখন সে পেটের মধ্যে এমনভাবে নড়াচড়া করতো ও মোচড় দিতো যে, আমি অস্থির হয়ে পড়তাম, যে পর্যন্ত না আমি সেই লোকমা বের করে দিতাম। এ কথার সত্যায়ন এভাবে হয় যে, তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, এ রাস্তায় পুরুষের জন্য উত্তম কোনটি? তিনি উত্তরে বলেন, জন্মগত স্বভাব, যদি এটা

না হয় তাহলে শক্তি এবং শরীর। বলা হলো, যদি এটাও না হয়। তিনি বলেন, হঠাৎ মৃত্যু। তাজকিরাতুল আউলিয়া ১৫৯ পৃষ্ঠা।

কারামত ২ ঃ একদা নির্জনে তাঁর মুখ থেকে বের হলো—

سُبْحَانِىْ مَا اَعْظَمَ شَانِىْ (আমার পবিত্র সত্তা। কতোইনা মহান আমার মর্যাদা)। যখন তিনি স্বাভাবিক হলেন তখন তাঁর মুরিদগণ বললেন, এরকম কথা তাঁর মুখ থেকে বের হয়েছে! তিনি বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের শত্রু এবং বায়েজীদ তোমাদের শত্রু। এরপর যদি আমার মুখ থেকে এ ধরনের শব্দ বের হয়, তাহলে আমাকে মেরে টুকরা টুকরা করবে। একথা বলে তিনি প্রত্যেকের হাতে একটি করে ছুরি দিলেন। ঘটনাক্রমে দ্বিতীয়বার তাঁর মুখ থেকে উক্ত কালেমা বের হলো। তাঁর মুরিদগণ তাঁকে হত্যা করার মনস্থ করলো। বাড়িতে লোকে লোকারণ্য। তাঁর প্রিয়জনেরা তাঁকে ইট পাথর দিয়ে মারতে লাগলো। তাঁর শরীরে ছুরি চালালো। মনে হচ্ছিলো পানির মধ্যে ছুরি চালানো হচ্ছে। যখন সেই অবস্থা দূর হলো এবং তিনি স্বাভাবিক হলেন, তখন মনে হচ্ছিলো তিনি একটি ক্ষুদ্র পাখি। তাঁকে মিম্বারের উপর উপবিষ্ট দেখা গেলো। মুরিদগণ তাঁর নিকট এ সকল ঘটনার বর্ণনা করলেন। শায়েখ বললেন, বায়েজীদ তো এই, এখন যাকে তোমরা দেখছো। আর সেই সময় এই বায়েজীদ ছিলো না। তাজকিরাতুল আউলিয়া পৃষ্ঠা ১৬৫ ।

কারামত ৩ ঃ শাকীক বলখী র. এবং আবু তুরাব র. তাঁর কাছে এলেন। পূর্বে পাকানো খাদ্য মেহমানদের জন্য আনা হলো। এক মুরিদ তাঁদের সাথে শরীক হলো না। আবু তুরাব বললেন, এক মাস রোজার সওয়াব নাও এবং রোজা ভেঙে আহার গ্রহণ করো। সে বললো, রোজা ভাঙতে পারবো না। শাকীক র. বলেন, খাদ্য গ্রহণ করো এবং এক বছরের সওয়াব নাও। সে বললো, আমি রোজা ভাঙতে পারবো না। বায়েজীদ র. বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। সে আল্লাহ্‌র দরবার থেকে বিতাড়িত। কিছু দিন পর সে চুরির অপরাধে গ্রেফতার হলো এবং তার উভয় হস্ত কর্তন করা হলো। তাজকিরাতুল আউলিয়া পৃষ্ঠা ৯৭১, রেসালায়ে কাশমেরীয়া পৃষ্ঠা ৫১৩।

কারামত ৪ ঃ একদা তিনি রাস্তা দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। একটি কুকুর তাঁর সাথে চলতে লাগলো। তিনি আঁচল গুটিয়ে নিলেন। কুকুর

বললো, হে শায়েখ! যদি আমি শুষ্ক থাকি তবে আমাতে নাপাকী নেই। আর যদি ভেজা হই, তাহলে তিন বার ধৌত করে আপনার মতো হতে পারি। কিন্তু আপনার আঁচল আত্মঅহমিকায় অপবিত্র। অতঃপর আপনি যদি সাত সাগরের পানি দ্বারা তা ধৌত করেন তথাপিও পাক হবেন না। শায়েখ বললেন, তোমার শরীর অপবিত্র, আর আমার ভিতর অপবিত্র। তাহলে এসো আমি আর তুমি এক সাথে থাকি। কুকুর বললো, আপনি আমার সাথে থাকতে পারবেন না। কেনোনা আমি নিকৃষ্ট জীব, আর আপনি আলেমে দ্বীন। আমার পাশ দিয়ে যে যায় সে আমার শরীরে ইট-পাথর নিক্ষেপ করে, আর আপনার পাশ দিয়ে যারা যায় তারা বলে, আস্‌সালামু আ'লাইকুম ইয়া সুলতানুল আরেফীন! অথচ আমি একটি হাড্ডি বা এক টুকরা রুটি রেখে দেই না। আর আপনার ঘরে রয়েছে গমের ভাণ্ডার। শায়েখ বলেন, সুবহানাল্লাহ! আমি তো কুকুরের সঙ্গী হওয়ারই উপযোগী নই, তাহলে আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গী কীভাবে হবো?

টীকা *ঃ কুকুর যদি শুষ্ক থাকে আর এর সাথে যদি শুষ্ক কাপড় লেগে যায় তাহলে তা নাপাক হবে না। আর যদি কুকুর ভেজা থাকে তাহলে কাপড় নাপাক হবে। আর তা পানি দ্বারা তিন বার ধৌত করলে পাক হয়ে যায়। এটা হলো জাহেরী নাপাকী দূর করার মাসায়েল। কিন্তু কলবী এবং বাতেনী নাপাকী পানি দ্বারা ধৌত করা যায় না। ওই নাপাকি দূর করতে হলে লাগবে তওবা-ইসতেগফার। অক্ষমতাস্বীকৃতি, বিনয়-নম্রতা ও জিকির দ্বারা এই নাপাকী দূর করতে হবে।*

কারামত ৪ ঃ সুলতানুল আরেফীনকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার পীর কে? তিনি বললেন, এক কাঠমিস্ত্রী। জিজ্ঞেস করা হলো, কীভাবে? তিনি বললেন, একদিন আমি তাওহীদ এবং ইশকের মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। আমার মধ্যে চুল পরিমাণ জিনিস সংকুলান হচ্ছিলো না। আমি স্বীয় অস্তিত্ব হারিয়ে জংগলে চলে গেলাম। সেখানে এক কাঠমিস্ত্রীকে পেলাম। সে কাঠ বহন করছিলো। সে আমাকে বললো, আমার বোঝা উঠাও। তার বোঝা উঠানোর শক্তি আমার ছিলো না। আমার অবস্থা এমন যে, নিজের শরীর বহন করার শক্তি ছিলো না। তার বোঝা উঠানোর তো প্রশ্নই উঠে না। আমি এক সিংহের দিকে ইশারা করলাম। সিংহটি কাছে এলো। বোঝাটি সিংহের পিঠে উঠিয়ে দেওয়া হলো। কাঠমিস্ত্রীকে বললাম, তুমি কারো কাছে এ ঘটনা বোলো না। আমি চাচ্ছিলাম, যাতে সে আমাকে না চিনে। কিন্তু মিস্ত্রী

বললো, আমি বলবো, আমি এক জালেম ও অলৌকিকতাকারীকে দেখেছি। আমি বললাম, কী রকম? সে বললো, হে বায়েজিদ! সিংহটি কি শরীয়তের বিধান পালনে আদিষ্ট? আমি বললাম, না। সে বললো, যাকে আল্লাহ্তায়ালা কাজের আদেশ দেয়নি, তুমি তাকে আদেশ দিচ্ছো কেনো? এটা কি জুলুম নয়? আমি বললাম, হ্যাঁ, এটা অবশ্যই জুলুম। এরপর সে বললো, এই জুলুম করা সত্ত্বেও তুমি চাচ্ছো শহরের লোক যেনো জেনে যায় যে, সিংহ তোমার অনুগত আর তুমি কারামতওয়ালা। এটা কি প্রদর্শনপ্রবণতা নয়? আমি বললাম, আমি এ কাজ থেকে তওবা করছি। তাজকিরাতুল আউলিয়া পৃষ্ঠা ১৮০।

আল্লাহ্পাকের এই প্রিয় বান্দা ২৬১ হিজরী কারো মতে ২৩৪ হিজরীর শাবান মাসে ৭৩ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি বোস্তাম নগরীতে সমাধিস্থ হন। ইন্তেকালের পর লোকজন তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ্তায়ালা আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্তায়ালা আমাকে বলেছেন, হে বৃদ্ধ! তুমি আমার জন্য কী নিয়ে এসেছো? আমি বললাম, হে আমার প্রভুপালক! কোনো ফকির বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হলে তাকে কি একথা জিজ্ঞেস করা হয় যে, তুমি কী নিয়ে এসেছো? বরং বলা হয়, তুমি কী চাও। নুফহাতুল উন্স পৃষ্ঠা ৫৬৫, তাবাকাত পৃষ্ঠা ৯২।

হজরত শায়েখ আবুল হাসান খেরকানী র.

তাসাউফ বিষয়ে তিনি সুলতানুল আউলিয়া হজরত বায়েজিদ বোস্তামী র. এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। সুলুকের সূত্রে হজরত বায়েজিদ বোস্তামীর সাথে তাঁর অটুট রূহানী সম্পর্ক ছিলো। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন হজরত বায়েজিদ বোস্তামী র. এর ইন্তেকালের পরে।

কথিত আছে, সুলতানুল আরেফিন হজরত বায়েজিদ বোস্তামী প্রতি বছর একবার হাস্তানের সরাইখানা জিয়ারতের জন্য যেতেন। সেখানে শহীদগণের কবরস্থান রয়েছে। তিনি খেরকানের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে সেখানে থেমে যেতেন। এমনভাবে নিঃশ্বাস নিতেন, যেভাবে সুঘ্রাণ নেওয়ার জন্য শ্বাস নেওয়া হয়। মুরিদগণ জিজ্ঞেস করতো, হজরতজান! আমরা তো সেরকম কিছু অনুভব করছি না। তিনি বলতেন, আল্লাহ্র এক প্রিয় বান্দা আবির্ভূত হবেন— আমি তাঁর সুভাস পাচ্ছি। তাঁর নাম হবে আলী, উপনাম

আবুল হাসান। আমার চেয়ে তাঁর অতিরিক্ত তিনটি মর্যাদা থাকবে— ১. তিনি পরিবারবর্গের ব্যয়ভার বহন করবেন। ২. কৃষি কাজ করবেন। ৩. বৃক্ষ রোপন করবেন। তিনি আমার একশত বছর পর জন্মগ্রহণ করবেন। কথিত আছে, হজরত শায়েখ আবুল হাসান খেরকানি ১২ বছর বয়স থেকে খেরকানে ইশার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে সুলতানুল আরেফীনের মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তেন। তাঁর আত্মা থেকে বরকত, নেয়ামত হাসিলের অপেক্ষায় থাকতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ্! তুমি তোমার প্রিয় বান্দা বায়েজিদকে যা দান করেছো, আমাকে তা দান করো। তিনি সেখান থেকে ওই রাতেই খেরকানে ফিরে এসে ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করতেন। ইশার ওজু দিয়েই ফজরের সালাত আদায় করতেন। তাজকিরাতুল আউলিয়া পৃষ্ঠা ৩৩।

খাজা মাওলানা ইবনে রোজ বাহান ইসফাহানী র. খাজা আবুদল খালেক গজদাওয়ানী র. এর শরহে ওয়াসায়েতে লিখেছেন, শায়েখ আবুল হাসান খেরকানী র. এর পীর কয়েক মাধ্যমে হজরত বায়েজিদ বোস্তামী র. এর সাথে মিলিত হয়েছেন। কোনো কোনো মাশায়েখ মাধ্যমগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে— খাজা আবুল হাসান খেরকানী র. এর পীর আবুল মুজাফফর মাওলানা তুর্কতুসী র. তাঁর পীর খাজা আরাবী বায়েজিদ আশেকী র. তাঁর পীর খাজা মোহাম্মদ মাগরেবী র. তাঁর পীর সুলতানুল আরেফীন শায়েখ বায়েজিদ বোস্তামী র.। শায়েখের আসল নাম আলী ইবনে জাফর। তিনি তাঁর যুগের একক, স্বনামধন্য ও প্রখ্যাত বুজর্গ ছিলেন। সকলেই তাঁর দরবারে আসতো এবং একবাক্যে সকলেই তাঁর বুজর্গী মেনে নিতো। তাঁর জামানায় তরিকত অনুসন্ধানীরা তাঁরই কাছে ছুটে আসতো। শায়েখ আবুল আব্বাস কাস্সাব র. বলেন, আমাদের পর আমাদের বাজার খেরকানী আবাদ করবে। দেখা গেলো, শায়েখ আবুল আব্বাসের পর এক যুগ পর্যন্ত লোকজন তাঁরই কাছে আসা যাওয়া করছে। তাবাকাতে সুফিয়ান পৃষ্ঠা ৩০৮, নুফহাতুল উন্স পৃষ্ঠা ২৭৫।

শায়েখের মাকাম ঃ শায়েখ আত্তার র. বলেন, শায়েখ আবুল হাসান স্বীয় জামানার রূহানী বাদশাহ্, কুতুব, আবদাল এবং তরিকতপন্থীদের মান্যবর ও প্রধান ছিলেন। ইলমে মারেফতের তিনি সর্বজনস্বীকৃত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সার্বক্ষণিক আল্লাহ্র স্মরণ ও মুশাহাদায় লিপ্ত থাকতেন। রিয়াজত ও সাধনা করতেন। বস্তুসমূহের গোপন রহস্য জানতেন। উঁচু হিম্মতওয়ালা

বুজর্গ ছিলেন। আল্লাহ্তায়ালার এমন নৈকট্য লাভ করেছিলেন, যা বর্ণনাতীত। তাজকিরাতুল আউলিয়া অধ্যায় ৭৭।

উত্তম বস্তু ঃ একদিন তিনি তাঁর মুরিদগণকে জিজ্ঞেস করলেন, সবচেয়ে উত্তম বস্তু কোনটি? তাঁরা বললেন, হে প্রাণপ্রিয় শায়েখ! অনুগ্রহ করে আপনিই বলুন। তিনি বললেন, যেই হৃদয় সতত আল্লাহ্‌র স্মরণমগ্ন।

সূফী কে ঃ তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, সূফী কে? তিনি বললেন, চট পরিধান আর জায়নামাজ সাথে রাখলেই সূফী হওয়া যায় না। আবার সূফীদের অভ্যাস নিয়ম-নীতি পালন করলেও সুফী হওয়া যায় না। সূফী ওই ব্যক্তি, যিনি কিছুই না অর্থাৎ যিনি ফানা ফিল্লাহ্। তিনি আরও বলেন, মানুষ সেই দিন সূফী হতে পারে, যেদিন সে দিনের সূর্যালোককে অনাবশ্যক মনে করে এবং রাতে অপ্রয়োজনীয় মনে করে চন্দ্রালোক ও নক্ষত্রপুঞ্জকে। নুফহাতুল উন্‌স ২৭৫ পৃষ্ঠা।

বাণী ঃ বর্ণিত আছে, একদা শায়েখ চল্লিশজন দরবেশসহ স্বীয় খানকায় উপবিষ্ট ছিলেন। একাধারে সাত দিন খাদ্যবঞ্চিত ছিলেন তাঁরা। এক ব্যক্তি আটার থলে ও বকরি নিয়ে খানকার প্রাঙ্গণে এসে আওয়াজ দিলো। দরবেশগণ জিজ্ঞেস করলেন, কী চাও? সে বললো, সূফীদের জন্য কিছু হাদিয়া নিয়ে এসেছি। শায়েখ বললেন, তোমাদের মধ্যে যে সূফী সে যেনো গ্রহণ করে। আমি সুফী দাবি করার যোগ্য নই। উপস্থিত সবাই নীরব রইলেন। অতঃপর শায়েখ আটা এবং খাসি ফেরত দিলেন। তাজকিরাতুল আউলিয়া ৩৪৫ পৃষ্ঠা।

কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, মানুষ কীভাবে বুঝতে পারবে যে, সে জাগ্রত? তিনি বলেন, এ কথার দ্বারা যে, যখন সে আল্লাহ্‌র স্মরণে লিপ্ত থাকবে, তখন মাথা থেকে পা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র স্মরণে নিমগ্ন থাকবে। নুফহাতুন্ উন্‌স ২৭৫ পৃষ্ঠা।

সততা ঃ একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, সত্যতা (সত্য কথা) কী? তিনি বললেন, যে কথা মনের মধ্যে আছে, সে কথাই সত্য কথা।

এখলাস ঃ একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, এখলাস কী? তিনি বললেন, তোমরা যা কেবলই আল্লাহ্‌র জন্য করো, তা-ই এখলাস, আর যা মানুষের জন্য করো, তা রিয়া বা লৌকিকতা।

বাকা ও ফানা ঃ তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, ফানা এবং বাকার আলোচনা করা কার জন্য সমীচীন? তিনি বললেন, এমন ব্যক্তির জন্য,

যাকে একটি রেশমী তার দিয়ে বেঁধে আকাশের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, আর বাতাস এসে গাছপালা ও বাড়িঘর ধসিয়ে দিচ্ছে, পর্বতমালাকে দূরে নিক্ষেপ করছে, সাগরকে মাটি দ্বারা ভরাট করে দিচ্ছে, অথচ ওই ঝুলন্ত ব্যক্তিকে তার স্থান থেকে নড়াতে পারছে না।

তিনি আরও বলেন, ওই ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখিও না, তুমি আল্লাহ্ আল্লাহ্ করছো আর সে অন্য কথা বলে। যেমন কবি বলেন, চিন্তিত থাকো। তোমার চোখ যেনো অশ্রুসিক্ত থাকে, কেনোনা আল্লাহ্তায়ালা অশ্রুসিক্ত ও চিন্তিত বান্দাকে পছন্দ করেন।

তিনি আরও বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্কে পাওয়ার জন্য কবিতা পাঠ করে, তার চেয়ে উত্তম হলো কোরআনুল করীম তেলাওয়াত করা। সুতরাং কবিতা দ্বারা আল্লাহ্কে পাওয়ার চেষ্টা করবে না।

রসূলে করীম স. এর উত্তরাধিকারী ঃ তিনি বলেন, রসূল স. এর উত্তরাধিকারী হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি তাঁর কাজে সুন্নতানুগ। ওই ব্যক্তি নয়, যে শুধু রসূলের আনুগত্যের কথা লিখে কাগজ কালো করে।

হজরত শিবলী র. বলেন, আমি এরকম চাই যে, কোনো কিছু যেনো না চাই। শায়েখ বলেন, এটাও এক ধরনের চাওয়া। তিনি বলেন, চল্লিশ বছর যাবত আমার অবস্থা এমন যে, আল্লাহ্তায়ালা আমার অন্তর অবলোকন করছেন। আর আমার হৃদয় নিজেকে ছাড়া কাউকে দেখতে পায় না। আমার হৃদয়ে আল্লাহ্র স্মরণ ছাড়া আর কিছু নেই আর আমার বক্ষদেশে তিনি ছাড়া কারো স্বীকৃতি নেই।

তিনি বলেন, চল্লিশ বছর যাবত আমার প্রবৃত্তি ঠাণ্ডা পানি আর টক দধি খেতে চাচ্ছে, কিন্তু আমি তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিনি। তিনি বলেন, দুনিয়াতে আলেম ও আবেদের অভাব নেই। কিন্তু তোমাকে এমন হতে হবে যে, দিন থেকে রাত পর্যন্ত এবং রাত থেকে দিন পর্যন্ত এমনভাবে অতিবাহিত করবে, যেনো আল্লাহ্তায়ালা তোমাকে পছন্দ করেন।

তিনি বলেন, অনেকে নামাজ পড়ে ও রোজা রাখে কিন্তু মর্দে মুজাহিদ সে-ই, যার ষাটটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এভাবে যে, বাম দিকের ফেরেশতা অর্থাৎ পাপ লেখক ফেরেশতা এমন কোনো আমল দেখতে পায়নি, যে কারণে আল্লাহ্র দরবারে লজ্জিত হতে হয়।

তিনি বলেন, দুনিয়াতে সুনাম, সুখ্যাতি তিনিই লাভ করতে পারেন যাঁকে আল্লাহ্তায়ালা এমন মর্যাদা দান করেছেন যে, কেউ কিয়ামত দিবসে দোজখের এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হলো। আর আল্লাহ্তায়ালা যাকে দোযখে প্রবেশ করাতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে হাত ধরে বেহেশতে নিয়ে যান।

ওলীর ভীতি ঃ ফেরেশতাগণ তিন অবস্থায় আল্লাহ্র ওলীদেরকে সমীহ করে থাকেন। ১. হজরত আজরাইল আ. জান কবজের সময়। ২. কিরামান কাতেবিন আমল লেখার সময় এবং ৩. মুনকার নকীর প্রশ্ন করার সময়।

তিনি আরও বলেন, আল্লাহ্র ওলীদের উপর আনন্দ-উল্লাস এবং দুঃখ-কষ্ট, সংকট— কোনো কিছুই প্রভাব ফেলতে পারে না, কেনোনা আনন্দ এবং সংকট সবই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে।

বাণী ঃ তিনি বলেন, আল্লাহ্র সান্নিধ্য গ্রহণ করো, আল্লাহ্র সৃষ্টির সাথে নয়। সৃষ্ট জীবের সাথে সম্পর্ক রাখাতে সওয়াব হলেও আল্লাহ্র রাস্তা থেকে দু'বছরের দূরত্ব তৈরী করে দেয়।

দুনিয়া ঃ তিনি বলেন, তুমি যতোক্ষণ দুনিয়া অন্বেষণকারী হবে, ততোক্ষণ দুনিয়া তোমার উপর প্রভাব ফেলবে। আর যখন তুমি দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তখন তুমি তার উপর বিজয়ী হবে।

দরবেশ ঃ তিনি বলেন, দরবেশ সেই, যার কাছে দুনিয়া আখেরাত কোনোটিই নেই। আর যে এগুলো কামনাও করে না। কেনোনা দুনিয়া ও আখেরাতের সাথে সম্পর্ক করা খুবই তুচ্ছ বিষয়। দুনিয়া এতো তুচ্ছ বিষয় যে, যার সাথে হৃদয়ের সম্পর্ক অশোভন।

তিনি বলেন, ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে তোমাকে নামাজ পড়তে বলা হয়নি, তেমনি সময়ের পূর্বেই তুমি রুজি চেয়ো না।

তিনি বলেন, মানুষের কাজ হলো পবিত্রতার সাথে সুলুকের পথে ঊর্ধ্বারোহণ। কাজের আধিক্য নয়।

উত্তরাধিকারী কে ঃ তিনি বলেন, আমরা রসূল স. এর উত্তরাধিকারী। আমরা এ জন্য উত্তরাধিকারী যে, আমরা গরীব। অর্থাৎ আমরা মহানবী স. এর গুণে গুণান্বিত। মহানবী স. দরবেশী অবলম্বন করেছিলেন আর আমরাও দরবেশী অবলম্বন করেছি।

কারামত ঃ তিনি বলেন, বান্দার জন্য আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার হাজার মনজিল রয়েছে। প্রথম মনজিল হলো কারামত। সালেকের হিম্মত কম হলে সে অন্যান্য মাকামাতে পৌঁছতে পারবে না।

তিনি বলেন, যার হৃদয়ে আল্লাহ্র সত্তা ছাড়া অন্য কিছু বিদ্যমান, সে আল্লাহ্র অনুগত হলেও তার দিল্ মৃত।

দ্বীনের ভয় ঃ শয়তান থেকে দ্বীনের তেমন ভয় নেই, যতোটুকু ভয় রয়েছে দুই ব্যক্তি থেকে। ১. দুনিয়া লোভী আলেম। ২. এলেমহীন জাহেদ।

তিনি বলেন, চল্লিশ বছর যাবত আমরা কোনো রুটি পাকাইনি এবং অন্য কোনো প্রকার খাদ্যও তৈরী করিনি, কিন্তু মেহমানদের জন্য। আমরা সেই খাদ্যে শুধু তোফাইলী (অনাহুত অতিথি মাত্র) ছিলাম। তোমরাও এরূপ থাকবে। যদি সারা দুনিয়া এক লোকমা বানিয়ে মেহমানের মুখে দাও, তথাপি তার হক আদায় করতে পারবে না। যদি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ভ্রমণ করো এবং কোনো আল্লাহ্ওয়ালার সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়, তবুও এটাকে তেমন কিছু মনে কোরো না। তাজকিরাতুল আউলিয়া ৩২৯ পৃষ্ঠা।

সবচেয়ে উত্তম ঃ তিনি বলেন, সবচেয়ে আলোকিত হৃদয় হলো সেটা, যার মধ্যে সৃষ্টজীব নেই। আর সবচেয়ে উত্তম কাজ হলো সেটা, যাতে সৃষ্টজীবের অনিষ্টের আশংকা নেই। সবচেয়ে হালাল লোকমা সেটাই যা তোমাদের পরিশ্রম দ্বারা অর্জিত। সবচেয়ে উত্তম বন্ধু হলো সে, যার জীবন ন্যায়ভাবে অতিবাহিত হয়। নুফহাতুল উন্স ২৭৬ পৃষ্ঠা।

ইন্তেকাল ঃ ৪২৫ হিজরীতে আশুরার রজনীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। সেদিনই সমাধিস্থ হন। নুফহাতুল উন্স ২৭৫ পৃষ্ঠা।

হজরত শায়েখ আবু আলী ফারমেদী তুসী কুদ্দিসা সিররুহু

এলমে তাসাউফে তিনি শায়েখ আবুল হাসান খেরকানী কুদ্দিসা সিররুহুর সাথে সম্পর্ক রাখেন। শায়েখ আবুল কাসেম গুরগানী তুসী র. এর সাথেও তাঁর সম্পর্ক ছিলো, যিনি কুতুবে রব্বানী ও আরেফে সুবহানী ছিলেন। তাঁর ওফাত হয় ৪৫০ হিজরীতে। শায়েখ আবুল কাসেম র. এর সম্পর্ক ছিলো শায়েখ আবুল হাসান খেরকানী র. এর সাথে এবং শায়েখ গুরগানী র. এর শায়েখ ওসমান মাগরেবীর সাথে। আর তাঁর সম্পর্ক ছিলো আবু আলী কাতেবের সাথে, আর তাঁর সম্পর্ক ছিলো আবু আলী রুবারী র. সাথে। আর তাঁর সম্পর্ক ছিলো সায়্যেদুত্ তায়েফা জুনাইদ বাগদাদী কাদ্দাসাল্লাহু আসরারাহুম এর সাথে। এরপর এই সিলসিলা হজরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু এর সাথে মিলিত হয়েছে। এ ছাড়া শায়েখ আবু

আলী ফারমেদী র. শায়েখ আবু সাঈদ আবুল খায়ের র. এর সোহবত লাভ করেন। তাঁর থেকে অনেকভাবে উপকৃত হন এবং তাঁর থেকে খেলাফতও লাভ করেন। শায়েখ আবু সাঈদ আবুল খায়ের র. এর ইন্তেকাল হয় ৪৪০ হিজরীতে। তাঁর বয়স হয়েছিলো এক হাজার মাস।

বর্ণিত আছে, শায়েখ আবু সাঈদ আবুল খায়ের র. এর মুরিদগণের মধ্যে ৪০ জন খেলাফত লাভ করেন। তন্মধ্যে শায়েখুল ইসলাম আহমদ জাম র. এবং শায়েখ আবু আলী ফারমেদী র. উল্লেখযোগ্য বুজর্গ ছিলেন।

প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা ঃ তরিকায়ে নকশ্‌বন্দিয়ার এক বুজর্গ বলেন, খাজা আবু আলী ফারমেদী র. প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা সম্পর্কিত তত্ত্ব অবগত ছিলেন। কিন্তু তা প্রকাশের অনুমতি ছিলো না। কিন্তু শায়েখ আহমদ জাম র. প্রবৃত্তির প্ররোচনা সম্পর্কে জানতেন এবং তিনি তা প্রকাশের জন্য আদিষ্ট ছিলেন। শায়েখ আবু আলী ফারমেদী র. এর আসল নাম ছিলো ফজলুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ। তিনি খোরাসানের শায়েখদের শায়েখ ছিলেন। তিনি তাঁর যুগে এই তরিকার একক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ওয়াজ নসিহতের ক্ষেত্রে তিনি ইমাম আবুল কাশেম কুশাইরী র. এর শিষ্য ছিলেন, যিনি অসংখ্য গ্রন্থের প্রণেতা ও তাফসীর লেখক ছিলেন। ছিলেন স্বীয় যুগের ইমাম ও প্রসিদ্ধ আলেম। তিনি ৪৬৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

ওলীর সাক্ষাৎ ঃ তিনি বলেন, আমি যৌবনের প্ররম্ভেই এলেম অন্বেষণের জন্য নিশাপুরে গমন করি। আমি শুনতে পেলাম শায়েখ আবু সাঈদ আবুল খায়ের এক মাস অবস্থান করবেন এবং ইলমী আলোচনা করবেন। আমি সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমার দৃষ্টি তাঁর সুন্দর চেহারার প্রতি নিবদ্ধ হলো। আমি তাঁর ভক্ত হয়ে গেলাম। সূফীগণের মহব্বত আমার অন্তরে সুদৃঢ় হলো। নুফহাতুল উন্‌স।

একদা আমি মাদ্রাসার কক্ষে বসা ছিলাম। শায়েখের সাথে সরাসরি দেখা করার উদগ্র বাসনা জাগ্রত হলো আমার মনে। কিন্তু শায়েখের বাইরে আসার সময় সুযোগ হচ্ছিলো না। আমি ধৈর্যধারণ করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। আমি বাইরে চলে এলাম। চৌরাস্তায় এসে দেখলাম, শায়েখ বড় একটি দলের সাথে কোথাও যাচ্ছেন। আমি শায়েখের পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম। তিনি একস্থানে গিয়ে থেমে গেলেন। আমি এক কোণায় বসে গেলাম। সেখান থেকে শায়েখ আমাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না।

কাওয়ালী শ্রবণ ঃ একবার শায়েখ কাওয়ালী শ্রবণে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হলো। তিনি তাঁর পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়তে শুরু করলেন। কাওয়ালী শেষ হলে ছেঁড়া টুকরোগুলো একত্র করা হলো। শায়েখ এক আস্তিন আঁচলসহ বের করে পৃথক করে রাখলেন। ডাক দিলেন, আবু আলী তুসী তুমি কোথায়? আমি উত্তর দিলাম না। ভাবলাম, শায়েখ এখন পর্যন্ত তো আমাকে দেখতে পাননি। আর আমাকে তিনি চিনেনও না। হয়তো তাঁর মুরিদানদের মধ্যে অন্য কোনো আবু আলীও থাকতে পারেন। শায়েখ দ্বিতীয় বার ডাক দিলেন। আমি চুপ থাকলাম। তৃতীয় বার ডাকলে লোকজন আমাকে বললেন, শায়েখ আপনাকেই ডাকছেন। আমি উঠে শায়েখের সামনে গেলাম। শায়েখ আঁচল-আস্তিনের টুকরাটি আমাকে দিয়ে বললেন, এটাকে সংরক্ষণ কোরো। আর তুমি আমাদের নিকট এই আস্তিন এবং আঁচলের মতো। আমি আদব ও বিনয়ের সঙ্গে বস্ত্রখণ্ডটি গ্রহণ করলাম। উপযুক্ত স্থানে রেখে দিলাম। ওটি থেকে প্রভূত উপকার লাভ করলাম। হৃদয় আলোকিত হলো এবং একটি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হলো।

ইমাম আবুল কাসেম র. এর খেদমতে

যখন শায়েখ আবুল হাসান খেরকানী র. নিশাপুর থেকে চলে গেলেন, তখন আমি ইমাম আবুল কাসেম কুসাইরী র. এর নিকট গেলাম। যে অবস্থা ও হালাত শায়েখের নিকট আসার সময় পরিলক্ষিত হয়েছিলো, তা তাঁর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, বৎস! যাও এবার এলেম অন্বেষণে লিপ্ত হও। আমি এলেম অর্জনে লিপ্ত হয়ে গেলাম। আলো প্রতিদিন বাড়তে লাগলো। আমি তিন বছর পর্যন্ত এলেম অর্জনে রইলাম। একদিন আমি দোয়াত থেকে কলম বের করলাম। কিন্তু কলম থেকে কালি বের হলো না। কলমটি ছিলো শুভ্র। আমি সেখান থেকে বিদায় নিয়ে সোজা ইমাম আবুল কাসেম কুশাইরী র. এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং সব অবস্থা খুলে বললাম। তিনি বললেন, এলেম যখন তোমার থেকে হাত উঠিয়ে নিয়েছে, তুমিও এলেম থেকে হাত উঠিয়ে নাও। এবার তরিকার কাজে লেগে যাও। আমি তাঁর কথামতো মাদ্রাসা থেকে মাল-সামান খানকায় নিয়ে এলাম এবং ইমামের খেদমতে লিপ্ত হলাম।

শায়েখের খেদমতে ঃ একদা ইমাম আবুল কাসেম হাম্মামখানায় প্রবেশ করলেন। আমিও তাঁর সাথে গেলাম। কয়েক বালতি পানি হাম্মামখানায় ঢেলে দিলাম। ইমাম হাম্মামখানা থেকে বের হয়ে নামাজ আদায় করলেন।

তারপর বললেন, হাম্মামে পানি ঢেলে দিয়েছে কে? আমি এই ভয়ে কিছু বললাম না যে, হয়তো শায়েখের ইচ্ছার বিপরীত কিছু হয়েছে। শায়েখ দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করলে আমি কোনো উত্তর দিলাম না। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম, খাদেম। তিনি বললেন, হে আবু আলী! আবুল কাসেম কুশাইরী ৭০ বছরে যা অর্জন করেছে, তুমি কয়েক বালতি পানি ঢেলেই তা পেলে। এরপর আমি বেশ কিছু দিন ইমামের তরবিয়তে রেয়াজত ও সাধনায় লিপ্ত থাকলাম।

একদা আমার উপর এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হলো। আমি যেনো হারিয়ে গেলাম। ইমামের নিকট অবস্থা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, হে আবু আলী! আমার সুলুক এ মাকাম থেকে ঊর্ধ্বে নয়। সামনের অবস্থা আমার জানা নেই। আমি মনে মনে ভাবলাম, আমার এমন একজন পীর-মোর্শেদ দরকার, যিনি আমাকে আরও উঁচু মাকামে নিয়ে যাবেন। আমার এই অবস্থা আরও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। যথাসিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলাম। আমি পূর্বেই শায়েখ আবুল কাসেম গুরগানী র. এর নাম শুনেছিলাম। অতঃপর তুসের দিকে রওয়ানা করলাম। অবশেষে তাঁর খেদমতে উপনীত হলাম। তিনি তাঁর মুরিদদেরকে নিয়ে মসজিদে বসেছিলেন। আমি দু'রাকাত নামাজ পড়ে শায়েখের সামনে উপস্থিত হলাম। শায়েখ মোরাকাবায় ছিলেন। মাথা উঠিয়ে বললেন, হে আবু আলী! কী চাও। আমি সালাম দিয়ে বসে পড়লাম এবং নিজের অবস্থা বর্ণনা করলাম। শায়েখ বললেন, তোমার প্রাথমিক অবস্থার জন্য তোমাকে মোবারকবাদ। এখনও কোনো স্তরে পৌঁছতে পারোনি। তরবিয়ত পেলে উঁচু মর্যাদায় উপনীত হতে পারবে। আমি মনে মনে ভাবলাম, ইনিই আমার পীর-মোর্শেদ। আমি তাঁর কাছে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলাম। তিনি বেশ লম্বা সময় ধরে বিভিন্ন মুজাহাদা ও সাধনা করতে লাগলেন। এরপর একদিন তিনি আমার দিকে মনোনিবেশ করলেন। আমাকে বিবাহ করার জন্য আদেশ দিলেন এবং নিজের মেয়ের সাথে বিবাহ দিলেন। হজরত শায়েখ আবু সাঈদ আবুল খায়ের এক মাসের জন্য সফরে এসেছিলেন। আমি তাঁর খেদমতে গেলাম। তিনি বললেন, হে আবু আলী! সে যুগ এসে গেছে। তোমাকে তোতার মতো কথা বলতে হবে। কিছুদিন যেতে না যেতেই শায়েখ আবুল কাসেম র. আকদে মজলিশ স্থাপন করেন। তাঁর সেই বাণীর সত্যতা আমার উপর প্রকাশিত হলো। শুরু হলো আমার বক্তৃতা। শায়েখ আবু আলী ফারমেদী র. এর জন্ম ৪৩৪ হিজরী,

আর ৫১১ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। মুকাদামা রেসালায়ে কুশাইরিয়া ৯৬, ৯৭ পৃষ্ঠা।

হজরত খাজা আবু ইউসুফ হামাদানী কুদ্দিসা সিররুহু

এলমে তাসাউফে তিনি শায়েখ আবু আলী ফারমেদী র. এর সাথে সম্পৃক্ত। খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানী র. এর শরহে ওসায়ায় এরকম উল্লেখ রয়েছে যে, খাজা ইউসুফ হামাদানীর শায়েখ আবুল হাসান খেরকানী র. এর সাথে সরাসরি সম্পর্ক ছিলো। তিনি শায়েখ আবদুল্লাহ জুওয়াইনী র. এর হাতে খেলাফতের পোশাক পরিধান করেন এবং শায়েখ হাসান সাম্নানীর সান্নিধ্যে সময় অতিবাহিত করেন। তাঁর উপনাম ছিলো আবু ইয়াকুব। তিনি আঠারো বছর বয়সে বাগদাদে তশরীফ আনেন। আল্লামা আবু ইসহাক শিরাজী থেকে এলমে ফিকাহ্ অর্জন করেন এবং সঙ্গী সাথীদের ঊর্ধ্বে চলে যান। বাগদাদ, ইসফাহান, ইরাক, খোরাসান, সমরখন্দ, বোখারায় গমন করে বিভিন্ন বিষয়ে উপকৃত হন এবং জনসাধারণের উপকার করেন। এলমে হাদিসে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিলো। লোকজন তাঁর উপদেশ নিয়ে উপকৃত হতেন। ফতওয়া, ইসলামী জ্ঞান ও আহকামে শরীয়তে পরিপূর্ণ জ্ঞানী ছিলেন তিনি। এলমে মারেফতে ছিলেন সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত। গোপনীয় বিপদ ও ক্ষতির বিষয় থেকে সতর্ক থাকতেন। কারামতের অধিকারী ছিলেন। উলামা ও ফুকাহাদের একটি বড় দল তাঁর খানকায় সমবেত হতেন এবং তাঁর কামালাত ও বাণী দ্বারা উপকৃত হতেন। আজার বাইজান, ইরাক ও খেরাসানে স্বীয় মুরিদগণকে শিক্ষা দিতেন এবং তরবিয়ত করতেন। তিনি ওই মাশায়েখগণের অন্যতম, যাঁরা সায়্যিদেনা শায়েখেনা মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী র. এর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন এবং তাঁর থেকে উপকৃত হয়েছিলেন।

টীকা *ঃ ক্বালায়েদ জাওয়াহের ও বাহ্জাতুল আস্রার নামক কিতাবদ্বয়ে খাজা ইউসুফ হামদানী র. থেকে উপকৃত হওয়া সম্পর্কিত বর্ণনা আছে। শায়েখ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী র. এর বাণী এরূপ ঃ এক ব্যক্তি হামাদান নগরী থেকে এলেন। তাঁকে ইউসুফ হামাদানী বলা হতো। কুতুবও বলা হতো। তিনি সরাইখানায় অবস্থান করতেন। আমি তাঁর সম্পর্কে জানতে পেরে সরাইখানায় উপস্থিত হলাম। তাঁকে সেখানে দেখতে না পেয়ে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আমাকে বলা হলো, তিনি সুড়ংগের*

ভিতর থাকেন। আমি সেখানে গেলাম। তিনি আমাকে দেখলেন। কাছে বসিয়ে আমার সকল অবস্থা বর্ণনা করলেন এবং আমার সকল সমস্যা সমাধান করে দিলেন। বললেন, হে আবদুল কাদের! তুমি উপদেশ দান কোরো। আমি বললাম, হে স্বনামধন্য মাওলানা! আমি অনারবী। কীভাবে বাগদাদের সাহিত্যিকদের সাথে কথা বলবো। তিনি বললেন, তুমি কোরআন, হাদিস, ফেকাহ, উসুলে ফেকাহ, নাহু, সরফ, তাফসীর অধ্যয়ন করেছো। তোমার জন্য তাদের সাথে কথা বলা সহজ হবে। তুমি মিম্বারে উপবেশন করো এবং লোকদেরকে উপদেশ দিতে থাকো। আমি তোমার মধ্যে এক বিশেষ যোগ্যতা দেখেছি, যা অচিরেই বিকশিত হবে। আল্লাহ্তায়ালা আমাদের প্রতি দয়া ও রহম করুন।

তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। মারভ শহরে বেশ সময় অতিবাহিত করেন। অতঃপর হেরাত শহরে আসেন। এরপর পুনরায় মারভ শহরে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন। যাত্রাকালে পথিমধ্যে তাঁর ইন্তেকাল হয়। তিনি ষাট বছর বয়সে খেলাফত লাভ করেন। সবার কাছে ছিলেন গ্রহণযোগ্য। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের গাউস। আজর পর্বতে অবস্থান করতেন। জুমার নামাজ ছাড়া কখনো বের হতেন না। রাশ্হাত, নুফহাতুল উন্স পৃষ্ঠা ৩৩৭।

বাণী ঃ একদা জনৈক দরবেশ খাজা ইউসুফ হামাদানীর খেদমতে উপস্থিত হলেন। বললেন, আমি ওই সময় শায়েখ আহমদ গাজ্জালী র. এর পাশে ছিলাম। তিনি দস্তরখানায় দরবেশদের সাথে খানা খাচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর নিকট অদৃশ্যের কিছু বিষয় প্রকাশ হচ্ছিলো। শেষে তিনি বললেন, ওই সময় রসূল স. তাশরীফ এনেছিলেন। তিনি স. আমার মুখে লোকমা তুলে দিলেন। শায়েখ এ সকল কথা শুনে বললেন, এ ধরনের কল্পনা দ্বারা তরিকতের শিশুরা জ্ঞান লাভ করে।

বাণী ঃ সেমা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি দূত, যা সুসংবাদ প্রদানকারী ও অদৃশ্যের মুক্তাসদৃশ। সেমা দেহের ঔষধ, আত্মার খাদ্য, হৃদয়ের শক্তি, স্থায়িত্বের ভেদ ও ভেদ-রহস্যের প্রকাশকারী। আর কাশফ একটি প্রজ্জ্বলিত বিদ্যুৎ ও সূর্য। আত্মার সেমা হৃদয়ের শ্রবণের দ্বারা হুজুরী কলব হয়। হুজুরী নফস ব্যতীত এটা এমন যে, প্রতিটি জ্ঞানময়তা, চিন্তা-ফিকির, গবেষণা ও সাধনা করার মতো। বাহজাতুল আসরার ১৪৬ পৃষ্ঠা।

যাঁরা আল্লাহ্‌র প্রকৃত উপাসনাকারী, চরকা চালনার আওয়াজ শুনেও তাঁরা আল্লাহ্‌র স্মরণমগ্ন হন।

টীকা *ঃ গইবাত অর্থ অন্তর সৃষ্টিকুলের অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। কেনোনা তখন তার ইন্দ্রিয়ানুভূতি তার নিজের অবস্থাতেই নিমগ্ন থাকে- রেসালায়ে কুশাইরিয়া। আর সেমা— ওই ব্যক্তির জন্য বৈধ, যিনি সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রেমে ডুবে থাকেন ও শরিয়তের নীতিমালা মেনে চলেন। বর্তমানে যে কাওয়ালী প্রথা চালু আছে, এর উপস্থাপনকারী ও শ্রবণকারী উভয়ই শরীয়তের নীতিমালা থেকে বহু দূরে। তাই বুজর্গানে দ্বীনের সেমার বৈধতায় বর্তমানের সেমাকে বৈধ বলা যায় না।*

কারামাত ১ ঃ বর্ণিত আছে, পাশ্চাত্যের লোকেরা হামাদানের এক মহিলার ছেলেকে বন্দী করে ছিলো। মহিলা কান্নাকাটি করতে করতে শায়েখের দরবারে উপস্থিত হলো এবং নিজের অবস্থা বর্ণনা করলো। হজরত তাঁকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিলেন। মহিলা বললো, আমার ধৈর্যধারণ করা সম্ভব নয়। শায়েখ তখনই হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! দয়া করে বন্দীকে মুক্ত করে দাও। এরপর মহিলাকে বললেন, বাড়িতে ফিরে যাও, ছেলেকে বাড়িতেই পাবে। মহিলা বাড়িতে এসেই ছেলেকে দেখতে পেলো। বিস্মিত ও আনন্দিত হলো। ছেলো বললো, আমি কুসতানতানিয়ায় ছিলাম। আমার পায়ে বেড়ি ছিলো। ছিলাম সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত। এমন সময় অচেনা এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে এক পলকে আমাকে এখানে নিয়ে এলেন। মহিলা পুনরায় খাজা সাহেবের নিকট গেলো এবং ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা দিলো। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কুদরতের উপর আশ্চর্যবোধ করছো কেনো? বাহজাতুল আসরার ১৪৭ পৃষ্ঠা।

কারামত ২ ঃ বর্ণিত আছে, হজরত শায়েখ একদিন ওয়াজ করছিলেন। সেই মজলিশে দু'জন মুফতি উপস্থিত ছিলো। তারা বললো, চুপ করুন। আপনি বেদাতী। তিনি বললেন, তোমরাই চুপ থাকো। তোমাদের ধ্বংস হোক। তৎক্ষণাৎ তারা মারা গেলো। কালাইদে জাওয়াহের।

কারামত ৩ ঃ একদা তিনি বাগদাদের নেজামিয়ায় ওয়াজ করছিলেন। এমতাবস্থায় প্রসিদ্ধ ফকীহ ইবনে সিকা ওয়াজের মজলিশ থেকে উঠে তাঁকে একটি প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, তুমি বসে যাও। তোমার কথায় আমি কুফরির ঘ্রাণ পাচ্ছি। তোমার মৃত্যু ইসলামের উপর হবে না। এ ঘটনার বেশ কিছু দিন পর রোমের বাদশাহ্‌র পক্ষ থেকে এক খৃষ্টান দূত খলিফার

নিকটে এলো। ইবনে সিকা সেই দূতের সঙ্গে দেখা করে তার সাথী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। বললো, আমি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে তোমাদের ধর্মে প্রবেশ করতে চাই। খৃষ্টান দূত তার আবেদন মঞ্জুর করলো। তাকে সঙ্গে করে কুসতুনতানিয়ায় নিয়ে গেলো। রোমের বাদশাহ্‌র সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিলো। ইবনে সিকা খৃষ্টান হয়ে সেই ধর্মের উপরেই মারা গেলো।

কথিত আছে, ইবনে সিকা কোরআনের হাফেজ ছিলো। খৃষ্টান হওয়ার পর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, কোরআনুল করীমের কোনো আয়াত তোমার মনে আছে কি? সে বললো না। শুধু মনে আছে এ আয়াতটি—

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ

(কখনো কখনো কাফেরেরা আকাঙ্ক্ষা করিবে যে, তাহারা যদি মুসলিম হইত। সূরা হিজর আয়াত ২)।

কেউ কেউ ইবনে সিকার ঘটনা অন্যভাবেও ব্যক্ত করেছেন। এই গ্রন্থের প্রণেতা এ ঘটনাটি হজরত শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী র. এর জীবনীতেও উল্লেখ করেছেন। খাজা ইউসুফ হামাদানী র. ৪৪০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৩৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে প্রথমে তাঁর ইন্তেকালের স্থান মারভের রাস্তায় দাফন করা হয়। পরবর্তীতে তাঁর শরীর মোবারক মারভে স্থানান্তরিত করা হয়। এখনো লোকজন তাঁর কবর জিয়ারত করে বরকত হাসিল করে থাকেন। রাশহাত ও কালাইদে জাওয়াহের।

হজরত খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানী কুদ্দিসা সিররুহু

তাসাউফের বিষয়ে তিনি খাজা ইউসুফ হামাদানী র. এর সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তিনি ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট খলিফা। তিনি হালকায়ে খাজেগানের সরদার ও সিলসিলায়ে নকশ্‌বন্দিয়ার পুরোধা। তরিকতের বিষয়ে তাঁর কথা দলিল আর হকিকতের ক্ষেত্রে প্রমাণপঞ্জি। তিনি তাঁর যুগের শায়েখদের শায়েখ, মুজতাহিদশ্রেষ্ঠ ও কুতুব ছিলেন। তিনি ইমাম মালেক র. এর বংশের মহাপুণ্যবান সন্তান ছিলেন। তাঁর মাতা ছিলেন রোম বাদশাহ্‌ বংশোদ্ভূতা। তাঁর পিতা ইমাম আবদুল জলিল আকাবেরে আওলিয়াগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি হজরত খিজির আ. এর সাক্ষাৎ পেয়ে ছিলেন।

সুসংবাদ ঃ বর্ণিত আছে, হজরত খিজির আ. শায়েখ ইমাম আবদুল জলিল র. কে সুসংবাদ দিলেন, আপনার এমন এক সন্তান জন্ম নিবে, যাকে আমি আমার সন্তানদের মধ্যে গণ্য করবো। আমার নেসবত থেকে তাকে অংশ দিবো। তার নাম রাখবেন আবদুল খালেক। যুগের বিবর্তনের কারণে ইমাম আবদুল জলিল রোম থেকে দিয়ারে মাওয়ারাউন্নাহারের দিকে আগমন করেন। বোখারার নিকটবর্তী গজদাওয়ান নামক একটি শহরে তিনি অবস্থান গ্রহণ করেন। খাজা আবদুল খালেক সেখানেই জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই লালিত পালিত হন।

হজরত খিজির আ. থেকে সবক গ্রহণ ঃ কথিত আছে, একদিন খাজা সাহেব স্বীয় উস্তাদ সদরউদ্দিন র. এর নিকট তাফসীর পড়ছিলেন। যখন এই আয়াতে পৌঁছলেন—

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

(তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রভুপালককে ডাকো; তিনি জালেমদেরকে পছন্দ করেন না। সূরা আ'রাফ আয়াত ৫৫) তখন উস্তাদকে জিজ্ঞেস করেন, এখানে আল্লাহ্তায়ালা কোন্ পদ্ধতির জিকিরের কথা উল্লেখ করেছেন? জিকিরকারী যদি উঁচু আওয়াজে জিকির করে বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করে, তাহলে অন্যরা অবগত হয়ে যায়, আর এটা জিকিরে খফী বা গোপন জিকির নয়। আর যদি মনে মনে জিকির করে তাহলে নিম্নের হাদিস দ্বারা জানা যায় যে, শয়তান ওই জিকির সম্পর্কে অবগত হয়ে যায়—

اَلشَّيْطَانُ يَجْرِىْ فِىْ عُرُوْقِ اِبْنِ اٰدَمَ مَجْرَى الدَّمِ -

(শয়তান বনি আদমের শিরা-উপশিরায় রক্ত চলাচলের ন্যায় চলাচল করে)। উস্তাদ বললেন, এটা ইলমে লাদুন্নী। আল্লাহ্র ইচ্ছা হলে কোনো ওলী মিলে যাবে। আর তিনিই এই শিক্ষা দিবেন। খাজা সাহেব আল্লাহ্র ওলীর সন্ধানে বের হলেন। একদা শুক্রবার নিজ বাগানের প্রবেশ পথে বসে ছিলেন। এমন সময় এক বুজর্গ আগমন করলেন। তিনি তাঁর প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করলেন। বুজর্গ বললেন, হে যুবক! আমি তোমার মধ্যে বুজর্গীর নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি। তুমি কোনো পীরের হাতে বায়াত হয়েছো কি? তিনি বললেন, না। তবে কিছু দিন যাবত তালাশ করছি। তিনি

বললেন, আমি খিজির। আমি তোমাকে আমার সন্তানসম মনে করি। একটি সবক বলে দিচ্ছি, আমল করলে অনেক রহস্য প্রকাশ পাবে। অতঃপর তিনি বললেন, পানিতে নামো এবং ডুব দিয়ে মনে মনে বলবে— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ। খাজা সাহেব তাই করলেন। তাঁর নির্দেশিত তালিম (শিক্ষা) অনুযায়ী কাজ করে যেতে লাগলেন। অনেক ভেদ-রহস্য তাঁর সামনে প্রকাশিত হলো। এরপর খাজা ইউসুফ হামাদানী র. বোখারায় আগমন করলেন। তিনি তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হলেন। হজরত খাজা যতোদিন বোখারায় ছিলেন ততোদিন খুবই গুরুত্বের সাথে তাঁর মজলিশে উপস্থিত হতেন। অনেক সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞান লাভ করলেন। খাজা আবদুল খালেকের প্রথম পীর খাজা খিজির। কিন্তু তিনি খাজা ইউসুফ হামাদানী র. থেকে খেলাফত লাভ করেন। খাজা ইউসুফ হামাদানী র. এর তরিকায় জিকিরে জলি (উঁচু আওয়াজে জিকির) জারী ছিলো। কিন্তু খাজা আবদুল খালেক র. এর জিকির ছিল খফী। জিকিরে খফী (অনুচ্চ আওয়াজের জিকির) তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন খাজা খিজির থেকে। খাজা ইউসুফ হামাদানী র.ও তাঁকে এমতো নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তুমি সেভাবেই জিকির করতে থাকো, যেভাবে তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন খাজা খিজির। দীর্ঘ সময় পর হজরত খাজা সাহেব হজরত ইউসুফ হামাদানী র. থেকে পৃথক হন। তিনি নিজেকে গোপন রাখতেন। তিনি কী আমল করছেন তা কেউ জানতো না। রাশহাত পৃষ্ঠা ১৮, ১৯।

বিনয় ও ভয় ঃ একদা তিনি ইবাদতখানায় রোদনমগ্ন ছিলেন। বন্ধুরা নিবেদন করলেন, আপনার স্বভাবে সৌন্দর্য ও উত্তম গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও আপনি এতো কান্নাকাটি করেন কেনো? তিনি বললেন, যখন আমি আল্লাহ্‌তায়ালার অমুখাপেক্ষিতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করি, তখন শরীর থেকে প্রাণ বের হওয়ার উপক্রম হয়। আমার এই বিলাপ ও ক্রন্দন এ জন্য যে, হয়তো আমার থেকে এমন কাজ প্রকাশ পেয়েছে, যা আমার জানা নেই অথচ তা আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে অপছন্দনীয়। আল্লাহ্‌র ভয় তাঁর হৃদয়ে এতো প্রবল ছিলো যে, তিনি যে স্থানে বসতেন, মনে হতো তাঁকে হত্যার জন্য এখানে বসানো হয়েছে। নুফহাতুল উন্‌স পৃষ্ঠা ৩৩৯ ও মুখতাসার পৃষ্ঠা ১২ ।

বাণী ঃ হজরত খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানী র. বলেন, যখন আমার বয়স বিশ বছর, তখন হজরত খিজির আ. আমাকে হজরত ইউসুফ

হামাদানী র. এর নিকট অর্পণ করেন এবং আমার তরবিয়তের জন্য ওসিয়ত করেন।

আত্মসমর্পণ কী ঃ একবার জনৈক দরবেশ খাজা সাহেবের কাছে প্রশ্ন করলেন, তাসলিম তথা আত্মসমর্পণ কী? তিনি বললেন, আত্মসমর্পণ হলো মুমিন বান্দা রূহের জগতে নিজের জান মাল আল্লাহ্র নিকট বিক্রি করে দিয়েছে এবং বেহেশত ক্রয় করে নিয়েছে, যেমন আল্লাহ্তায়ালার বাণী—

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

(নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মু'মিনদের নিকট হইতে তাহাদের জান মাল ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, তাহাদের জন্য জান্নাত আছে। সূরা তওবা আয়াত ১১১)। সমর্পণের অর্থ হলো নিজের জীবন ও সম্পদকে আল্লাহ্র মালিকানাধীন মনে করবে। নিজেকে আল্লাহ্র আমানত মনে করবে। যথাসম্ভব জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহ্র বান্দাদের উপকার করবে। কাউকে উপকারের খোঁটা দিবে না। দুনিয়ার মাল-সম্পদকে অন্তরে স্থান দিবে না। নিজেকে আল্লাহ্র আদেশের অধীনে ন্যস্ত করবে।

অবসর ঃ একদিন খাদেম জিজ্ঞেস করলেন, অবসর কী? তিনি বললেন, অন্তরের অবসর হলো দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে স্থান না দেওয়া। দুনিয়ার ব্যস্ততার বন্দীত্ব থেকে স্বাধীন হযে যাওয়া। আল্লাহ্তায়ালা রসুল স. কে বলেন فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (অতঃপর তুমি যখনই অবসর পাইবে একান্তে ইবাদত করিও। সূরা ইনশিরাহ আয়াত ৭)। আর আল্লাহ্ওয়ালাদের বেচা-কেনা, সৃষ্টজীবের সাথে কথা-বার্তা আল্লাহ্তায়ালার জিকিরের প্রতিবন্ধক হয় না। এ জন্য আল্লাহ্তায়ালা এই দলটির প্রশংসা করেছেন এভাবে—

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ

(সেই সব লোক, যাহাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ হইতে বিরত রাখে না। সূরা নূর আয়াত ৩৭)। তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে তোমাদের জন্য মোবারকবাদ।

খেদমত ও মহব্বতঃ যদি তোমাদের দ্বারা এটা না হয়, তবে তোমাদের জীবন ও সম্পদ দ্বারা ওই সমস্ত পুণ্যবানদের সেবা করা থেকে বঞ্চিত হয়ো

না। তাঁদের হৃদয়ের প্রশান্তি ও অবসরের উপাদান তৈরী করে দাও, যাতে তাঁদের দৌলত দ্বারা তোমরা সুসজ্জিত হতে পারো। কেনোনা ওই লোকমার শক্তি দ্বারা যে আনুগত্য ও ইবাদত তাঁদের দ্বারা প্রকাশ পাবে, তার সওয়াব আয়োজনকারীরাও পাবে। তাঁদের মর্যাদা, মাকাম ও পূর্ণতা আহারপ্রদানকারীদের আমলনামায় লেখা হবে। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী— যারা আল্লাহ্ওয়ালা লোকদের সাহায্য সহযোগিতা করবে, তাদের অবস্থান হবে তাঁদেরই সাথে।

আল্লাহ্ওয়ালাদের বৈশিষ্ট্য ঃ এসব বুজর্গদের কেউ কেউ لِيْ مَعَ اللهِ (আল্লাহ্র সাথে) এর বৈশিষ্ট্য রাখেন। যখন তাঁরা আল্লাহ্র ভালোবাসার পাত্র হয়ে যান, তখন তাঁদের দ্বারা পৃথিবী ও আকাশবাসীদের কাজ পূর্ণ হয়ে যায়। কেনোনা একটি জয্বা জিন ইনসানের সকল আমলকে ঢেকে দেয়। তাঁদের এই অবস্থা যদি কোনো লোকের নসিব হয়, আর তিনি জীবন ও সম্পদ দিয়ে তাঁদের খেদমত করতে পারেন, তাহলে তার এ পরিমাণ বিশাল অনুকম্পারাজি অর্জিত হয় যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল লোক একত্রিত হয়ে সেগুলোর হিশাব করতে পারবে না। নিম্নের আয়াতটি এ দিকেই ইশারা করে

وَابْتَغِ فِيمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

(আল্লাহ্ যাহা তোমাকে দিয়াছেন তদ্দ্বারা আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়া হইতে তোমার অংশ ভুলিও না। সুরা কাসাস আয়াত ৭৭)।

অমূল্য বাণী ঃ হজরতের পবিত্র বাণীসম্ভার নকশ্বন্দিয়া তরিকার ভিত্তি যেমন— ১. হুঁশ হর দম ২. নজর বর কদম ৩. সফর দর ওয়াতন ৪. খেলাওয়াত দর আঞ্জুমান ৫. ইয়াদ্ করদ ৬. বাজে গাশ্ত ৭. নেগাহ দাশ্ত ৮. ইয়াদ্ দাশ্ত। এগুলো ছাড়া অন্য সব কিছু ধারণা ও কল্পনা। নিম্নের তিনটি কথাও সূফিদের পরিভাষা— ১. উকুফে জামানী ২. উকুফে কালবী ৩. উকুফে আদাদী। এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এই সুউচ্চ সিলসিলার কিতাবগুলোতে বিদ্যমান। এই নগণ্য ফকির রিসালায়ে রওয়াইহ্ নামক কিতাবে এগুলোর উল্লেখ করেছেন। সূফিদের পরিভাষার মধ্যেই এগুলোর উল্লেখ রয়েছে।

ওসিয়ত ঃ হজরত খাজা কুদ্দিসা সিররুহু স্বীয় পুত্র আরজুমান্দকে উপদেশ দেন— হে বৎস! খোদাভীতিকে নিজের স্বভাব-চরিত্র বানাও। ওজিফা এবং ইবাদতে দৃঢ় থাকো। নিজের হালাতের মোরাকাবা করো। আল্লাহ্কে ভয় করো। আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূলের হক আদায় করো। পিতা-মাতার অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখো। তাঁদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারলে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে। আল্লাহ্র বিধান পালনের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। আর এগুলো সংরক্ষণের দায়িত্ব তোমার। কোরআনুল করীম তেলাওয়াত করতে থাকো। দেখে দেখে অথবা স্মৃতি থেকে সুউচ্চ আওয়াজে বা অনুচ্চ আওয়াজে। এলেম অন্বেষণ থেকে দূরে থেকো না। এলমে ফেকাহ্ ও এলমে হাদিস শিক্ষা করো। জাহেল সূফী ও আম জনতা থেকে দূরে থাকবে। কেনোনা তারা দ্বীনের রাস্তায় চোর ও সন্ত্রাসী। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অনুসারী হবে। পূর্ববর্তী ইমামদের অনুসারী হবে। তাঁদের মতের উপর স্থির থাকবে। কেনোনা পরবর্তীতে অভিনব কথা প্রকাশ পাবে। সেগুলো পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত নয়। যুবক, নারী, বিত্তবান ও বেদাতীদের থেকে দূরে থাকবে। কেনোনা এরা তোমাকে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। দুটি রুটি মিললে তাতেই তুষ্ট থাকবে। ফকির-দরবেশদের সান্নিধ্য অবলম্বন করবে। নির্জনতা অবলম্বন করবে। হালাল খাদ্য খাবে। কেনোনা হালাল খাদ্য উত্তমতার চাবি। হারাম থেকে বিরত থাকবে। অন্যথায় আল্লাহ্তায়ালা থেকে দূরে সরে পড়বে। দ্বীনের উপর স্থির থাকবে। পরবর্তী পৃথিবীতে যেনো দোজখের আগুনে জ্বলতে না হয়। হালাল উপার্জনের পোশাক পরিধান করো। তাহলে ইবাদতে স্বাদ পাবে। রাত দিন ইবাদতে অতিবাহিত করবে। জামাতে নামাজ ত্যাগ করবে না, যদিও তুমি ইমাম বা মোয়াজ্জিন না হও। জামানতদারীর খাতায় নিজের নাম লেখিও না। আদালত এবং কাচারীতে ঘোরাফেরা কোরো না। লোকদেরকে ওসিয়তের মধ্যে দখল দিবে না। সৃষ্টজীব থেকে এমনভাবে দূরে থাকো যেমন দূরে থাকো সিংহ থেকে। আত্মগোপন পছন্দ করো অর্থাৎ আত্মপ্রকাশ থেকে দূরে থাকো। তাহলে তোমার মাযহাব নষ্ট হবে না। সবর অবলম্বন করবে, এতে করে তোমার নফস অপমানিত হবে।

খানকায় অবস্থান করবে ও এর ভিত্তি স্থাপন করবে। কেউ লজ্জা দিলে চিন্তিত হয়ো না। কারো প্রশংসার উপর অহমিকা করবে না। মানুষের সাথে, সৃষ্টজীবের সাথে উত্তম আচরণ করবে, চাই তারা সৎ হোক অথবা হোক

অসৎ। সর্বদা আদবের সাথে থাকবে। সকল সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া করবে। অট্টহাসি হাসবে না। অট্টহাসি হৃদয়কে সংকীর্ণ ও দুর্বল করে দেয়। রসূল স. এরশাদ করেন, আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে অল্প হাসতে আর অধিক কাঁদতে। আল্লাহ্র শাস্তি থেকে নির্ভীক হয়ো না। আল্লাহ্র রহমতের আশা থেকে নিরাশ হয়ো না। ভীতি ও আশার অবস্থায় জীবন যাপন কোরো। সালেকদের অবস্থা এমন হয় যে, কখনো তারা আশার মধ্যে থাকে, আবার কখনো থাকে ভীতির মধ্যে। হে বৎস! সম্ভব হলে বিবাহ করবে না। অন্যথায় দুনিয়া অন্বেষী হয়ে পড়বে। দ্বীনের অনুসন্ধান তোমার কাছ থেকে বিদায় নিবে। তোমার নফস আগ্রহী হলে মুজাহাদা অবলম্বন করবে। সারা জীবন আক্ষেপ করতে থাকবে। প্রতিক্ষণে মৃত্যুকে স্মরণ করবে। পদমর্যাদার আকাঙ্ক্ষী হবে না। যে পদ চায়, সে তরিকতের যাত্রী নয়। সর্বদা রোজা রাখবে। কেনোনা রোজা নফসকে দমন করে। অভাবের ভিতরে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রয়েছে। মুখাপেক্ষিতা, দিয়ানতদারী (সততা), আল্লাহ্র পথে তাকওয়া ও ধৈর্যের সাথে স্থির থাকবে। জীবন, সম্পদ ও শ্রম দিয়ে আল্লাহ্র পথের ফকিরদের খেদমত করবে। তাঁদেরকে পরিতুষ্ট রাখবে। তাঁদের অনুসরণ করবে। তাঁদের পথ স্মরণ রাখবে। তাঁদের কাউকে অস্বীকার অথবা ঘৃণা করবে না। তবে শরীয়তপরিপন্থী কোনো কাজ করলে তাদেরকে অনুসরণ করবে না। ফকির-দরবেশদের সাথে অসদাচরণ করলে মুক্তি পাবে না। লোকদের কাছে কোনো কিছু চাইবে না। নিজের জন্য কোনো কিছু সংরক্ষণ করবে না। আল্লাহ্তায়ালার প্রতিশ্রুতির উপর ভরসা রাখবে। কেনোনা আল্লাহ্তায়ালা বলেন, হে মানুষ! আমি প্রত্যেহ তোমাদের রিজিক পৌঁছে দিয়ে থাকি। তুমি নিজেকে কষ্ট দিয়ো না। তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ্র উপর ভরসার স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। আল্লাহ্তায়ালা বলেন—

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

(যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে তাহার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। সূরা তালাক আয়াত ৩)। জেনে রাখো, রিজিক সুনির্ধারিত। দানশীল হও। আল্লাহ্তায়ালা যা কিছু তোমাদেরকে দিয়েছেন, তা থেকে খরচ করো। কৃপণতা ও হিংসা থেকে দূরে থাকো। কেনোনা কৃপণ ও হিংসুক কাল কিয়ামতের দিন দোজখে প্রবেশ করবে। নিজের বাহ্যিক বিষয়কে সুসজ্জিত

কোরো না। জাহেরকে সুসজ্জিত করাই বাতেনকে ধ্বংস করা। আল্লাহ্-তায়ালার ওয়াদার উপর ভরসা করো। সৃষ্ট জীবের উপর ভরসা ত্যাগ করো অর্থাৎ সৃষ্টজীব থেকে নিরাশ থাকো। তাদের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকবে। সত্য কথা বলবে। কাউকে ভয় করবে না। নিজের নফসের হেফাজত করবে। নফসের সংশোধন করবে। স্বীয় নফসের সম্মান করবে না। যে সকল বিষয় অনুসন্ধান ছাড়াই অর্থাৎ কাউকে জিজ্ঞেস করা ছাড়াই অর্জন করা যায়, সে সকল বিষয়ে মুখ বন্ধ রাখো। সৃষ্টজীবকে সর্বদা কল্যাণের উপদেশ দিবে। খুব প্রয়োজন ছাড়া আহার করবে না। অতি আবশ্যক না হলে কথা বলবে না। নিদ্রার প্রাবল্য না হলে নিদ্রা যাবে না। ঘুম থেকে দ্রুত উঠবে। গানের আসরে অংশগ্রহণ করবে না। কেনোনা সেমা-গান নেফাক সৃষ্টি করে। সেমার আধিক্যে মন মরে যায়। তবে সেমাকে অস্বীকার কোরো না। কেনোনা অনেক বুজর্গ তা শুনেছেন। সেমা সেই সকল লোকদের জন্য জায়েয, যাদের হৃদয় জীবিত, আর দেহ মৃত। যাদের মধ্যে এই দুই অবস্থা নেই তাদের জন্য নামাজ রোজায় লিপ্ত হওয়া উত্তম। তোমার হৃদয় ভারাক্রান্ত থাকবে, আর শরীর নামাজে লিপ্ত থাকবে। এখলাস তথা বিশুদ্ধতার সাথে আমল করবে। তোমার দোয়া মুজাহাদা হবে, তোমার কাপড় পুরাতন হবে, তোমার বন্ধু দরবেশ হবে, তোমার ঘর মসজিদ হবে। তোমার সময় মাসআলার কিতাবে ব্যয় হবে। তোমার সৌন্দর্য হবে দুনিয়াবিরাগ। তোমার প্রশান্তি হবে আল্লাহ্‌র স্মরণ। কারো সাথে ততোক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে এই গুণগুলো না পাওয়া যাবে— ১. যে অভাবকে ধনাঢ্যতার উপর প্রধান্য দিবে। ২. এলেম বা জ্ঞানকে দুনিয়ার সকল বস্তুর উপর প্রাধান্য দিবে। ৩. আল্লাহ্‌র রাস্তায় অপমানকে ইজ্জতের উপর প্রাধান্য দিবে। ৪. এলমে বাতেন ও এলমে জাহের দ্বারা সজ্জিত হবে। ৫. মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকবে।

হে বৎস! দুনিয়া যেনো তোমাকে ধোঁকা না দেয়। এক দিন না একদিন তোমাকে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিতেই হবে। তোমার উচিত হবে, নিভৃতে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, আল্লাহ্‌র ভয়ে হৃদয় কম্পিত রাখা। তাহলে কারামতের মাঝে ডুবন্ত থাকবে। দুনিয়ায় মুসাফিরের মতো জীবন যাপন করবে। দুনিয়া থেকে এমনভাবে বিদায় নিয়ো, যেনো তুমি বুঝতে না পারো, কোন্ দলের সাথে তোমার হাশর হচ্ছে।

হে বৎস! উপদেশগুলো ভালোভাবে স্মরণ রাখবে ও আমল করবে। যেভাবে আমি আমার পীর ও মোর্শেদ থেকে স্মরণে রেখেছি ও আমল করেছি। যদি তুমি এগুলো স্মরণে রাখো ও আমল করো, তবে আল্লাহ্তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাকে পর্যবেক্ষণ ও হেফাজত করবেন। আমি যে সকল কথা উল্লেখ করলাম, তা কোনো সালেকের ভিতরে পাওয়া গেলে নিশ্চয়ই সে স্বীকৃত বুজর্গ হবে। যে ব্যক্তি এগুলো আমল করবে, সে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবে। এ ধরনের বুজর্গীর মর্যাদা সকলের লাভ হয় না।

মাওলানা ফজলুল্লাহ রোজ বাহানী, যিনি মাওলানা ইসফাহানী নামে প্রসিদ্ধ, তিনি এ সকল উপদেশমালার একটি চমৎকার ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রতিটি বিষয়ের উপর একটি করে ছন্দমালা কবিতাও রচনা করেছেন, যাতে স্মরণে রাখা বা মুখস্ত করা সহজ হয়।

খাজা ফজলুল্লাহ্ সাহেব খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানী সাহেবের বড় খলিফা ছিলেন। তিনি বলেন, শায়েখ যখন আমাকে এ উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন আমার হাত ধরে কথাগুলো বলে যাচ্ছিলেন। তাঁর হাত আমার হাতের মধ্যে ছিলো।

আলেমের শাস্তি ঃ এক দরবেশ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আলেমের শাস্তি কী ধরনের হতে পারে? তিনি বলেন, আলেম যখন দুনিয়া অন্বেষণে লিপ্ত হয়ে যায় এবং আখেরাত অন্বেষণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন আল্লাহ্তায়ালা তাকে দুনিয়াতে শাস্তি দিয়ে থাকেন। সেই শাস্তির ধরন এরকম— ইবাদতের স্বাদ তার হৃদয় থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়। সে ইবাদতে আর আনন্দ পায় না। ইবাদতে আলস্য আসে এবং সে নেক কাজ হতে বিরত থাকে। তখন তাকে আখেরাতের শাস্তির জন্য প্রস্তুত করা হয়।

হাদিস শরীফে এসেছে— জাহেলের জন্য একবার আক্ষেপ আর আলেমের জন্য সত্তর বার।

নামাজে একাগ্রতা ও বিনয় ঃ এক ব্যক্তি হজরত খাজা কুদ্দিসা সিররুহুকে জিজ্ঞেস করলো, নামাজে একাগ্রতার অর্থ কী? তিনি বললেন, নামাজির অন্তরে আল্লাহ্ভীতি এমন প্রবল হবে যে, যদি তাকে তীর মারা হয়, তবুও তার কোনো খবর হবে না। সে বললো, এটা কীভাবে সম্ভব? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এ ভেদ সম্পর্কে অবগত, তার বাতেন রক্তের মতো জমাট, অতঃপর সে কীভাবে অবহিত হতে পারে? কে জানতে পারে, তার

বিষয়টি কেমন এবং কার সাথে? তার বাহ্যিক কষ্টের কোনো অনুভূতি হয় না। মহান সেই সত্তা কেবল তার সম্পর্কে অবগত। শায়েখের কথায় তার অন্তরে এমন প্রতিক্রিয়া হলো যে, সে তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেললো। হুঁশ ফিরে পেলে বললো, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। আমি কথাগুলোর উপর আমল করবো। কিয়ামত দিবসে আমার হিশাব যেনো মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি বলেন, তিনটি কাজ এমন, যে ব্যক্তি সেগুলো পছন্দ করবে, ভালোবাসবে, দোজখ তার শাহরগ থেকে নিকটবর্তী হবে। ১. উত্তম খাদ্য ২. ধনীদের সাথে উঠা বসা। ৩. উত্তম পোশাক পরিধান করা। কেনোনা এ তিনটি কাজ কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী হবে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

সৃষ্টজীবের প্রতি ভালোবাসা ঃ হজরত খাজা কুদ্দিসা সিররুহু বলেন, এক রাতে আমি ইবাদতখানার ছাদে ইবাদতে লিপ্ত ছিলাম। আমার প্রতিবেশী এক বৃদ্ধা তার স্বামীর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। সে বলছিলো, সত্তর বছরের অধিক সময় আমি তোমার ঘরে আছি। প্রায়শঃ তুমি আমাকে ক্ষুধার্ত রেখেছো, বিবস্ত্র রেখেছো। কিন্তু আমি ধৈর্য ধারণ করেছি। শীতে গ্রীষ্মে সব ধরনের পরিশ্রম সহ্য করেছি। তুমি যা কিছু দিয়েছো তা থেকে বেশী কিছু চাইনি। তোমার অভাব অনটন গোপন রেখেছি, কারো কাছে প্রকাশ করিনি; কারো কাছে অভিযোগ করিনি; এ সব এজন্য করেছি যে, তুমি আমার হবে। আর আমি তোমাকে আমার কাছে দেখতে পাবো। কিন্তু তুমি যদি অন্য কোনো নারী অবলম্বন করো আর আমার সামনে বসো, তাহলে আমি আমার হাত দিয়ে খাজা আবদুল খালেকের আঁচল ধরবো। যতোক্ষণ পর্যন্ত তিনি আমার প্রতি ইনসাফ না করবেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি তাঁর আঁচল ছাড়বো না। এ দুর্বল অসহায় নারীর কথা আমার আগ্রহ বাড়িয়ে দিলো। আমি মনে মনে বললাম, হে আবদুল খালেক! এ নারী সৃষ্টজীবের ভালোবাসায় এতো দৃঢ় যে, পার্থিবতার জন্য সে অনেক বিপদ সহ্য করেছে। এ ঘটনা সালেকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। এরপর ভাবতে লাগলাম, যদি এ ব্যাপারে কোনো দলিল পেয়ে যেতাম। অতঃপর এ বিষয়ে কোরআনুল করীম থেকে একটি দলিলও মিলে গেলো। যেমন—

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ -

(নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁহার সহিত শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, ইহা ব্যতীত সব কিছু যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। সূরা নিসা আয়াত ১১৬)।

ফানায়ে নফস ঃ একদা খাজার দরবারে এক দরবেশ বলে ফেললেন, যদি আমাকে বেহেশত ও দোজখ গ্রহণের স্বাধীনতা প্রদান করা হয়, তাহলে আমি দোজখ গ্রহণ করবো কেনোনা আমি সারা জীবন নফসের বিরোধিতায় অতিবাহিত করেছি। আর বেহেশত নফসের চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। আমি প্রিয় জিনিস পছন্দ করি কিন্তু নফসের জন্য নয়। হজরত খাজা কুদ্দিসা সিররূহু তাঁর কথা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, বান্দার পছন্দের কী প্রয়োজন? বন্ধু যেখানে পাঠাবে সেখানেই যাবে। যেখানে অবস্থান করতে বলবে, সেখানেই অবস্থান করবে। এটাই বন্দেগীর পদ্ধতি। দরবেশ বললেন, এমন ব্যক্তির উপর শয়তানের প্রভাব থাকতে পারে না।

তিনি আরও বলেন, যখন কেউ রাগান্বিত হয় তখন শয়তান তার উপর বিজয় লাভ করে। কিন্তু যে সালেক নফসকে ফানা করতে পেরেছেন, তিনি রাগান্বিত হন না। তবে তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ থাকে। আর যার আত্মমর্যাদাবোধ থাকে তার থেকে শয়তান পলায়ন করে। এই গুণটি ওই সব লোকদের মধ্যে তৈরী হয়, যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় চলে। আর যারা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রসুলকে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং এই দু'য়ের আলোকে পথ চলতে থাকে, তারা রাস্তা হারাবে না। আর এটাই সোজা রাস্তা।

কারামত ১ ঃ হজরত খাজা কুদ্দিসা সিররুহুর এক মুরিদ স্বপ্নে দেখলেন, একদল লোক এসে তাকে বলতে লাগলো, তুমি পূর্ণতায় পৌঁছে গিয়েছো। তারা তার জন্য একটি উট নিয়ে এলো। তাতে তাকে আরোহণ করালো এবং বললো, আমরা তোমাকে বেহেশতে নিয়ে যাবো। তিনি বেহেশতের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং এমন একটি স্থানে পৌঁছলেন, যেখানে ছিলো মনোরম ও মনোমুগ্ধকর ঘনবৃক্ষের সারি, সুন্দরী রমণীরা সেবার জন্য দণ্ডায়মান, আর পরিচ্ছন্ন ও মজাদার আহার্য দস্তরখানায় পরিবেশন করা হচ্ছে। প্রবাহিত হচ্ছিলো পানির নহর। সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হলে সে নিজেকে ইবাদতখানায় দেখতে পেলো। এভাবে সে একই স্বপ্ন কয়েকবার দেখতে পেলো। তার মস্তিষ্কে অহংকার ও অহমিকাপূর্ণ চিন্তার সৃষ্টি হলো। সে খাজা সাহেবের মজলিশে আসা বন্ধ করে দিলো। হজরত খাজা কুদ্দিসা সিররুহু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও বুজর্গীর মাধ্যমে বুঝতে পারলেন, ওই নাদান মূর্খ শয়তানের ধোঁকায় পতিত হয়েছে। তিনি তার ইবাদতখানায় উপস্থিত হলেন। দেখতে পেলেন, তার চোখে মুখে বুজর্গীর ভাব। হজরত খাজা কুদ্দিসা সিররুহু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখন কোন্ মাকামে

আছো? সে সকল অবস্থার বর্ণনা দিলো। হজরত খাজা কুদ্দিসা সিররুহু বললেন, আবার যখন তুমি সেই মাকামে পৌঁছবে, তখন তুমি তিন বার লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পড়িও। সে তাই করলো। পরের রাতে যখন সেই মাকামে পৌঁছলো, তখন সে খাজা সাহেবের নির্দেশানুযায়ী তিন বার লা হাওলা.... পাঠ করলো। তখন সে দেখতে পেলো, যেই দলটি তার কাছে এসেছিলো এবং কাকুতি মিনতি করে তাকে সেই স্থানে নিয়ে গিয়েছিলো, মুহূর্তমধ্যে তারা অদৃশ্য হয়ে গেলো। দেখলো, সে একটি ময়লার স্তূপে বসে আছে। আশে পাশে পড়ে আছে অনেক মৃত প্রাণীর অস্থি। তখন সে বুঝতে পারলো, এগুলো শয়তানের কারসাজি। অতঃপর সে তওবা করে নিয়মিত খাজা সাহেবের দরবারে উপস্থিত হতে লাগলো।

কারামত ২ ঃ হজরত খাজা কুদ্দিসা সিরুহুর বুজর্গী ও ক্ষমতা এ পর্যন্ত উপনীত হয়েছিলো যে, তিনি কখনো কখনো এক এক ওয়াক্তের নামাজ বায়তুল্লায় আদায় করতেন, আবার স্বস্থানে ফিরে আসতেন। সিরিয়াতে তাঁর অনেক ভক্ত ও মুরিদ রয়েছে। সেখানে খানকা নির্মিত হয়েছে। কিন্তু বাহ্যিকভাবে তিনি গজদাওয়ানেই অবস্থান করতেন। প্রথমদিকে গজদাওয়ানের লোকজন তাঁকে বুজর্গ বলে জানতে পারেনি। কেনোনা তিনি আত্মপ্রকাশ পছন্দ করতেন না। আর সেখানকার লোকজন তাঁর পবিত্র সোহবতের উপযোগীও ছিলো না। নুফহাতুল মুখতাসার পৃষ্ঠা ৩৪০।

কারামত ৩ ঃ তাঁর যুগে গজদাওয়ানে একজন মৌলভী ছিলো। তিনি চল্লিশ বছর যাবত এলেমের দরছ দিচ্ছিলেন। বহু ছাত্র তাঁর নিকট এলেম অর্জনের জন্য আসতো। হজরত খাজা সাহেবও তাঁর পাঠদানকক্ষে উপস্থিত হতেন।। একদা হজরত খাজা সাহেব বাজারে গোশত ক্রয় করছিলেন। আর আউলিয়া কাবির উক্ত রাস্তা দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ ও দয়া তাঁকে তাওফিক প্রদান করলো। তিনি হজরতের কাছে আশা ব্যক্ত করলেন, এই গোশত এ ফকিরের হাওয়ালা করে দিন, আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। এই খেদমত করতে পারলে নিজেকে সৌভাগ্য মনে করবো। তিনি তাঁর কারামত ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বুঝতে পারলেন, এ যুবকের মধ্যে এমন যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, তাকে তরবিয়ত দেওয়া হলে সে সারা জাহানের নেতা হবে। হজরত সেই গোশত তার হাতে দিলেন এবং তাকে তাঁর হৃদয়েও স্থান করে দিলেন। হজরতের শুভদৃষ্টির প্রভাবে খাজা আউলিয়া কাবিরের এমন অবস্থা হলো যে, তিনি পুরোপুরি

আল্লাহ্তায়ালার দিকে মনোযোগী হলেন এবং হালের প্রাবল্যের কারণে জাহেরী এলেম অর্জন থেকে দূরে সরে গেলেন। যখন রাস্তায় খাজা আউলিয়া কাবিরের সাথে মৌলভী সাহেবের দেখা হতো, তখন ওই মৌলভী তরিকত গ্রহণের জন্য খাজা সাহেবকে তিরস্কার করতেন। খাজা আউলিয়া কাবির নীরব থাকতেন। এক রাতে খাজা আউলিয়া কাশফের মাধ্যমে মৌলভী সাহেবকে একটি নিকৃষ্ট পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখলেন। সকালে রাস্তায় সেই মৌলভী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ ঘটলো। তিনি তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী হজরত খাজা আউলিয়াকে তিরস্কার করতে লাগলেন। হজরত খাজা আউলিয়া বললেন, হে ওস্তাদ! আপনার লজ্জা হয় না, আপনি আমাকে নেক কাজের জন্য তিরস্কার করছেন। আর আপনি অমুক নাজায়েয কাজে লিপ্ত আছেন। মৌলভী লজ্জিত হলেন এবং বুঝতে পারলেন, হজরত খাজার সান্নিধ্য দ্বারা তাঁর বিজয়ের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

পদমর্যাদার ভালোবাসা ঃ মৌলভী সাহেব হজরত খাজা কুদ্দিসা সিররুহুর খেদমতে উপস্থিত হলেন। আবেদন করলেন, চল্লিশ বছর যাবত জাহেরী এলেম শিক্ষা দিচ্ছি। আপনার উপর আমার সম্পর্কে ইলমে গায়েব থেকে যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে, সে বিষয়ে আমাকে সতর্ক করুন। হজরত খাজা বললেন, হে প্রিয়জন! আপনি অনেক কঠিন কাজের আদেশ করেছেন। এ বিষয়ে আমাকে অবগত করানো হলে আপনাকে জানাবো। তিনি সেই অপেক্ষায় ছিলেন। হঠাৎ এক রাতে তাহাজ্জুদ নামাজের পর তাঁর কানে আওয়াজ ভেসে এলো— তুমি ওই আলেমকে বলে দাও যে, আপনি চল্লিশ বছর যাবত এলেম শিক্ষা দিচ্ছেন, অথচ একটি বারও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিয়ত করেননি। পরদিন মৌলভী সাহেব হজরত খাজার দরবারে এলে তিনি তাঁকে বললেন, গতকাল এক বাণী আমাকে অবগত করানো হয়েছে। তিনি সবকিছু খুলে বললেন। তাঁর কথা শুনে মৌলভী সাহেবের মধ্যে জোশ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। হুঁশ ফিরে এলে খাজার বাণীর সত্যায়ন করলেন। বললেন, আমি চিন্তা-ভাবনা করে দেখলাম, চল্লিশ বছর এলেমের দরস দিয়েছি শুধু নফসের চাহিদা পূরণ ও মর্যাদা লাভের জন্য। আর আপনি হৃদয়ের চিকিৎসক। এখন বলুন, এ থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে? শায়েখ বললেন, নিজের নফসের বিরুদ্ধে চলবেন, মর্যাদার লোভ পরিত্যাগ করবেন, তাহলেই সংশোধন হয়ে যাবেন। মৌলভী সাহেব হজরতের হাতে বায়াত হলেন। তাঁর মজলিশে

নিয়মিত বসতে লাগলেন। চল্লিশ দিন, চল্লিশ রাত আত্মশুদ্ধির জন্য একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। পানাহার বর্জন করলেন। এক চিল্লার পর তিনি পরপারে পাড়ি দিলেন। তাঁর মৃত্যুর রজনীতে লোকজন তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহ্‌তায়ালা আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তিনি আমার উপর করুণা বর্ষণ করেছেন। যে ব্যক্তি মুসলমান হিশাবে জীবিত থাকতে চায় এবং মুসলমান অবস্থায় ইন্তেকাল করতে চায়, তার উচিত সে যেনো শায়েখ আবদুল খালেকের দামান (আঁচল) দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে। কেনোনা তাঁর তরিকা হলো সিদ্দিকে আকবরের তরিকা। এ ঘটনার পর লোকজন হজরত খাজার আসল পরিচয় পায়। লোকেরা দলে দলে তাঁর কাছে বায়াত হতে থাকে। রাশহাত এবং জিকরে খাজা আউলিয়ায়ে কাবির।

কারামত ৪. হজরত খাজার হাতে হজরত সদর সাঈদ র. এর মুরিদ হওয়ার কারণ এই ছিল যে, তিনি একদিন তাঁর এলাকার এক লোককে ওয়াকফ সম্পত্তি আয়ত্ত করার জন্য গজদাওয়ানে প্রেরণ করেন। দূত খাজা সাহেবের মসজিদে ফজরের নামাজ আদায় করেন। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর দেখতে পান এক দরবেশ মাথা ঝুঁকিয়ে মসজিদে বসে আছেন। ইতোমধ্যে একজন মুসাফির এসে সালাম না দিয়েই তাঁর পিছনে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ অবস্থান করে চলে গেলেন। এরপর আরেকজন মুসাফির এলেন, তিনিও সালাম না দিয়েই বসে পড়লেন, কিছুক্ষণ অবস্থান করে চলে গেলেন। তৃতীয় আরেকজন মুসাফির এসে সালাম না দিয়েই বসে পড়লেন। এবার হজরত খাজা মোরাকাবা থেকে মস্তক উত্তোলন করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ছাদের অবস্থা কী? মুসাফির উত্তর দিলেন, নির্মাণ কাজ চলছে। দূত বললেন, আমি মুসাফিরের পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এই দরবেশের পরিচয় কী? আর আপনারা কারা? আপনারা প্রত্যেকেই এসে সালাম ছাড়াই বসে পড়ছেন, সামান্য সময় অবস্থান করে সালাম না দিয়েই চলে যাচ্ছেন। আপনিও এমন করলেন। আর শুধু আপনারই সাক্ষাতের সুযোগ হলো— এর কী রহস্য? মুসাফির বললেন, এই শায়েখ আমাদের পীর কেবলা। তাঁর নাম খাজা আবদুল খালেক। তিনি সিরিয়ার ওস্তাদ। সিরিয়ায় আমরা কোনো সমস্যায় পতিত হলে তাঁর শরনাপন্ন হই। তাঁকে মনে মনে সালাম করে থাকি ও মনে মনেই তাঁর নিকট দরখাস্ত করে থাকি। কলবী পদ্ধতিতেই সালাম বিনিময় ও

সমাধান শুনে থাকি। দূত বললেন, ছাদ সম্পর্কে তিনি যা বললেন, তার রহস্য কী? মুসাফির বললেন, সিরিয়ার মসজিদের ছাদ ভেঙে পড়েছে। আর এ সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করা হয়েছে। এরপর দূত চলে গেলেন। তিনি সদর সাঈদের নিকট সকল ঘটনা খুলে বললেন। সদর সাহেব বললেন, আক্ষেপ! এতোবড় আল্লাহ্‌র ওলী থাকা সত্ত্বেও তাঁর সম্পর্কে আমাদের কোনো অবগতি নেই। তিনি একটি পত্র লিখে সেই দূতের মাধ্যমে প্রেরণ করলেন। লিখলেন, গজদাওয়ানের ওয়াকফকৃত জমির খাজনা হজরতের খানকায় পৌঁছে দিয়ো। দূত খুবই খুশি ও আনন্দের সাথে পরওয়ানা নিয়ে হজরত খাজার খেদমতে উপস্থিত হলেন। খাজা সাহেব এগুলো ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি সদরকে বলবে, আপনার রাজ্য এ সীমানার মধ্যে। আর আমার রাজ্য পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত। আমার জন্য এগুলো গ্রহণ করা সমীচীন নয়। দূত সদর সাহেবের কাছে ফিরে এলো এবং সকল ঘটনা খুলে বললো। সদর সাহেব খাজার ভক্ত হয়ে পড়লেন। হজরতের খাদেমদের অন্তর্ভুক্ত হলেন। অধিকাংশ সময় এমন হতো যে, সদর সাঈদ ফজরের নামাজ থেকে চাশ্‌তের নামাজ পর্যন্ত খাজার খেদমতে দাঁড়িয়ে থাকতেন। একদিন খাজা সাহেবের মোরাকাবা বেশ বিলম্বিত হচ্ছিলো। খাদেম মোরাকাবা অবস্থায় ভাবছিলেন, সদর সাহেব অনেকক্ষণ যাবত আপনার খেদমতে দাঁড়িয়ে আছেন। হজরত খাজা বললেন, আমি এজন্য বিলম্ব করছি যাতে ওই সকল লোকের কাফফারা হয়ে যায়, যারা সারাদিন সদর সাহেবের খেদমতে দাঁড়িয়ে থাকে।

কারামত ৫ ঃ বোখারার এক মজযুব নারী। তাঁর নাম আয়েশা। তিনি প্রসিদ্ধ পাগলিনী ছিলেন। বেপর্দা থাকতেন। সারাদিন বাজারে ঘুরাফেরা করতেন। লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করতো, তুমি পর্দা করোনা কেনো? তিনি বলতেন, এই শহরে পুরুষ কে যে, তার থেকে আমি নিজেকে আবৃত করবো? একদিন সকালে রুটির দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন চুলার মুখ খোলা ছিলো। হঠাৎ তিনি চুলার মধ্যে প্রবেশ করলেন। বললেন, চুলার মুখ বন্ধ করো। এই শহরে একজন পুরুষ লোক প্রবেশ করেছে। আমি তাঁর থেকে নিজেকে আবৃত করছি। লোকজন কিছুক্ষণ পর চুলার মুখ খুলে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার অবস্থা কী? তিনি বললেন, কাপড় আনো পরিধান করবো। তাঁকে কাপড় দেওয়া হলো। কাপড় পরিধান করে তিনি বেরিয়ে এলেন। দেখা গেলো, চুলার আগুন তার শরীরের একটি লোমও স্পর্শ

করেনি। রুটি প্রস্তুতকারী ও চুলার আগুন প্রজ্জ্বলনকারী অবাক হয়ে গেলো। তারা বুঝতে পারলো, এই পাগলিনী আল্লাহ্‌র ওলী। লোকজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, খোদার কসম! বলো, ওই লোকটি কে, যার জন্য তুমি চুলায় প্রবেশ করলে? পাগলিনী বললেন, আমার সাথে চলো। আমি তাঁকে দেখতে যাচ্ছি। অবশেষে তিনি লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে হজরত খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানীর খেদমতে উপস্থিত হলেন। হজরত খাজা গজদাওয়ান থেকে বোখারায় এসেছিলেন। তিনি পাগলিনীর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে মারেফাতের ভেদ ও গোপন রহস্য সম্পর্কে আলোচনা হলো। এগুলো শুধু তাঁরাই বুঝতে পারলেন। রুটি প্রস্তুতকারী ও আগুন প্রজ্জ্বলনকারী হজরত খাজার ভক্ত হয়ে গেলেন। জিকির করার পদ্ধতি শিক্ষা করলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা উদ্দেশ্যে উপনীত হলেন।

কারামত ৬ ঃ হজরত খাজা কুদ্দিসা সিররুহু স্বীয় ভক্তবৃন্দকে নিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। পিপাসিত হলেন। নিকটে একটি কূপ পাওয়া গেলো, কিন্তু বালতি এবং রশি পাওয়া গেলো না। সাথীরা ভগ্নহৃদয় ও নিরাশ হয়ে পড়লেন। হজরত খাজা বললেন, আমরা নামাজ আদায় করে নেই আর তোমরা পানি পান করে, ওজু করে নিবে। সঙ্গীরা হজরতের কথা শুনে বুঝতে পারলেন, পানি অবশ্যই পাওয়া যাবে। পুনরায় কূপের কাছে আসার পর দেখা গেলো হজরতের কথা অনুযায়ী পানি কূপের মুখে উঠে এসেছে। সকলে পানি পান করলেন ও ওজু করে নিলেন। একজন একটি পাত্রে পানি ভরে নিলো। সাথে সাথে কূপের পানি গভীরে চলে গেলো। ঘটনাটি হজরত খাজাকে বলা হলে তিনি বললেন, তোমরা যদি আল্লাহ্‌তায়ালার উপর ভরসা করতে, তবে কিয়ামত পর্যন্ত কূপের পানি নিচে নামতো না।

কারামত ৭ ঃ একবার আশুরার দিন তাঁর দরবারে অনেক লোক সমবেত হলো। তিনি এলমে মারেফাত সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ইতোমধ্যে এক যুবক খেরকা পরিধান করে জায়নামাজ কাঁধে নিয়ে শায়েখের দরবারে উপস্থিত হলো এবং এক কোণায় বসে পড়লো। শায়েখ তাঁকে এক নজর দেখলেন। তাঁকে চিনে ফেললেন এবং তাঁর কাজ পূর্ণ করে দিলেন। এক ঘন্টা পর ওই যুবক উঠে গিয়ে খাজা সাহেবকে বললেন, হে খাজা! হাদিস শরীফে এসেছে— মুমিনের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় করো, কেনোনা সে আল্লাহ্‌র নূরের সাহায্যে দেখতে পায় (কুনুযে হাকায়েক)। এই হাদিসের

তাৎপর্য কী? তিনি এর তাৎপর্য ব্যাখ্যাব্যপদেশে বললেন, তুমি পৈতা খুলে ফেলো এবং ইমান গ্রহণ করো। যুবক বললো, আমার কাছে কোনো পৈতা নেই। তিনি খাদেমকে ইশারা করলেন। খাদেম নিকটে গিয়ে জামা উত্তোলন করলেন। ভিতরে পৈতা দেখা গেলো। যুবকটি তখনই পৈতা খুলে ফেললো এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর ইমান এনে মুসলমান হয়ে গেলো। নুফহাতুল ফারেসী পৃষ্ঠা ৩৪০।

কারামত ৮ ঃ একবারের ঘটনা। বহু দূর থেকে একজন মুসাফির আগমন করলেন। এমন সময় এক সুন্দর যুবক বিনয় ও নম্রতার সাথে উপস্থিত হয়ে তার অস্থিরতা ও দৈন্যদশা উল্লেখ করে হজরতের নিকট দোয়াপ্রার্থী হলো। শায়েখ তার জন্য আল্লাহ্র দরবারে হাত উঠালেন। সহসা যুবক অদৃশ্য হয়ে গেলো। মুসাফির এই অবস্থা দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। আদব ও বিনয়ের সাথে নিবেদন করলেন, যুবকটি কে এবং সে কোথায় গেলো? উত্তরে তিনি বললেন, যুবকটি একজন ফেরেশতা। চতুর্থ আকাশে তার স্থান। কোনো একটি ভুলের কারণে তাকে আকাশ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে দুনিয়ার আকাশে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। অন্যান্য ফেরেশতাদের নিকট তার অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং কীভাবে সে পূর্বের স্থান ফিরে পাবে, তা জানতে চেয়েছে। তারা আমার ঠিকানা বলে দিয়েছে। এজন্য সে আমার নিকট দোয়ার জন্য এসেছে। আমি দোয়া করলে তা কবুল করা হয়েছে এবং সে পূর্বের স্থানে ফিরে গিয়েছে। নুফহাত পৃষ্ঠা ৩৪০।

কারামত ৯ ঃ একবার তিনি আত্মিক নিমজ্জন অবস্থায় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নিম্নোক্ত ছন্দমালা আবৃত্তি করলেন—

* বন্ধুর জন্য উত্তম হলো মন্দ শত্রু, যুদ্ধে লোহা আর সন্ধিতে মোম।

* নূরের ঝর্ণনায় গজদাওয়ান আলোকিত হবে, উভয় দিক থেকে শত্রু তরবারি উঁচু করে আসছে রোম পর্যন্ত।

লোকজন কবিতাটির অর্থ বুঝতে পারলো না। তাঁর ইন্তেকালের দীর্ঘ সময় পর ৯৮০ হিজরীতে সরকানবাসীর অবাধ্য বাহিনী এক লক্ষ রক্ত পিপাসু সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলো। মজবুত পাহাড় আর শত্রুবাহিনীর মোকাবেলা করে টিকে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব হলো না। শত্রুবাহিনী জায়হুন নদী পাড়ি দিয়ে মাওয়ারাউন্নাহার পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। তারা ফেত্না ফাসাদ করতে করতে ও আল্লাহ্র বান্দাদেরকে রক্তে রঞ্জিত করতে

করতে সামনে অগ্রসর হলো। বোখারা দখলের ইচ্ছা পোষণ করলো। তাদের ইচ্ছা ছিলো, তারা বিজয়ী হলে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের লোকদের মাজারসমূহ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিবে। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা ছিলো অন্য রকম। তারা সর্বপ্রথম গজদাওয়ান শহর ঘিরে ফেললো। সেখানে হজরত খাজা কুদ্দিসা সিররুহুর মাজার ছিলো। হজরত খাজা কুদ্দিসা সিররুহু সুলতান নামুর আযবেককে স্বপ্নে এই মর্মে সুসংবাদ দিলেন যে, বিজয় তোমাদেরই হবে। বাদশাহ্ হজরত খাজার মাজারে উপস্থিত হলেন। শত্রুরা তাদের উপর আক্রমণ করে বসলো। খাজার মাজারেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। বাদশাহ্ আযবেক হজরত খাজার রূহানী সহযোগিতায় শত্রুবাহিনীর নেতা ও পঞ্চাশ হাজারের অধিক শত্রু বাহিনীকে পর্যুদস্ত করলেন। এই ঘটনার পর হজরত খাজার পঙ্ক্তিগুলোর মর্ম সকলেই বুঝতে পারলো। কেনোনা শত্রুবাহিনী দরিয়া জায়হুন থেকে রোম পর্যন্ত দখল করে রেখেছিলো। শেষে তারা হজরত খাজার তরবারির আঘাতেই নিহত হলো। এখন পৃথিবীতে তাদের নাম পর্যন্ত উচ্চারিত হয় না।

হজরতের জীবনসায়াহ্নে বন্ধু-বান্ধব, সন্তান-সন্ততি, ভক্তবৃন্দ সকলে চারপাশে জমা হতে লাগলো। তিনি চোখ খুললেন। বললেন, বন্ধুগণ! তোমাদেরকে এই মর্মে মোবারকবাদ যে, আল্লাহ্তায়ালা আমার উপর সন্তুষ্ট। আর সন্তুষ্টির সংবাদও আমাকে দেওয়া হয়েছে। এই বাণী শোনার পর সকল বন্ধু-বান্ধব প্রিয়জন কান্নাকাটি করতে লাগলো। প্রত্যেকেই তাঁর কাছে দোয়ার প্রার্থনা করলেন। তিনি বললেন, বন্ধুরা! তোমরা বরকতময় হও। আল্লাহ্তায়ালা এই মর্মে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, যারা এই তরিকা অবলম্বন করবে, তিনি তাদেরকে মাফ করে দিবেন এবং তাদের উপর রহমত বর্ষণ করবেন। চেষ্টা করে এই তরিকার উপর অটল থাকার চেষ্টা কোরো। তরিকা থেকে কখনো বিচ্যুত হয়ো না। আল্লাহ্তায়ালার ওয়াদার দ্বারা তোমরা সম্মানিত হও। এই বাণী শোনার পর সকলে আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরই ধ্বনিত হলো—

يَآاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً -

فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ- وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ-

(হে প্রশান্তচিত্ত! তুমি তোমার প্রভুপালকের নিকট ফিরিয়া আস, সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হইয়া, আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও, আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো। সুরা ফাজ্‌র আয়াত ২৭-৩০)। সাথীগণ দেখতে পেলেন, তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। ঘটনাটি ৬১৭ হিজরীর। কেউ কেউ তাঁর ইন্তেকালের তারিখ ৬১৬ হিজরী লিখেছেন। আবার কেউ কেউ লিখেছেন ৬১৫ হিজরী।

বাণী ঃ হজরত খাজার ইন্তেকালের পর লোকজন স্বপ্নে দেখলেন, তিনি আরশের এক প্রান্তে নূরের সিংহাসনে উপবিষ্ট। চতুষ্পার্শ্বে ফেরেশতারা সমবেত। তারা তাঁর কাছে আল্লাহ্‌র সালাম পৌঁছে দিচ্ছেন। এক ফেরেশতা তাঁর নিকট জানতে চাইলো, আপনার নিকট এমন কোনো হাদিস পৌঁছেছে কি, যার উপর আপনি আমল করেননি? হজরত খাজা বলেন, হ্যাঁ। তবে আমি আশাবাদী আমার পর আমল হবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কোন্ হাদিস? তিনি বললেন, হাদিসে কুদসী। আমি হাদিসের শেষ অংশের উপর আমল করিনি। আমি আশাবাদি আমার ইন্তেকালের পর তা হবে।

কথিত আছে, তাঁর ইন্তেকালের পর লোকজন তাঁর প্রতি এতো আসক্ত হয়ে পড়লো যে, তারা তাঁর কবর মোবারক সোনা দিয়ে মুড়ে দিতে চাইলো। কিন্তু এরকম তাঁর পছন্দ ছিলো না বলে তাঁর কবরের উপর কোনো গৃহ নির্মাণ করা হয়নি। আর এরকম সাহসও কেউ করেনি।

তিন খলিফা ঃ এ কথাটি গোপন নয় যে, হজরত খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানী ব্যতীত হজরত খাজা ইউসুফ হামাদানীর আরও তিনজন খলিফা ছিলেন।

প্রথম খলিফাঃ হজরত খাজা আবদুল্লাহ বারকি কুদ্দিসা সিররুহু। তিনি খাওয়ারিজমে অবস্থান করতেন। তিনি আলেম, আরেফ, মর্যাদাবান ও কারামতের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতৃপুরুষগণের কেউ কেউ বকরী বিক্রি করতেন। তাঁরা ছিলেন ব্যবসায়ী। এজন্য তাঁকে বারকী বলা হতো। তাঁর কবর মোবারক বোখারার এক জংগলের এক টিলায়। সেখানে শায়েখ আবু ইসহাক কুলাবাদী কুদ্দিসা সিররুহুর মাজারও অবস্থিত।

দ্বিতীয় খলিফা ঃ হজরত খাজা হাসান আন্দকী। বোখারা শহর থেকে তিন মাইল দূরত্বে একটি গ্রামের নাম আন্দকী। তিনি তাঁর যুগের শায়েখ ছিলেন। মুরিদগণের তালীম-তরবিয়ত করতেন। মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে

আহ্বান করতেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন। সর্বদা ইবাদত ও সাধনায় লিপ্ত থাকতেন। সুন্নতের অনুসারী ছিলেন। তিনি অধিক সময় স্বীয় মোর্শেদ হজরত খাজা ইউসুফ হামাদানী র. এর সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন। তাঁর সাথে হেজাজ ও বাগদাদ সফর করেন। জন্ম ৪৬৬ হিজরীতে। ইন্তেকাল ২৭শে রমজান ৫৫২ হিজরীতে। কবরস্থান বোখারা শহর থেকে বের হওয়ার দরজা ফটক কুলাবাদে। রাশহাত পৃষ্ঠা ৭।

তৃতীয় খলিফা ঃ খাজা আহমদ এসাবী কুদ্দিসা সিররুহু। তিনি ছিলেন প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, কারামতের অধিকারী, বরকতওয়ালা ও উঁচুমর্যাদার অধিকারী। তুর্কীস্তানের প্রসিদ্ধ শহর এসী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সিলসিলার মুরিদ সেখানে বিদ্যমান। শৈশবকালে তিনি হজরত বাবা আরসালানের সৌভাগ্যের নজরে পড়েন। তিনি মহানবী স. এর নির্দেশে তাঁর লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার কাজে নিয়োজিত হন। তিনি হজরত বাবা আরসালানের সান্নিধ্যে থেকে অনেক উন্নতি সাধন করেন। হজরত বাবা আরসালানের ইন্তেকালের পর তাঁর পূর্ব নির্দেশানুযায়ী বোখারায় আগমন করেন। তিনি হজরত খাজা ইউসুফ হামাদানী র. এর সান্নিধ্যে সুলুকের পথ পূর্ণ করেন। পরিপূর্ণতার মাকামে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর খেলাফতের ভিত্তিতে তিনি ধর্মপ্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অদৃশ্য ইঙ্গিতে তাঁকে বোখারা থেকে পুনরায় এসী নগরীতে সফরের নির্দেশ দেওয়া হয়। তখন তিনি তাঁর মুরিদগণকে খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানীর সান্নিধ্যে থাকার ওসিয়ত করেন। হজরত খাজা আহমদ এসাবী কুদ্দিসা সিররুহু তুর্কিস্তানের মাশায়েখদের প্রধান ছিলেন। তুর্কিদের অধিকাংশ মাশায়েখ তাঁর সাথে সম্পৃক্ত। রাশহাত পৃষ্ঠা ৮।

হজরত খাজা আরেফ রেওগাড়ী কুদ্দিসা সিররুহু

হজরত খাজা আরেফ রেওগাড়ী কুদ্দিসা সিররুহুর পীর ও মোর্শেদ ছিলেন হজরত খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানী কুদ্দিসা সিররুহু। তিনি হজরত খাজা সাহেবের মহামর্যাদাধারী খলিফা ছিলেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু রেওগাড়েই হয়েছিলো। রেওগাড় বোখারা থেকে ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আর রেওগাড় থেকে গজদাওয়ানের দূরত্ব এক ক্রোশ।

হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশ্বন্দ কুদ্দিসা সিররুহুর নেসবত ও ইরাদাত (সম্পর্ক ও বাসনা) শিক্ষাদান পদ্ধতি খলিফাগণের পরম্পরায় খাজা

আবদুল খালেক গজদাওয়ানীর মাধ্যমে খাজা আরেফ রেওগাড়ী কুদ্দিসা সিররুহু নিকট পৌঁছেছে।

হজরত খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানীর চারজন খলিফা ছিলেন। তার মধ্যে একজন ছিলেন খাজা আরেফ। তিনি মারেফাতের বাদশাহ্ ছিলেন। দ্বিতীয়জন খাজা আহমদ সিদ্দিক। তৃতীয়জন খাজা আউলিয়া কাবির। চতুর্থজন খাজা সুলায়মান কারসীনী কুদ্দিসা সিররুহু আজমাঈন।

খাজা আহমদ সিদ্দিক বোখারায় অবস্থান করতেন। হজরত খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানী কুদ্দিসা সিররুহু তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং তরিকা প্রচারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। হজরত খাজা কুদ্দিসা সিররুহু যতোদিন জীবিত ছিলেন ততোদিন তাঁর মুরিদ ও খলিফাগণ তাঁরই অনুসরণ করেন। হজরত খাজা আহমদ সিদ্দিকের অবস্থান ছিলো মাগইয়ান নামক এক মরুময় গ্রামে। গ্রামটি ছিলো বোখারা থেকে তিন মাইল দূরে। যখন তাঁর ইন্তেকালের সময় উপস্থিত হয়, তখন তিনি তাঁর সকল মুরিদকে হজরত খাজা আরেফের সান্নিধ্যে থাকার ওসিয়ত করেন। হজরত খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানী থেকে খেলাফত লাভের পর খাজা আরেফ ও খাজা আউলিয়া কাবির উভয়ে বোখারায় তরিকত প্রচারের কাজে নিয়োজিত হন।

প্রসিদ্ধি আছে, হজরত খাজা আউলিয়া কাবির বোখারার বাজারে ব্যবসায়ীদের মসজিদে এক চিল্লাকাশি করেন। সেই চল্লিশ দিনে ও রাতে তাঁর হৃদয়ে কোনো কুমন্ত্রণা উঁকি দেয়নি। হজরত খাজা আহরার কুদ্দিসা সিররুহু খাজা আউলিয়া কাবিরের এই অবস্থাকে অত্যন্ত চমৎকার ও অতীব দুর্লভ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, খাজেগানের তরিকায় সামান্য সময় মেহনত করলে এমন স্তরে উপনীত হওয়া যায় যে, জিকিরের আওয়াজ কানে বাজতে থাকে। হজরত খাজা আহরার কুদ্দিসা সিররুহু আরও বলেন, খাজা আউলিয়া কাবিরের ওই অবস্থা যে তাঁর হৃদয়ে কুমন্ত্রণা আসতো না— এর অর্থ এই নয় যে, তাঁর হৃদয়ে কোনো সময়েই কুমন্ত্রণা আসতো না। বরং এর উদ্দেশ্য হলো— এমন কুমন্ত্রণা আসতো না, যা তাঁর নেসবতে বাতেনীকে বাধাগ্রস্ত করে। যেমন পানিতে কাদা থাকলে পানি প্রবাহ বাধা পায় না। খাজা আহরার কুদ্দিসা সিররুহু নকশ্‌বন্দিয়া তরিকার প্রধান খলিফা খাজা আলাউদ্দিন আজদাওয়ানী থেকে বর্ণনা করেন, খাতরায়ে নেসবত বাতেনের প্রতিবন্ধক নয়। স্বভাবগত কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। আমরা বিশ বছর যাবত কুমন্ত্রণা দূর করার চেষ্টা করছি

তথাপি কুমন্ত্রণা এসে যায়। তবে তা স্থির হয় না। মূলতঃ স্বভাবগত কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন কাজ। ওলীদের একটি দল বলেন, কুমন্ত্রণা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, তবে এতে বেপরোয়া হওয়া ঠিক নয়। এর স্থিরতা অনুচিত। কেনোনা হৃদয়ে তা স্থির হয়ে গেলে ফয়েজপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। কিন্তু আমাদের মোজাদ্দেদ সাহেব র. বলেন, যদি কোনো মুরিদের বয়স হজরত নূহ আ. এর মতো দীর্ঘ হয়, তথাপিও প্রকৃত সালেকের হৃদয়ে কোনো প্রকার খত্‌রা (কুমন্ত্রণা) প্রবেশ করবে না। তবে হৃদয়ে খত্‌রা ব্যতীত অন্য এক ধরনের বিস্মৃতি আসে, আসতে পারে। চেষ্টা করেও গায়রুল্লাহ্‌র স্মরণ করিয়ে দিলেও প্রশান্ত কলব তা স্মরণ করতে পারে না।

বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী হজরত খাজা সুলায়মান কারসীনী ছিলেন খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানীর চতুর্থ খলিফা। কিছুসংখ্যক ঐতিহাসিক বর্ণনা করেন, তিনি খাজা আবদুল খালেকের দরবারে উপনীত হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি সুলুকের রাস্তায় পূর্ণতা লাভ করেন খাজা আউলিয়া কাবিরের সান্নিধ্যে। এই বর্ণনার ভিত্তিতে হজরত খাজা আবদুল খালেকের 'শরহে ওসায়েতে' উল্লেখ রয়েছে, যখন খাজা আউলিয়া কাবির বোখারায় ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর চারজন খলিফা ছিলেন। ১. খাজা দাহকান কিল্লাতি। ২. খাজা আউলিয়া গরীব। ৩. খাজা সওগান। ৪. খাজা সুলায়মান। এই চারজন খাজা আউলিয়ার তরিকার বিশিষ্ট দরবেশ ছিলেন। খাজা আউলিয়া কাবিরের ইন্তেকালের পর খাজা দাহকান কিল্লাতি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। খাজা দাহকানের ইন্তেকালের পর খাজা আউলিয়া গরীব মানুষের সুপথ প্রদর্শনের কাজে নিয়োজিত হন। তারপর খাজা সাওগান তারপর খাজা সুলায়মান। খাজা আউলিয়ার প্রদত্ত খেলাফতের ভিত্তিতে তাঁরা আমন্ত্রণকর্মে নিয়োজিত থাকেন। এরপর খাজেগানদের বাণী ও স্তর অনুযায়ী শায়েখ যায়ীদউদ্দিন গজদাওয়ানীর উপর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়, যিনি ছিলেন 'মাসলাকুল আরেফীন' নামক কিতাবের রচয়িতা। রাশহাত পৃষ্ঠা ৩১।

বাণী ঃ হজরত খাজা সুলায়মান কুদ্দিসা সিররুহুকে একবার লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে—

- اَلْمُخْلِصُوْنَ عَلٰى خَطَرٍ عَظِيْمٍ (মুখলিসগণও বড় বিপদজনক পথে রয়েছেন)। এই বিপদজনক পথের অর্থ কী? তিনি বলেন, 'খতর' দ্বারা যদি ভয়-ভীতি, বিপদ উদ্দেশ্য হতো, তাহলে মাসদারের (মূল শব্দের) সাথে

(فِى) 'ফী' থাকতো। কিন্তু এখানে এসেছে (عَلٰى) 'আলা'। আর এটাই দলিল। 'খাতারিন আযীম' এর উদ্দেশ্য উঁচু স্তর বা মর্যাদা, যা মুখলিস (একনিষ্ঠ) বান্দাদের জন্য বিশিষ্ট। আর এর জন্য ভয়ভীতি আবশ্যক। কেনোনা যে বস্তু সূর্যের যতো বেশী নিকটবর্তী হয়, তার উপর সেই পরিমাণই তাপ পতিত হয়। কবি বলেন—

'নৈকট্যশীলদের অস্থিরতা ও পেরেশানী অধিক'।

হজরত খাজা সুলায়মান কুদ্দিসা সিররুহুর কবর মোবারক কারমিনায়। এটা বোখারার একটি বড় গ্রাম বা উপশহর, যা অনেকগুলো ছোট ছোট গ্রাম নিয়ে গঠিত। সেখান থেকে বোখারার দূরত্ব প্রায় এগারো মাইল।

ইন্তেকাল ঃ হজরত খাজা আরেফ রেওগাড়ী কুদ্দিসা সিররুহুর ইন্তেকাল ৬১৬ বা ৬১৭ হিজরীতে।

হজরত খাজা মাহমুদ আঞ্জীর ফাগনবী কুদ্দিসা সিররুহু

তিনি খাজা আরেফ রেওগাড়ী কুদ্দিসা সিররুহু'র মুরিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাশালী ছিলেন। খাজা আরেফ বিল্লাহ তাঁর জীবন সায়াহ্নে খাজা মাহমুদকে খলিফা নিযুক্ত করেন এবং মানুষকে পথপ্রদর্শনের অনুমতি প্রদান করেন। মুরিদ ও ভক্তগণের মধ্যে তাঁকেই খেলাফত দিয়ে সম্মানিত করেন। তিনি ওয়াবকানের আঞ্জীর ফাগ্‌নী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ওয়াবকান বোখারা অঞ্চলের একটি গ্রামের নাম। কয়েকটি পাড়া নিয়ে ওয়াবকান গ্রাম গঠিত। বোখারা শহর থেকে স্থানটি তিন ক্রোশ প্রায়। তিনি ওয়াবকানে অবস্থান করে লোকদের সৎপথের দিকে আহ্বান করতেন। সম্ভবতঃ তিনি যুগের চাহিদা অনুযায়ী জিকরে জলি শুরু করেন। এই সিলসিলার তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি জিকরে জলির প্রবক্তা। খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানী ও খাজা আরেফ জিকরে জলি করতেন না। তাই একবার খাজা আউলিয়া কাবির খাজা মাহমুদ আঞ্জীরকে প্রশ্ন করেন, আপনি আপনার পীরের তরিকার বিপরীত জিকরে জলি করেন কেনো? উত্তরে তিনি বলেন, হজরত পীর কেবলা তাঁর ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে আমাকে জিকরে জলির এজাজত দিয়েছেন।

জিকরে জলি কার জন্য জায়েয ঃ মাওলানা হাফিজউদ্দিন বোখারী র. স্বীয় যুগের বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তিনি খাজা মোহাম্মদ পারসার দাদা

ছিলেন। রইসুল উলামা শামসুল আয়িম্মা র. এর কথা অনুযায়ী ইমাম ও উলামার একটি জামাত বোখারায় গিয়ে হজরত মাহমুদ আঞ্জীর ফাগনবীকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি জিকরে জলি করেন কেনো? তিনি বলেন, ঘুমন্ত দেরকে জাগ্রত করি, গাফেলদের হুঁশিয়ার করি, যাতে তারা শরিয়ত ও তরিকতের উপর স্থায়ী থাকে। তওবার হকিকতের দিকে মনোনিবেশ করাই, যা প্রত্যেক নেক লোকের জন্য আবশ্যক। মাওলানা সাহেব বলেন, আপনার নিয়ত বিশুদ্ধ, তাই আপনার জন্য এ কাজ ঠিক আছে। কিন্তু জিকরে জলির একটি সীমা নির্ধারণ করা আবশ্যক, যাতে হকিকত মাজায থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং দূরবর্তী বস্তু নিকটবর্তী বস্তু থেকে আলাদা হয়ে যায়। হজরত খাজা মাহমুদ র. বলেন, জিকরে জলি ওই লোকের জন্য বৈধ, যার জিহ্বা মিথ্যা এবং গীবত থেকে মুক্ত, যার হুলকুম হারাম ও সন্দেহযুক্ত খাবার থেকে পবিত্র। যার অন্তর স্বচ্ছ। লৌকিকতা বা অন্যকে শোনানো থেকে পবিত্র এবং যার কলব আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো দিকে মনোনিবেশ করে না।

মর্যাদা ঃ খাজা আলী রামেতিনি র. বলেন, এক দরবেশের সাথে খিজির আ. এর সাক্ষাৎ হলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, এই জামানার মাশায়েখদের মধ্যে এমন কোনো বুজর্গ আছেন কি, যিনি ইস্তেকামাতের স্তরে উপনীত হয়েছেন? আমি তাঁর কাছে বায়াত হতে চাই। হতে চাই তাঁর খাদেম। হজরত খিজির আ. বললেন, এমন যোগ্যতাধারী বুজর্গ হলেন হজরত খাজা মাহমুদ আঞ্জীর ফাগনবী। খাজা আলী রামেতিনির মুরিদগণ বলেন, সেই জিজ্ঞেসকারী দরবেশ খাজা আলী রামেতিনি নিজেই। হজরত খিজির আ. এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে— এ কথা যেনো প্রকাশিত বা প্রচারিত না হয়, তাই তিনি নিজের নাম প্রকাশ করেননি। রাশহাত ৩৪ পৃষ্ঠা।

কারামত ১ ঃ একবার খাজা আলী রামেতিনি হজরত খাজা মাহমুদ আঞ্জীর ফাগনবী র. এর মুরিদানদের নিয়ে জিকিররত ছিলেন। এমন সময় একটি বড় শাদা মোরগ তাঁদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেলো। মোরগটি উড়ে যেতে যেতে বললো, হে আলী রামেতিনি! বীরের মতো বসবাস করো। সাথীবর্গ সেই মোরগটি দেখে এবং তার কথা শুনে বেহুঁশ হয়ে গেলো। যখন তাঁদের হুঁশ ফিরে এলো তখন তারা জিজ্ঞেস করলেন, আমরা যা কিছু দেখলাম ও শুনলাম তার রহস্য কী? হজরত খাজা আলী রামেতিনি বললেন, আল্লাহ্তায়ালা খাজা মাহমুদ আঞ্জীর ফাগনবী র. কে এই মর্যাদা

দান করেছেন। তিনি সর্বদা সেই মাকামে অবস্থান করবেন, যে মাকামে আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত মূসা আ. এর সাথে অনেক কথা বলেছেন। এরপর তিনি খাজা আউলিয়া কাবিরের প্রথম খলিফা খাজা দাহকান কিল্লাতি র. এর শিয়রে তাশরীফ রাখেন। কেনোনা তাঁর ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এসেছিলো। হজরত খাজা দাহকান আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে এইমর্মে দোয়া করেছিলেন— হে আমার প্রভুপালক! আমার অন্তিমকালে আমার বন্ধুদের মধ্য হতে কাউকে প্রেরণ করো, যে আমাকে সাহায্য করবে। এ জন্য খাজা মাহমুদকে আদেশ করা হয়েছিলো দাহকানের নিকট পৌঁছে তাঁকে সাহায্য করতে।

হজরতের মাজার শরীফ ওয়াবকানে অবস্থিত। জনসাধারণ তাঁর মাজার জিয়ারতের জন্য আসেন এবং তাঁর কবর থেকে বরকত হাসিল করেন।

হজরত খাজা আলী রামেতিনি কুদ্দিসা সিররুহু

তরিকতের পথে তিনি হজরত খাজা মাহমুদ আঞ্জীর ফাগনবী র. এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। যখন খাজা মাহমুদের ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি খাজা আলী রামেতিনিকে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং তাঁর সকল মুরিদকে তাঁর দায়িত্বে ন্যস্ত করেন। তিনি রামেতিন নামক স্থানে জন্মলাভ করেন। রামেতিন বোখারা প্রদেশের একটি বড় গ্রামের নাম। যা মূল শহর থেকে মাত্র দু'ক্রোশ দূরে অবস্থিত। রাশহাত ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা।

তিনি হজরত খিজির আ. এর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁরই নির্দেশে তিনি হজরত খাজা মাহমুদের নিকট বায়াত গ্রহণ করেন। পূর্বেই এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। তিনি উচ্চ মাকাম, কামালত, কারামত ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। যুগের বিবর্তনের কারণে রামেতিন এলাকা থেকে বাওয়ার্দ শহরে হিজরত করেন এবং বেশ সময় সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সবাইকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করেন এবং হেদায়াতের কাজে পূর্ণরূপে আত্মনিবেশ করেন। শেষে বাওয়ার্দ শহর থেকে খাওয়ারিজমে চলে যান এবং সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে সাধনা ও মুজাহাদায় লিপ্ত থাকেন। খাওয়ারিজম শহরে তাঁর কাজের বিস্তৃতি ঘটে। তিনি অনেক উত্তম চরিত্র ও গুণাবলীর ধারক-বাহক ছিলেন। অনেক লোক তাঁর মুরিদ ছিলো। খাওয়ারিজমবাসী তাঁকে খাজা আলী বাওয়ার্দী এবং বোখারাবাসী আলী

রামেতিনি বলে ডাকতো। আর সুফিগণ তাঁকে বলতেন 'আজিজান'। তিনি কথার ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই 'আজিজান' শব্দ ব্যবহার করতেন। তাই তাঁকে 'আজিজান' বলা হতো। রাশহাত ৩৫ পৃষ্ঠা।

তিনটি প্রশ্ন ঃ শায়েখ আলাউদ্দিন সুমনানী কুদ্দিসা সিররুহু হজরত খাজা আজিজানের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি এক দরবেশকে তিনটি প্রশ্ন করতে হজরতের দরবারে প্রেরণ করেন—

প্রথম প্রশ্ন ঃ আপনি এবং আমি আগমনকারী এবং গমনকারী লোকদের খেদমত করে থাকি। আপনি দস্তরখানার ব্যবস্থা করেন না, কিন্তু আমরা করে থাকি। তথাপি লোকজন আপনার প্রতি সন্তুষ্ট, আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট— এর কারণ কী? হজরত খাজা আজিজান এর উত্তরে বলেন, উপকার করে এমন খেদমতকারীদের সংখ্যা অনেক। কিন্তু তাদের উপকারের বিষয়ে নিজের উপর অগ্রাধিকার প্রদানকারী খাদেমদের সংখ্যা খুবই কম। আপনি চেষ্টা করবেন, যাতে দ্বিতীয় প্রকারের হন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ আমরা শুনেছি আপনার তরবিয়তকারী হজরত খাজা খিজির আ.— এর বাস্তবতা কী? তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহ্‌র বান্দা সেই সত্তার প্রতি আসক্ত, হজরত খিজির যার প্রতি আসক্ত।

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ আমরা শুনেছি আপনি জিকরে জলি অর্থাৎ উচ্চারণময় জিকির করে থাকেন— এর কারণ কী? উত্তরে তিনি বলেন, আমরা শুনেছি আপনি জিকিরে খফি করে থাকেন। এখন দেখি শ্রুত হওয়ার কারণে আপনার জিকিরও জলি তথা প্রকাশ্যেই হয়ে গেলো। নুফহাত ৩৪১ পৃষ্ঠা।

ইমান কী ঃ একবার হজরত আজিজানকে জিজ্ঞেস করা হলো, ইমান কী? তিনি বললেন, আমিত্ব থেকে বের হওয়া এবং আল্লাহ্‌তায়ালার সাথে মিলিত হওয়া। নুফহাত ৩৪১ পৃষ্ঠা।

বাণী ঃ তিনি বলেন, হজরত মনসুর হাল্লাজের শূলিতে চড়ানোর সময় যদি খাজা আবদুল খালেকের কোনো মুরিদ উপস্থিত থাকতো, তাহলে তাকে শূলিতে চড়তে হতো না। রাশহাত ৩৭ পৃষ্ঠা।

বাণী ঃ তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে থাকো। যদি তা না পারো তবে যারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে থাকেন, তাঁদের সান্নিধ্যে থাকো। তাঁদের সান্নিধ্যে থাকলেই আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে থাকা হবে।

বাণী ঃ তিনি বলেন, ওই জবান (জিহ্বা) দিয়ে দোয়া করো যার দ্বারা গুনাহ্ প্রকাশ পায়নি। অর্থাৎ আল্লাহ্র ওলীদের সামনে বিনয়াবনত হও, তা হলে তারা তোমাদের জন্য দোয়া করবেন। রাশহাত ।

বাণী ঃ তিনি বলেন, আমল করে মনে রাখার মতো কিছুই করতে পারোনি বা যা করেছো তা ত্রুটিযুক্ত। আমল পীর সাহেব থেকে অর্জন করবে।

বাণী ঃ তিনি বলেন, নেককারগণের সাথে বসলে নেককার হতে পারবে। আর অসৎ লোকদের সাথে বসলে নষ্ট হয়ে যাবে।

বাণী ঃ তিনি বলেন, তুমি যদি এমন মানুষের কাছে বসো, যে তোমাকে আল্লাহ্র স্মরণ ভুলিয়ে দেয়, তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে লোকটি মানবরূপী শয়তান। আর মানবরূপী শয়তান দানবরূপী শয়তান থেকে নিকৃষ্ট। কেনোনা দানবরূপী শয়তান গোপনে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে, আর এরা প্রভাব বিস্তার করে প্রকাশ্যে। আর যার কাছে তুমি বসলে তার সান্নিধ্য লাভের দ্বারা যদি তোমার হৃদয়ের প্রশান্তি ও স্থিরতা লাভ না হয়, পানি ও কাদার ঘোলাটে রঙ দূর না হয়, তবে এমন ব্যক্তির সান্নিধ্য থেকে দূরে থেকো। অন্যথা আলী আজিজানের আত্মা এই ধরনের ভুল ক্ষমা করবে না।

নেককার বন্ধু ঃ তিনি বলেন, সৎ বন্ধুর সান্নিধ্য নেককাজ থেকে উত্তম। কেনোনা নেককাজ অহংকার ও ধোকা থেকে মুক্ত নয়। আর সৎ বন্ধু তোমাকে নেককার বানাবে ও সওয়াবের পথ দেখাবে।

আত্মঅহমিকা ঃ তিনি বলেন, অহংকারীর কাছে বোসো না। যে ব্যক্তি অহংকার থেকে মুক্ত তাঁর সান্নিধ্যে বসো।

দূরের ব্যক্তিও কাছে ঃ তিনি বলেন, অনেক দূরের লোক আমাদের কাছে। আর অনেক কাছের লোক আমাদের থেকে দূরে। দূরে থেকেও কাছে ওই সকল লোক, যাদের বাহ্যিক শরীর দূরে কিন্তু তাদের মন-প্রাণ আমাদের সাথেই। আবার অনেক কাছের লোক দূরে অর্থ তারা বাহ্যিকভাবে আমাদের কাছে হলেও তাদের মন-প্রাণ আমাদের সাথে নেই। তাদের মন-প্রাণ দুনিয়ার ভালোবাসা, লোভ ও কুমন্ত্রণার জালে আবদ্ধ। আমাদের নিকট যারা কাছে থেকেও দূরে থাকে, তাদের চেয়ে দূরের লোক উত্তম। মূলতঃ বিবেচ্য বিষয় হলো মন ও প্রাণ। দেহ বা শরীরের (পানি ও কাদার) কাছে দূরে থাকা কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়।

কবি বলেন, যদি তুমি ইয়ামন দেশে অবস্থান করো, আর আমাদের কথা তোমার স্মরণে আছে, তবে তুমি আমাদের সাথেই রয়েছো। আর যদি তুমি আমাদের সামনে উপস্থিত, কিন্তু আমাদের কথা তোমার মনে নেই, তাহলে তুমি ইয়ামন দেশে রয়েছে।

বাণী ঃ এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, শরীয়তে বালেগ কে আর তরিকতে বালেগ কে? তিনি বলেন, শরীয়তের বালেগ সেই ব্যক্তি যার বীর্যপাত ঘটে, আর তরিকতের বালেগ সে-ই, যে অহংবোধ থেকে মুক্ত হয়। দরবেশ তাঁর কথা শুনে মাথা জমিনে স্থাপন করলো। তিনি বললেন, জমিনে মাথা রাখার প্রয়োজন নেই। বরং যে বস্তু মাথায় রয়েছে অর্থাৎ আত্মঅহংবোধ তা জমিনে ফেলে দিতে হবে।

ফকির মুখাপেক্ষী নয় ঃ তাঁর স্থলাভিষিক্ত সন্তান খাজা ইব্রাহিম তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, এ বাক্যটির অর্থ কী যে, ফকির আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী নয়। তিনি বললেন, ফকির নিজের প্রয়োজনে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হাত তোলেন না। কেনোনা আল্লাহ্‌তায়ালা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। আর তিনি তাঁর সবকিছু জানেন ও দেখেন। সুতরাং তাঁর নিকট হাত তোলার আর কী প্রয়োজন?

ফকির এবং ধনী ঃ তিনি বলেন, ধনীর অর্থ হলো অমুখাপেক্ষিতা। এ গুণটি বাহ্যিকভাবে সম্পদশালীর সাথে সাদৃশ্য রাখে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অমুখাপেক্ষিতা ফকিরীর বৈশিষ্ট্য। যেমন, কেনো ব্যক্তি ফকিরকে কোনো কিছু দিলো, কিন্তু ফকির তা গ্রহণ করলো না। কেনোনা গ্রহণ করা তার জন্য ওয়াজিব নয়। আর ধনীর না দেওয়াটা বৈধ নয়। কেনোনা দেওয়াটাই তার উপর ওয়াজিব। যেমন এরশাদ হচ্ছে— وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ (জাকাত প্রদান করো)। আল্লাহ্‌পাক আরও বলেন, وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (আমি তাহাদেরকে যে রিজিক প্রদান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে। সূরা বাক্বারা আয়াত ৩)।

বাণী ঃ তিনি বলেন, যদি ফকির হাতে কিছু না রাখে এবং অন্তরেও কোনো কিছুর (চাহিদা) আকাঙ্ক্ষা না রাখে, তাহলে সে উত্তম স্বভাবের ফকির। এ সম্পর্কে রসূল স. বলেন, ফকিরি আমার গর্ব। আর যদি ফকির হাতে কিছু না রাখে অথচ অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তাহলে সে দ্বারে

দ্বারে ঘোরা ভিখারীর মতো। সে রসূলের অনুসরণকারী নয়। যদি সে আল্লাহ্র রসূলের অনুসরণকারী হতো, তাহলে সে অন্তরে কোনো কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখতো না এবং মুখেও স্বীয় দরিদ্রতা প্রকাশ করতো না। আর যে ফকির হাতে কিছু থাকতেই অন্যের দ্বারস্থ হয় অর্থাৎ ভিক্ষা করে, তবে সে মন্দ স্বভাবের ফকির। এ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, দারিদ্র মুখের কালিমা। হাদিস শরীফে এসেছে— দারিদ্র কুফুরী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

বাণী ঃ একবার তাঁর সৌভাগ্যবান সন্তান জিজ্ঞেস করলেন, হাদিস শরীফে এসেছে— অভাব অনটন উভয় জগতে চেহারাকে কালো করে দেয় এবং অভাব কুফরের নিকটে নিয়ে যায়। আবার অন্য হাদিসে এসেছে, অভাব আমার অহংকার। এই হাদিসদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন করা যেতে পারে কীভাবে? তিনি বললেন, হাদিসদ্বয় ওই ফকির সম্পর্কে, যে সৃষ্টজীবের প্রতি মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ যে দরবেশ মানুষের নিকট তার অভাব প্রকাশ করে। তাদের কাছে কিছু চায়। অভাব-অনটনকে সে উপার্জনের মাধ্যম বানায়। মূলতঃ এটা আল্লাহ্র প্রতি অভিযোগ করা হয়। দুনিয়াতে এটা লাঞ্ছনার কাজ। আল্লাহ্র প্রতি অভিযোগ করা কুফরী, আর এ কাজ পরকালে চেহারা মলিন হওয়ার উপযুক্ত।

বাণী ঃ তিনি বলেন, ফকিরের হাত ধনীর হাত থেকে উঁচু হওয়া উচিত। কেনোনা ফকিরের হাত আল্লাহ্র হাতের নায়েব। রসূল স. বলেন, 'দান সদকা ফকিরের হাতে পতিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ্র হাতে পতিত হয়।'

আর আল্লাহ্তায়ালা বলেন, يَدُ اللهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ (আল্লাহ্র হাত তাহাদের হাতের উপর। সূরা ফাতাহ্ আয়াত ১০)।

বাণী ঃ তিনি বলেন, যদি আল্লাহ্তায়ালা সম্বোধন করে বলেন, হে বান্দা! আমার নিকট কিছু চাও। বন্দেগীর শর্ত হলো, বান্দা আল্লাহ্ ব্যতীত কিছুই চাইবে না। কেনোনা যে আল্লাহ্কে পেয়েছে, সে সব কিছুই পেয়েছে। আর যে আল্লাহ্কে পেলো না, সে কিছুই পেলো না।

জনৈক কবি বলেন—

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রেমে নিমজ্জিত
সে আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে চায় না।

বাণী ঃ তাঁর সন্তান খাজা ইব্রাহীম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, মনসুর হাল্লাজ বলেছিলেন, 'আনাল হক' (আমি আল্লাহ্)। আর বায়েজিদ বলেছিলেন, আমার জুব্বার ভিতর আল্লাহ্ ছাড়া কেউ নেই। উভয়ের কথাই শরীয়তবিরোধী ছিলো। মনসুরকে টুকরা টুকরা করা হলো, আর বায়েজিদকে কিছুই বলা হলো না— এর কারণ কী? তিনি বললেন, মনসুর প্রথমে নিজের সত্তাকে তুলে ধরেছিলো এভাবে 'আনা' (আমি) বলার মাধ্যমে। এজন্য তার উপর এর প্রতিক্রিয়া পতিত হয়েছিলো। আর বায়েজীদ প্রথমে নেতিবাচক শব্দ 'লাইসা' ব্যবহার করেছিলেন। তাই তিনি পেয়েছিলেন নিরাপত্তা।

বাণী ঃ তিনি বলেন, আলেম চল্লিশ বছর পর্যন্ত এলেম অন্বেষণে ব্যয় করেন, মাদ্রাসায় কষ্ট সহ্য করেন, উস্তাদের খেদমত করেন— এরপর তাঁর সামান্য মর্যাদা লাভ হয়। আর আরেফ চল্লিশ বছর পর্যন্ত অভাব-অনটনে ব্যয় করেন, নিজেকে সাধনা ও ত্যাগের মধ্যে নিয়োজিত রাখেন, বিপদ ও দুঃখ-কষ্টে সন্তুষ্ট থাকেন— যাতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন। এলেম আলেমদেরকে সম্মানের স্তরে উপনীত করে। আর ফকিরকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। প্রতিটি বৃক্ষ থেকে ওই ফল বের হয়, যা তার ভিতরে লুক্কায়িত থাকে। জনৈক কবি বলেন—

কলসেতে আছে যাহা
ঢালিলে পড়িবে তাহা।

বাণীঃ যদি তুমি সামনের কাতারে বসে পিছনের কাতারের লোকদেরকে তুচ্ছ মনে করো, তাহলে তোমার জন্য উত্তম হবে পিছনের কাতারে বসা। আর সামনের কাতারের লোকদেরকে সম্মান করা। অর্থাৎ তুমি যদি গদিতে বসতে চাও, সদর (প্রধান) হতে চাও, তবে তোমার মধ্যে খাদেমের গুণাবলী থাকতে হবে। আর নিজেকে সকলের চেয়ে নিম্নস্তরের মনে করবে।

বাণী ঃ তিনি বলেন, বান্দা আল্লাহ্ হতে পারে না, তবে আল্লাহ্র গুণাবলীতে গুণান্বিত হতে পারে। যেমন হাদিস শরীফে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হও'।

শূন্যতা ঃ একদিন তিনি বললেন, যার হৃদয় অন্যের মহব্বত থেকে শূন্য না হবে, সে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে না। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, শূন্যতা কীভাবে অর্জিত হবে? তিনি বললেন, নিজের উপরে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে। অতঃপর বলা হলো, প্রাধান্য দেওয়ার ফল কী হয়ে থাকে? তিনি বললেন, সওয়াব। তারা জিজ্ঞেস করলো, নেকী

বা পুণ্য কী? উত্তরে তিনি বললেন, নেকী বা পুণ্য কী তা এই আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা উল্লেখ করেছেন—

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ -

(তোমরা যাহা ভালোবাস তাহা ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্যবান হইতে পারিবে না। সূরা আলে ইমরান আয়াত ৯২)। যা তুমি পছন্দ করো, যা সবচেয়ে বেশী ভালোবাসো তা ব্যয় না করা পর্যন্ত তুমি রসূল স. এর শাফায়াত এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে না। এটাই শেষ কথা।

তাজরীদের প্রকার ঃ উল্লেখ্য যে, হজরত খাজার বাণীতে তাজরীদ (আকাঙ্ক্ষা) এর প্রকার বর্ণিত হয়েছে। তাজরীদ দুই প্রকার— ১. প্রকাশ্য ২. গোপন। বাহ্যিক তাজরীদ আবার দুই প্রকার—

১. বাহ্যিকভাবেই কারো কাছে সম্পদ, উপকরণ, রাজত্ব, পদ, বাড়ি, বাগান, দাস-দাসী বা এ জাতীয় কোনো বস্তু বিদ্যমান নেই এবং দুনিয়ার সম্পর্ক থেকেও সে মুক্ত। এমনকি মনে মনেও সে এই সকল বস্তুর কামনা করে না।

২. উল্লেখিত বস্তুসমূহ তার কাছে বিদ্যমান নেই একথা ঠিক, তবে তার মনে ওই সকল বস্তুর প্রতি প্রবল আগ্রহ রয়েছে। এই ধরনের তাজরীদ (আকাঙ্ক্ষা) কারো কল্যাণ করতে পারে না। এই প্রকারের তাজরীদকারী ব্যক্তি শুধুই অভাবে কাটায়। এই প্রকারের তাজরীদ ক্ষতিকর। প্রথম প্রকার তাজরীদ উপকারী। তার অপরাধ মার্জনা করা হবে। তার নিকট ভেদ-রহস্যসমূহ উন্মোচন করা হবে।

গোপন তাজরীদ হলো মানুষের বাতেনী সম্পর্ক দুনিয়া থেকে অর্থাৎ দুনিয়ার লোভ-লালসা থেকে শূন্য হবে। অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, ধোঁকা, মিথ্যা, গীবত, আত্মঅহমিকা, কৃপণতা, অন্যকে কষ্ট প্রদান, জুলুম, নির্যাতন ইত্যাদি অসৎ গুণাবলী থেকে মুক্ত হওয়া বরং তার বাতেন তাসবীহ, পবিত্রতা, দয়া-মায়া, এলেম, তাওয়াক্কুল, তাওহীদ, মোরাকাবা, মোজাহাদা, মোশাহাদা, জিকির, ফিকির, আনুগত্য, ইবাদত, সততা, একনিষ্ঠতা, মহব্বত ও আগ্রহ ইত্যাদি উত্তম গুণাবলীতে ভরপুর হবে। এমন তাজরীদ তাকে অভিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত করায়। এর বিনিময় বিরাট। যদি কারো কাছে পদমর্যাদা, ধনসম্পদ, রাজত্ব, আসবাবপত্র সবকিছুই বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তার মন এই সকলের প্রতি ধাবিত না হয়, এই সবের মহব্বত তার অন্তরে

স্থান না পায়, বরং এসকল কিছু আল্লাহ্প্রাপ্তির মাধ্যম ও ফানা ফিল্লাহ্, বাকাবিল্লাহ্ হাসিল হওয়ার কারণ হয়, তবে এটাই গোপন তাজরীদের মধ্যে গণ্য হবে। তাই দেখা যায়, এমন অনেক নবী ও ওলী অতিবাহিত হয়েছেন, যাঁদের অঢেল ধনসম্পদ ও পদমর্যাদাই তাঁদের আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের কারণ হয়েছে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম হয়েছে।

বর্ণিত আছে— হজরত ইব্রাহিম আ. এর স্বর্ণের পৈতাপরিহিত সত্তরটি কুকুর ছিলো। কুকুরগুলো রাখালের সাথে বকরি চরাতো। এ দ্বারা তাঁর ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্রের ধারণা করা যায়। তিনি ওই সকল সম্পদ আল্লাহ্র পরিতুষ্টির পথে ব্যয় করেন।

এভাবে হজরত সুলায়মান আ. এর কাছে অনেক ধন-সম্পদ, আসবাবপত্র, সৈন্যসামন্ত, রাজত্ব ও মর্যাদা ছিলো। এসকল কিছু তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। কেনোনা এ সবের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র মহব্বত ও আকর্ষণ ছিলো না। আল্লাহ্প্রদত্ত বস্তু প্রত্যাখ্যান করা অনুচিত। এজন্য তিনি তাঁর সকল ধন-সম্পদ ও উপকরণকে আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে কোনো ভাতা গ্রহণ করতেন না। নিজে জাম্বিল (থলে) বানিয়ে খাদেম দ্বারা বাজারে বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আর এটাই দলিল যে, তাঁর অন্তরে ধন-সম্পদ ও পদমার্যাদার কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিলো না। বাদশাহ্ জুলকারনাইনের রাজত্বও বিশাল ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ ছিলো। এগুলো তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। কেনোনা তিনি এগুলোর ভালোবাসাকে অন্তরে স্থান দেননি। তিনি এ সবের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্তায়ালাকেই মনে করতেন। এজন্য তিনি আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য লাভ করেছিলেন।

শায়েখ আবু সাঈদ আবুল খায়ের কুদ্দিসা সিররুহু প্রচুর ধন-সম্পদ ও অসংখ্য দাস-দাসীর মালিক ছিলেন। তিনি খুব সৌখিনও ছিলেন। কথিত আছে, তিনি তাঁর ঘোড়ার জুতা স্বর্ণ দিয়ে প্রস্তুত করিয়েছিলেন। লোকজন তাঁকে বললো, এটা তো অপচয়। উত্তরে তিনি বললেন, স্বর্ণ দুনিয়ার একটি বস্তু। আর দুনিয়াকে পায়ের নিচে রাখাই শ্রেয়।

এই সকল কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, আম্বিয়া ও আউলিয়ায়ে কেরাম প্রকাশ্য ধন-সম্পদের মালিক হলেও তাঁদের গোপন তাজরীদ (অনাকাঙ্ক্ষা) অর্জিত ছিলো। এজন্য তাঁরা অভিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হয়েছিলেন।

হজরত আজিজান কুদ্দিসা সিররুহু বলেন, যার গোপন তাজরীদ অর্জিত হয়নি, সে কোনোভাবেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে না।

সুস্থতা ঃ হজরত আজিজান কুদ্দিসা সিররুহু এর নিকট এক ব্যক্তি হাদিসটির অর্থ জানতে চাইলো— 'সফর করো, সুস্থ থাকবে, আর এটাকে গনিমত মনে করবে'। তিনি বললেন, নিজের অস্তিত্ব থেকে আল্লাহ্‌র সত্তার দিকে সফর করো তা হলে বিপদ থেকে মুক্ত থাকবে। আর এটাকে গনিমত মনে করবে। যখন তুমি আত্মার উন্মুক্ত প্রান্তরে ভ্রমণ করবে, তখন সুস্থতা অর্জন করতে পারবে। এরপর সন্দেহের রোগ থেকে, লৌকিকতা, প্রতারণা, লোভ, কামনা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, হিংসা, কপটতা, কৃপণতা, আত্মঅহংকার, প্রদর্শনপ্রবণতা, লোকদের কষ্ট প্রদান এবং অন্যান্য মন্দ চরিত্রের প্রবণতা থেকে সফরের মাধ্যমে পরিত্রাণ পাবে।

সুতরাং সুস্থতাকে মূল্যায়ন করো। কয়েক দিনের এই জীবনকে আনুগত্য ও ইবাদতে ব্যয় করো।

সফলতা ও বিফলতাঃ এক লোক হজরত আজিজান কুদ্দিসা সিররুহুকে জিজ্ঞেস করলো, লোকেরা বলে, পুরুষ তিন প্রকার। পূর্ণ পুরুষ, অর্ধপুরুষ ও কাপুরুষ— এ কথার অর্থ কী? তিনি বললেন, পূর্ণ পুরুষের গুণাবলী মহান আল্লাহ্‌তায়ালা এই আয়াতে উল্লেখ করেছেন

رِجَالٌ لَّا تُلۡهِيۡهِمۡ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيۡعٌ عَنۡ ذِكۡرِ اللّٰهِ -

(সেই সব লোক যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ হইতে বিরত রাখে না। সূরা নূর আয়াত ৩৭)।

রসূল স. এর অবস্থা এমন ছিলো যে, তিনি বলেন, আমার চক্ষুদ্বয় ঘুমায়, কিন্তু আমার হৃদয় ঘুমায় না। বোখারী, মুসলিম।

অর্ধপুরুষের বর্ণনা ঃ যে ব্যস্ততার মধ্যেও কলবের জিকিরে মজা পায়। কিন্তু সে এতোটুকুর উপরেই সন্তুষ্ট। অর্থাৎ তার অবস্থা এমন যে, যবানে জিকির জারী থাকলে তার অন্তর ওই জিকিরের স্বাদ অনুভব করে। আর যখন সে জবানের জিকির ত্যাগ করে, তখন তার কলব আল্লাহ্‌র জিকির থেকে বিরত থাকে।

কাপুরুষের বর্ণনা ঃ আর কাপুরুষ হলো মুনাফিক। সে জিকির করে ঠিক, কিন্তু আল্লাহ্‌র জন্য জিকির করে না।

বাণী ঃ হজরত আজিজান কুদ্দিসা সিররুহুকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, মহানবী স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন সকালে খালেস (একনিষ্ঠ) ভাবে আল্লাহ্‌র জন্য পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বিধান মতে ও খেয়ালের সাথে আল্লাহ্‌র জিকির করবে, হেকমত বা প্রজ্ঞার ঝর্ণা তার হৃদয় থেকে জবানে জারী হয়ে যাবে। হিসনে হাসীন পৃষ্ঠা ১৩।

অনেকে এই হাদিসের উপর আমল করেছে, কিন্তু কাজ হয়নি— এর কারণ কী? হজরত আজিজান কুদ্দিসা সিররুহু বললেন, ওই সকল লোক সত্যবাদী নয়। তাদের বাসনা ছিলো চল্লিশ দিনের ইবাদতের মাধ্যমে যেনো হেকমতের ঝর্ণা তাদের হৃদয় থেকে জবানে জারী হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি তাদের উদ্দেশ্য ছিলো না। তাই তারা সফল হয়নি।

বাণী ঃ একদিন হজরত আজিজান কুদ্দিসা সিররুহুকে জিজ্ঞেস করা হলো, মহান আল্লাহ্‌তায়ালা আযল দিবসে সকল মানুষের রূহকে সম্বোধন করে বলেছিলেন— اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا- (আমি কি তোমাদের প্রভুপালক নই? সকল রূহ বলেছিলো, হ্যাঁ। অবশ্যই তুমি আমাদের প্রভুপালক। সূরা আরাফ আয়াত ১৭২)। কিয়ামত দিবসে যখন সকল বস্তু ধ্বংস হয়ে যাবে, আত্মা ছাড়া অন্য কোনো বস্তু বিদ্যমান থাকবে না, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা সকল রূহকে সম্বোধন করে বলবেন 'আজ রাজত্ব কার' সেই সময় কারো উত্তর দেওয়ার সাহস হবে না। তখন আল্লাহ্‌তায়ালা নিজেই উত্তর দিবেন لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (এক পরাক্রমশীল আল্লাহ্‌র। সূরা ইব্রাহিম আয়াত ৪৮)।

এখন প্রশ্ন ঃ এমন হবে কেনো? সে দিন তারা চুপ থাকবে কেনো? হজরত আজিজান উত্তরে বলেন, আযল দিবস ছিলো শরীয়তের বিধি-বিধান স্বীকার করার দিন। এ জন্য রূহসকল হ্যাঁ বলেছিলো। আর আখেরাতে শরীয়তের বিধান উঠিয়ে নেওয়া হবে। সেদিন প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পাবে। কে কতোটুকু শরীয়ত পালন করতে পেরেছে, তা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করবে। নিজেদের আমলের কারণে সকলে হবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত। হবে ভয়ে প্রকম্পিত ও নির্বাক। অবশেষে আল্লাহ্‌ নিজেই বলবেন 'এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র'।

তাওয়াজ্জোহ্ ও তুহফা ঃ একবার জনৈক ব্যক্তি হজরত আজিজান কুদ্দিসা সিররুহুর কাছে আবেদন করলো, দয়া করে আমার হালের অবস্থার প্রতি তাওয়াজ্জোহ্ প্রদান করুন। তিনি বললেন, বাজারে যাও এবং একটি লোটা ক্রয় করে হাদিয়াস্বরূপ আমার সামনে পেশ করো। যখন আমার দৃষ্টি ওই লোটার উপর পতিত হবে, তখনই আমার তাওয়াজ্জোহ্ (মনোনিবেশ বা আত্মিকদৃষ্টি) তোমার উপর পতিত হবে।

সিলকা এবং মগজ ঃ একদিন হজরত আজিজান কুদ্দিসা সিররুহুর দরবারে জ্ঞানীদের একটি দল উপস্থিত হলো। তাঁরা কথোপকথন শুরু করলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে একজন বললেন, উলামারা হলেন খোসা আর ফকিরেরা হলেন মগজ। হজরত আজিজান কুদ্দিসা সিররুহ বললেন, মগজ খোসার হেফাজতের কারণে নিরাপদে থাকে।

হকের সাথে মিলন ঃ একদা হজরত আজিজান কুদ্দিসা সিররুহু মোরাকাবায় মগ্ন ছিলেন। এমন সময় একজন লোক এসে বললো, তাসাউফ কী? তিনি বললেন, অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ এবং হক সুবহানাহু তায়ালার সাথে সম্পর্ক স্থাপন।

১. অন্যদের থেকে নিজেকে না ফেরাতে পারলে, বন্ধুর সাথে মিলতে পারবে না।

২. সৃষ্টজীবের সাথে সম্পর্ক দূর করো, তাহলে বন্ধুর সাথে মিলনের যোগ্যতা লাভ করবে।

৩. যখন তুমি দুনিয়ার লোভ থেকে পবিত্র হবে, তখন পরকালের পথের মনজিলগুলো দেখতে পাবে।

৪. কোনো মঞ্জিল দেখতে পেলে তা অর্জনের চেষ্টা করবে।

৫. যখন তুমি তোমার কাজের অবস্থা জানতে পারবে, তখন তুমি নিজেকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে।

বাজারী ঃ এক ব্যক্তি একবার অবজ্ঞার সাথে বললো, আজিজান একজন বাজারী অর্থাৎ তিনি সূতা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বাজারে ঘুরাফেরা করেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র নিকট কান্নাকাটি ও মুখাপেক্ষিতা খুবই পছন্দনীয়। সুতরাং আজিজান কেনো বাজারী হবে না? অর্থাৎ আল্লাহ্র দরবারে কান্নাকাটি ও অশ্রু বিসর্জন করো। তাঁর দরবারে অভাব অনটন ও দরিদ্রতার মূল্য অনেক। যেমন কবির ভাষায়—

ইশকের মাকামে ক্ষমতা ও রাজত্ব মূল্যহীন
তাতে ব্যথা, অসহায়ত্ব ও বিত্তহীনতা ছাড়া আর কী রয়েছে।

যে ব্যক্তি যতো হীনতা, মুখাপেক্ষিতা ও বিনয় পেশ করবে, তার মর্যাদা ততো উঁচু হবে।

কারামত ১ ঃ হজরত আজিজান কুদ্দিসা সিররুহু খাওয়ারিজম শহরে সন্ধ্যায় সূতার বাজারে যেতেন। যাদের সূতা বিক্রি হতো না, তাদের সকলের সূতা ক্রয় করে ঘরে চলে আসতেন। তিনি নিজ ঘরে এসে এক কোণায় মোরাকাবায় লিপ্ত হতেন। তাঁর হাত লাগানো ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৪০ গজ সূতি কাপড় তৈরী হয়ে যেতো। যেমন হজরত হোসেন ইবনে মনসূর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি এক ধুনরীকে কোনো কাজে পাঠালেন। নিজে তার ঘরে বসে স্বীয় হাত দ্বারা ইশারা করলেন। আপনাআপনি তূলা থেকে সব বিচি পৃথক হয়ে গেলো। তাঁর এই কারামতের কারণে তাঁর নাম হাল্লাজ হয় অর্থাৎ তূলাধুনরী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

অনুরূপভাবে হজরত আজিজান র. এর উপাধি নাস্‌সাজ (কাপড় বা সূতা) প্রস্তুতকারী নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

মাওলানা রূমি র. বলেন—

অভ্যন্তরীণ বিষয় যদি কথা থেকে উত্তম না হতো, তাহলে বোখারার সরদাররা হজরত খাজা নাস্‌সাজ র. এর গোলামী কীভাবে অবলম্বন করলেন।

সম্ভবতঃ এই সূতাগুলো কোনো অদৃশ্য ব্যক্তি বা জিন, যারা তাঁর মুরিদ ছিলো অথবা ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র নির্দেশে বয়ন করে দিতেন বা এসব উপকরণ ছাড়াই কাপড় তৈরী হয়ে যেতো যার প্রকৃত রহস্য আমাদের জানা নেই। হজরত আজিজান র. সূতার কাপড় বাজারে নিয়ে বিক্রি করতেন। এ থেকে যা লাভ হতো তা তিন ভাগে ভাগ করতেন— একভাগ উলামাদের জন্য, একভাগ ফকিরদের জন্য, আর একভাগ নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করতেন।

কারামত ২ ঃ হজরত সায়্যেদুনা, হজরত আজিজান কুদ্দিসা সিররুহুর সমসাময়িক ছিলেন। কখনো কখনো উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটতো। হজরত আজিজান কুদ্দিসা সিররুহু সম্পর্কে তাঁর ভালো ধারণা ছিলো না। একবার হজরত আজিজান কুদ্দিসা সিররুহুর শানে তাঁর বে-আদবীমূলক আচরণ

প্রকাশ পেলো। হঠাৎ তুর্কিদের পক্ষ থেকে খোলা প্রান্তরের দিক হতে আক্রমণ হলো। তাঁরা সায়্যেদুনার ছেলেকে বন্দী করে নিয়ে গেলো। সায়্যেদুনা বুঝতে পারলেন, এটা তাঁর বে-আদবীর ফল। তিনি ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য হজরত আজিজানের খেদমতে উপস্থিত হলেন। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তাঁকে দাওয়াত করলেন এবং কবুল হওয়ার আশা করলেন। হজরত আজিজান র. তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে দাওয়াত কবুল করলেন এবং তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। ওই মজলিশে সে যুগের বড় বড় মাশায়েখগণ উপস্থিত ছিলেন। হজরত আজিজান র. এক বিশেষ অবস্থায় ছিলেন। খাদেম যখন লবণদানী আনলেন এবং দস্তরখানা বিছালেন, তখন শায়েখ আজিজান র. বললেন, আজিজান ততোক্ষণ পর্যন্ত নেমকদানীতে হাত রাখবে না এবং খাদ্য গ্রহণ করবে না, যতোক্ষণ না সায়্যেদুনার ছেলে দস্তরখানায় উপস্থিত হবে। সামান্য সময় তিনি নীরবতা অবলম্বন করলেন। উপস্থিত জনতা হজরত আজিজানের কথার ক্রিয়া প্রকাশের অপেক্ষায় ছিলেন। এমন সময় সায়্যেদুনার ছেলে ঘরে পৌঁছলেন। মজলিশে শোরগোল শুরু হলো। লোকজন বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলো। তুর্কিদের কাছ থেকে তার মুক্তির ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলো। সে বললো, আমি এর চেয়ে বেশী কিছু জানি না যে, আমি তুর্কিদের হাতে বন্দী ছিলাম। তারা আমাকে বেঁধে তাদের দেশে নিয়ে যাচ্ছিলো। এখন আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত। মজলিশের সবাই বুঝতে পারলো, এটা হজরত আজিজান কুদ্দিসা সিররুহুর কারামত। রাশহাত পৃষ্ঠা ৩৮।

কারামত ৩ ঃ একদা জনৈক মেহমান হজরত আজিজানের বাড়িতে আসেন। তখন তাঁর ঘরে মেহমানকে দেওয়ার মতো কোনে আহার্য ছিলো না। মেহমান অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বাইরে বের হলেন। হঠাৎ একটি ছেলেকে খাদ্য বিক্রি করতে দেখতে পেলেন। সে ছিলো হজরতের ভক্তদের একজন। একটি দস্তরখানায় খাবার ভর্তি করে হজরতের খেদমতে পেশ করলো। উপযুক্ত সময়ে হাদিয়া পেশ করার কারণে খাজা তাঁর প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হলেন। মেহমানকে খাবার খাওয়ালেন। এরপর ছেলেটিকে কাছে ডেকে বললেন, তোমার দ্বারা পছন্দনীয় খেদমত হয়েছে। তোমার যা ইচ্ছা চাও, ইনশাআল্লাহ্ পূর্ণ করা হবে। ছেলেটি খুবই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলো। সে বললো, আমি আপনার মতো হতে চাই। হজরত আজিজান র. বললেন, বিষয়টি খুবই কঠিন। তোমার উপর বিশাল বোঝা চাপানো হবে।

আর তুমি তা সহ্য করতে পারবে না। ছেলেটি বিনয়ের সাথে বললো, আমার উদ্দেশ্য শুধু এটাই। এটা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। হজরত আজিজান র. বললেন, ঠিক আছে তাই হবে। হজরত আজিজান তার হাত ধরে পৃথক হয়ে গেলেন। তার উপর তাওয়াজ্জোহ দিলেন। এরপর ছেলেটি তার মতোই হয়ে গেলো। আকৃতি, প্রকৃতি, জাহের, বাতেন অবিকল তাঁর মতোই হয়ে গেলো। এরপর চল্লিশ দিবস পর্যন্ত ছেলেটি জীবিত ছিলো। অবশেষে এই বোঝা বহন করতে না পেরে পরপারে চলে গেলো। রাশহাত পৃষ্ঠা ৩৯।

কারামত ৪ ঃ অদৃশ্য ইশারায় তিনি বোখারা থেকে খাওয়ারিজম গমনের ইচ্ছা করলেন। তিনি খাওয়ারিজমের মূল ফটকে গিয়ে থেমে গেলেন এবং দু'জন দরবেশের মাধ্যমে খাওয়ারিজমের বাদশাহ্র নিকট এইমর্মে খবর পাঠালেন যে, একজন ফকির আপনার দ্বারে দণ্ডায়মান। তিনি আপনার শহরে অবস্থানের ইচ্ছা করছেন। যদি অনুমতি দেন, তবে সে শহরে প্রবেশ করবে। অন্যথায় ফিরে যাবে। তিনি দূতদেরকে এটাও বলে দিলেন যে, যদি বাদশাহ্ অনুমতি দেয়, তবে তাঁর সিলমোহর যেনো নিয়ে আসা হয়। যখন তাঁরা বাদশাহ্র দরবারে পৌঁছলেন এবং হজরত আজিজান যা বলে দিয়েছিলেন তা বাদশাহ্কে বললেন, তখন খাওয়ারিজমের বাদশাহ্ ও তাঁর সভাসদগণ হেসে ফেললেন। বললেন, এই দরবেশ তো দেখছি খুবই সাদাসিধা ও আত্মভোলা। হাসি-তামাশা ছলেই তাঁরা হজরত আজিজানের ইচ্ছানুযায়ী এজাজতনামা লিখে সিলমোহর করে তাঁর প্রেরিত দরবেশদের কাছে অর্পণ করলেন। তাঁরা হজরত আজিজানের নিকট উপস্থিত হলেন এবং বাদশাহ্র অনুমতিপত্র পৌঁছে দিলেন। অনুমতি পেয়ে হজরত আজিজান র. শহরাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। এক কোণায় বসে তরিকায়ে খাজাগানের কাজে মশগুল হয়ে গেলেন।

তিনি সকালে শ্রমিকদের খোঁজে বের হতেন এবং প্রত্যহ দুই একজন করে শ্রমিক ঘরে নিয়ে আসতেন। তাদেরকে বলতেন, ভালোভাবে ওজু করো এবং পরবর্তী ওয়াক্ত পর্যন্ত আমাদের সাথে অবস্থান করো ও জিকির করো। এরপর পারিশ্রমিক নিয়ে চলে যেয়ো। লোকজন অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁর সান্নিধ্য গ্রহণ করতো। একদিন পর হজরত আজিজানের সোহবত, বুজর্গী ও কারামতের প্রভাবে তারা এমন হতো যে, তারা আর তাঁর কাছ থেকে পৃথক হতে পারতো না। কিছু দিনের মধ্যেই ওই অঞ্চলের

অধিকাংশ লোক হজরতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। আলেম ও তালেবে এলেমগণ দলে দলে তাঁর দরবারে ভিড় জমাতে লাগলো। খাওয়ারিজম বাদশাহ্‌র নিকট এইমর্মে সংবাদ পৌঁছলো যে, এক দরবেশ এই শহরে প্রবেশের পর অধিকাংশ লোক তাঁর ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। তাঁর খেদমতের জন্য তারা সদা প্রস্তুত। খাওয়ারিজম বাদশাহ্‌র ধারণা হলো, এমন যেনো না হয় যে, তাঁর ভক্ত ও অনুরক্ত লোকেরা দেশে কোনো বিপর্যয় সৃষ্টি করে। শেষে তা দমন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। বাদশাহ্ এই ধারণায় হজরতকে খাওয়ারিজম থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হজরত আজিজান র. বাদশাহ্ কর্তৃক সিল মোহরকৃত এজাজতনামা সেই দুই দরবেশের মাধ্যমে বাদশাহ্‌র দরবারে প্রেরণ করেন। তাদেরকে বলে দেন এই কথা বলার জন্য যে, আমরা আপনার অনুমতি নিয়েই এ শহরে প্রবেশ করেছি। আপনি যদি পূর্বের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন, তাহলে আমরা এখনই চলে যাবো। এজাজতনামা দেখে বাদশাহ্ এবং সভাসদগণ লজ্জিত হলেন। হজরত আজিজানের দূরদর্শিতার (এলমে ফেরাসাত) কারণে তাঁরা তাঁর ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। হজরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর মুরিদ হলেন। রাশহাত পৃষ্ঠা ৩৯।

কারামত ৫ ঃ হজরত খাজা আজিজান কুদ্দিসা সিররুহুর দুইজন পুত্র সন্তান ছিলেন। এক জনের নাম ছিলো খাজা মোহাম্মদ। তিনি খাজা মুরাদ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। হজরত আজিজানের ভক্তরা তাঁকে খাজা বুজর্গ বলতেন।

দ্বিতীয় জনের নাম খাজা ইব্রাহীম। তিনি তাঁর (হজরত আজিজান) মর্যাদা ও জীবনালেখ্যসম্বলিত একটি পুস্তিকা রচনা করেন। ওই পুস্তকের অধিকাংশ ঘটনার বর্ণনাকারী তিনিই। হজরত আজিজানের পরলোকযাত্রার সময় সমাগত হলে খাজা ইব্রাহীমকে এজাজত ও খেলাফত দান করেন। অনেকের মনে এমতো সংশয় উদয় হলো যে, হজরতের বড় সাহেবজাদা খাজা মোহাম্মদ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তিনি ছোট ছেলে ইব্রাহীমকে খেলাফত প্রদান করলেন কেনো? হজরত আজিজান র. তাদের একথা বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, খাজা মোহম্মদ আমার পরে বেশী দিন জীবিত থাকবে না। অচিরেই আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। হজরত যা বলেছিলেন তাই হলো। হজরত খাজার ইন্তেকালের ১৯ দিন পর ৭১৫ হিজরী সনে ২৭ শে জিলহজ সত্তর বছর বয়সে সোমবার দিন চাশতের সময় খাজা

মোহাম্মদ ইন্তেকাল করেন। আর খাজা ইব্রাহীম খাজা মোহাম্মদের ৭৮ বছর পর ৭৯৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

হজরত খাজা আজিজানের বয়স হয়েছিল ১৩০ বছর। তাঁর ওফাতের তারিখ ৮ই জিলহজ ৭১৫ হিজরী। তাঁর এক মুরিদ তাঁর ইন্তেকালের তারিখ ছন্দাকারে ব্যক্ত করেছেন এভাবে—

আটাশে জিলহজে, সাতশত পনর হিজরী সালে
যুগের জুনাইদ ও কালের শিবলী পরপারে গেলেন চলে।

তাঁর মাজার শরীফ রয়েছে প্রসিদ্ধ খাওয়ারিজমে। তিনি ছিলেন সূফিদের সর্দার, রহস্য জগতের সমুদ্র।

বলাবাহুল্য, খাজা মাহমুদ আঞ্জীর ফাগনবীর দ্বিতীয় খলিফার নাম ছিলো মীর হোসেন ওয়াবকিনী। তাঁকে মীর খুরাদও বলা হতো। খাজা আলী রামেতিনি এবং মীর হুসাইন ওয়াবকিনী উভয়েই তাঁর খলিফা ছিলেন। তাঁরা দু'জনেই শায়েখের ইন্তেকালের পর অনেকদিন জীবিত ছিলেন। মীর হোসেন কুদ্দিসা সিররুহু তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ বুজর্গ ছিলেন। ছিলেন তালেবে মাওলাগণের কেন্দ্রবিন্দু এবং লক্ষ্যস্থল। মীর খুরাদের কবর ওয়াবকেনা প্রদেশে। মীর খুরাদ ও মীর হোসেনের ভাই খাজা মাহমুদের মুরিদ ছিলেন। কিন্তু খেলাফত লাভ করেছিলেন খাজা আলী এবং মীর হোসেন কাদ্দাসাল্লাহু আসরারাহুমা।

হজরত খাজা মোহাম্মদ বাবা সাম্‌মাসী কুদ্দিসা সিররুহু

তরিকায় তাঁর নেসবত ছিল হজরত আজিজান কুদ্দিসা সিররুহুর সাথে। তিনি তাঁর প্রথম শ্রেণীর খলিফা ছিলেন। তাঁর আবির্ভাব ও তিরোধান সাম্‌মাসের মাটিতেই সংঘটিত হয়েছিলো। এটা রামেতিন অঞ্চলের একটি গ্রামের নাম। যা রামেতিন থেকে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আর বোখারা থেকে তিন ক্রোশ দূরে। হজরত আজিজানের অন্তিমযাত্রার সময় ঘনিয়ে এলে তিনি তাঁর মুরিদগণ থেকে খাজা বাবা সাম্‌মাসীকে মনোনীত করেন। খেলাফত প্রদান করে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন এবং সকল মুরিদান ও প্রিয়জনকে বাবা সাম্‌মাসীর অনুগত ও সান্নিধ্যে থাকার নির্দেশ দেন। রাশহাত পৃষ্ঠা ৪১।

হজরত খাজা বাবা সাম্‌মাসীর সর্বদা এমন হাল জারি থাকতো যে, তিনি সাম্‌মাস গ্রামে অবস্থিত বাগানে যেতেন। নিজ হাতে গাছের ডাল-

পালা ছেঁটে ফেলতেন । তাঁর উপর বিশেষ অবস্থা জারী হতো। হুঁশ ফিরে এলে পুনরায় আঙ্গুরের বাগানে গিয়ে ডাল-পালা ছাঁটতেন। আবার তাঁর উপর সেই হাল-অবস্থা প্রভাব ফেলতো এবং তাঁকে বেখবর করে দিতো। হালের এমন অবস্থা দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকতো। রাশহাত পৃষ্ঠা ৪২।

কারামত ১ ঃ হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ কুদ্দিসা সিররুহু হজরত খাজা সাম্‌মাসীর গ্রহণকৃত শাগরিদ ছিলেন। খাজা নক্‌শবন্দের জন্মের পূর্বে তাঁর জন্মস্থান কুশাক হিন্দুওয়ান অতিক্রমকালে বাবা সাম্মাসী বলতেন, এই মাটি থেকে একজন মহামানবের সুঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। খুব শীঘ্রই কুশাক হিন্দুওয়ান কছরে পরিণত হবে। যখন তাঁর মহাআর্বিভাবের সময় সমুপস্থিত হলো তখন তিনি বললেন, সেই সুরভি এখন সন্নিকটবর্তী। মনে হয় তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। খোঁজ নিয়ে দেখা গেলো তিন দিন আগে তিনি ধরাধামে আগমন করেছেন। তাঁর দাদা মহান বুজর্গের নেক নজর কামনার্থে হজরত খাজা বাবা সাম্মাসির কাছে উপস্থিত হন। বলেন, এই শিশু আমারই সন্তান। আমি তাঁকে আমার সন্তান হিশাবেই গ্রহণ করলাম। অতঃপর তিনি তাঁর মুরিদদেরকে বললেন, ইনি সেই মহাপুরুষ যার খুশবু আমি পাচ্ছিলাম। অচিরেই এই শিশু তার যুগের শ্রদ্ধাভাজন সরদার হবে।

অতঃপর তিনি হজরত আমীর কুলাল কুদ্দিসা সিররুহুকে সম্বোধন করে বললেন, আমার এই সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে অবহেলা কোরো না। করলে আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না। একথা শুনে খাজা আমীর কুলাল কুদ্দিসা সিররুহু উঠে দাঁড়ালেন। অত্যন্ত আদবের সাথে সিনায় হাত রেখে বললেন, যদি তাঁর তালিম তরবিয়তের ব্যাপারে অবহেলা করি, তবে আমি মানুষ নই।

টীকা ঃ *কুশাক হিন্দুওয়ানের নাম কোনো কোনো কিতাবে কসরে হিন্দুওয়ান বলে উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দের জন্মস্থানকে বুঝায়। কুশাক ও কসরের অর্থ প্রাসাদ। হিন্দুওয়া শব্দটি হিন্দ শব্দের বহুবচন। ফার্সি ভাষায় হিন্দ শব্দের অর্থ চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারী ইত্যাদি। সম্ভবতঃ হজরত খাজার জন্মের পূর্বে এই এলাকায় দুষ্কৃতকারীদের উপদ্রব ছিলো। এই কারণে খাজা বাবা সাম্‌মাসী ওই স্থানকে কসরে হিন্দুওয়ান বলেছেন। হজরত খাজা নক্‌শবন্দের বরকতে তা কসরে আরেফান নামে প্রসিদ্ধ হয়।*

কারামত ২ ঃ হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ র. বলেন, যখন আমার বিবাহের সময় নিকটবর্তী হলো, তখন আমার দাদা আমাকে হজরত বাবা সাম্‌মাসী কুদ্দিসা সিররুহুর খেদমতে প্রেরণ করলেন, যাতে তাঁর কদমবুসির বরকত অর্জন করে শুভবিবাহের কাজ সুসম্পন্ন করি। তাঁর খেদমতে উপনীত হয়ে প্রথমে আমি তাঁর মসজিদে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলাম। যখন মাথা সেজদায় রাখলাম তখন আমার মুখ থেকে বের হয়ে এলো— হে আমার প্রভুপালক! যদি তোমার পক্ষ থেকে কোনো বিপদ আমার উপর আপতিত হয় তা সহ্য করার শক্তি যেনো পাই, আর তোমার ভালোবাসার কাজ করার শক্তিও আমাকে প্রদান করো। সকালে যখন বাবা সাম্‌মাসীর খেদমতে উপস্থিত হলাম তখন তিনি বললেন, হে বৎস! এরূপ দোয়া কোরো— হে আমার আল্লাহ্! তোমার যা ইচ্ছা, তার উপর অটল থাকার অনুগ্রহ ও অনুকম্পাময় তাওফিক এই দুর্বলকে দান করো। শোনো, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এমন নয় যে, বান্দা বিপদগ্রস্ত হোক। তবে কোনো হেকমতের কারণে যদি কাউকে বিপদকবলিত করেন, তবে তাকে তা সহ্য করার শক্তি প্রদান করেন। তার কল্যাণের দিকসমূহ প্রকাশ করে দেন। নিজের বিপদ কামনা করা ঠিক নয়। এমন দুঃসাহস না করাই উচিত। নুফহাত পৃষ্ঠা ৩৪২।

কারামত ৩ ঃ হজরত খাজা নক্‌শবন্দ র. বলেন, একদিন হজরত বাবা সাম্‌মাসী দাওয়াত কবুল করে আমার বাড়িতে আগমন করলেন। আহার শেষে আমাকে একটি রুটি প্রদান করলেন। আমার ধারণা হলো তিনি পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানাহার করেছেন। কিছুক্ষণ পর আমরা নির্দিষ্ট স্থানে এক বাড়িতে পৌঁছলাম। তিনি বললেন, রুটিটি যত্নসহকারে রেখেছো তো? কাজে লাগবে। আমি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করলাম। তিনি পুনরায় যাত্রা করলেন। আমিও তাঁর সাথী হলাম। পথিমধ্যে আমার অন্তর অকারণে সংশয়াচ্ছন্ন হলো।

তিনি বললেন, বাতেনকে হেফাজত করো। যখন তিনি বাগজাবি মুলিয়ায় যেতেন, তখন পথিমধ্যে এক ভক্তের বাড়িতে থামতেন। সেদিনও সেখানে থামলেন। ওই ভক্ত অত্যন্ত আনন্দের সাথে হজরতকে সম্ভাষণ জানালেন। হজরতকে তাঁর গৃহে নিয়ে গিয়ে অনেকভাবে আপ্যায়ন করলেন। এমন সময় এক বৃদ্ধকে অত্যন্ত অস্থির ও চঞ্চল দেখা গেলো। তিনি কখনো বাইরে কখনো ভিতরে যাওয়া-আসা করছেন। হজরত তাঁর

এমতো চঞ্চলতার কারণ জানতে চাইলেন। ভক্ত বললেন, দুধ পাওয়া গেছে কিন্তু রুটি পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক অনুসন্ধান করা হলো তবু পাওয়া গেলো না। আমাদের ইচ্ছা আপনার সামনে রুটি ও দুধ উপস্থিত করি। হজরত খাজা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, রুটিটি বের করো। ওর হাতে দাও। আমি আদেশ পালন করলাম। তিনি বললেন, দেখলে তো রুটিটি এখন কেমন কাজে লাগলো। হজরত বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ র. বলেন, আমি হজরত খাজার অসংখ্য কারামত দেখেছি। যতো দেখেছি ততোই তাঁর প্রতি আমার ভক্তি ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পেয়েছে।

উল্লেখ্য, হজরত আজিজানের খলিফাগণের মধ্যে হজরত বাবা সাম্‌মাসীর পরে ছিলেন হজরত খাজা খুরদ। তিনি হজরত আজিজানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ইতোপূর্বে তাঁর কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন খাজা মোহাম্মদ কুলাহদুয। তাঁর মাজার শরীফ খাওয়ারিজমে। তৃতীয় খলিফা মোহাম্মদ সালাহ্‌। তাঁর পবিত্র সমাধি বলখে। চতুর্থ খলিফা মোহাম্মদ বাওয়ারদি। তাঁর কবর শরীফ খাওয়ারিজমে (কাদ্দাসাল্লাহু আসরারাহুম)। নুফহাত পৃষ্ঠা ৩৪২। রাশহাত পৃষ্ঠা ৪০-৪১।

হজরত সাইয়্যেদ আমীর কুলাল কুদ্দিসা সিররুহু

তাঁর বেলায়েতের সম্পর্ক ছিলো হজরত বাবা সাম্‌মাসী কুদ্দিসা সিররুহুর সাথে। তিনি ছিলেন অভিজাত সাইয়্যেদ বংশোদ্ভূত। তাঁর জন্ম ও ইন্তেকাল হয় সোওখরে। তিনি কুম্ভকার অর্থাৎ পাতিলের ব্যবসায়ী ছিলেন। বোখারার আঞ্চলিক ভাষায় কুম্ভকারকে কুলাল বলা হয়।

হজরত আমীর কুলাল কুদ্দিসা সিররুহু যৌবনের প্রারম্ভে কুস্তিগীর ছিলেন। একদিন হজরত বাবা সাম্‌মাসী কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আমীর কুলালের কুস্তি খেলা দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত খেলা দেখলেন। মুরিদগণ বুঝতে পারলেন না, হজরত বাবা সাম্‌মাসীর এতোক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ কী? হজরত বাবা সাম্‌মাসী র. তাঁদের অন্তরের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, এই কুস্তিগীরদের মধ্যে একজন মরদে মুজাহিদ রয়েছেন, যার সান্নিধ্য দ্বারা অনেক লোক কামালতের দরজায় উপনীত হবে। আমার দৃষ্টি এখন তার উপর। আমি চাই, সে যেনো আমার সঙ্গি হয়ে যায়। এমন সময় আমীরের দৃষ্টি খাজা বাবা সাম্‌মাসীর প্রতি পতিত হলো। হজরত খাজার জয্‌বা (আকর্ষণ) ও তাওয়াজ্জোহ্‌ তার

উপরে প্রভাব বিস্তার করলো। হজরত খাজা সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমীর কুলালও কুস্তি ছেড়ে হজরত খাজা বাবাকে অনুসরণ করলেন। এভাবে উপনীত হলেন হজরত খাজা সাহেবের খানকায়। আমীর কুলাল র. কে নির্জনে নিয়ে গিয়ে তরিকতের তালীম দিলেন। তাঁকে স্বীয় সন্তানরূপে গ্রহণ করলেন। চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে গেলো হজরত আমীর কুলালের কুস্তিগীরের জীবন। তিনি একাধারে বিশ বছর পর্যন্ত খাজা বাবার খেদমত করেন। প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার এই দুই দিন স্বীয় গ্রাম সোওখর হতে সাম্‌মাসে যেতেন। দীর্ঘ সময় ধরে সোহবত ও খেদমতে থাকতেন। তাঁর পীর-মোর্শেদের খানকা ছিলো পাঁচ ক্রোশ দূরত্বে। তিনি আসা যাওয়ার পথে হজরত খাজেগানের তরিকায় এমনভাবে মশগুল থাকতেন যে, বাইরের কেউ তা বুঝতেই পারতো না। এভাবে খাজার তরবিয়ত দ্বারা তিনি পরিপূর্ণতা ও খেলাফতের মর্যাদা হাসিল করেন। রাশহাত পৃষ্ঠা ৪৩।

কারামত ১ ঃ হজরত আমীর কুলালের মা বলেন, যখন আমীর কুলাল আমার গর্ভে ছিলো, তখন সন্দেহযুক্ত কোনো খাবার খেলে আমার পেটে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব হতো। আমি বুঝতে পারতাম, আমার গর্ভে আছে এক পবিত্র শিশু। তার কারণেই সন্দিগ্ধ কোনো কিছু আমার সহ্য হয় না। এরপর থেকে আহারের ব্যাপারে আমি খুবই সতর্কতা অবলম্বন করলাম। রাশহাত পৃষ্ঠা ৪২।

টীকা ঃ *তাঁর বংশপরম্পরা এরকম— সাইয়্যেদ শামসুদ্দিন খাজা আমীর কুলাল ইবনে আমীর হামযা ইবনে আমীর ইয়াকূব ইবনে ইসমাঈল ইবনে গাওছ ইবনে আবদুল মান্নান ইবনে কিয়ামুদ্দিন ইবনে রুকুনুদ্দিন ইবনে নূরুদ্দিন ইবনে আবদুল খালেক ইবনে আলীমুল্লাহ ইবনে শায়েখ বাকা ইবনে আবদুল ওয়াহাব ইবনে শামসুদ্দিন ইবনে আবু ইসহাক ইবনে আবুল হাসান ইবনে সদরউদ্দিন ইবনে হামেদ ইবনে মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে আবদুল কাদের ইবনে হোসেন আহমদ ইবনে কাসেম ইবনে জয়নুল আবেদীন সানি ইবনে মোহাম্মদ সালেহ ইবনে জাওয়াদ ইবনে ইমাম আলী মূসা রেজা ইবনে ইমাম মূসা কাজেম ইবনে ইমাম জাফর সাদেক ইবনে ইমাম মোহাম্মদ বাকের ইবনে ইমাম জয়নুল আবেদীন ইবনে ইমাম হোসেন ইবনে হজরত ফাতেমা যাহ্‌রা এবং হজরত আলী রেদ্বওয়ানাল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন।*

কারামত ২ ঃ হজরত আমীর কুলাল র. যৌবনে কুস্তিগীর ছিলেন। এক কুস্তির আখড়ায় তাঁর চারপাশ শূন্য করে দাঙ্গা যুদ্ধংদেহী অবস্থা প্রকাশ করতে ছিলেন। একদিন কুস্তির আখড়ার একজনের খেয়াল হলো এই সাইয়্যেদজাদা পবিত্র বংশোদ্ভূত। তিনি আবার কুস্তি খেলেন কেনো? অযথা শরীর পরীক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন কেনো? এগুলো তো আহলে বেদাতীদের কাজ। এরকম চিন্তার মধ্যেই তিনি তন্দ্রাভিভূত হলেন। দেখতে পেলেন, কিয়ামত শুরু হয়েছে। আর তিনি বুক পর্যন্ত মাটি ও কাদার মধ্যে ডুবে গেছেন। হঠাৎ দেখলেন, হজরত আমীর কুলাল এলেন এবং তাঁর দুই হাত ধরে তাঁকে কাদা থেকে বের করে আনলেন। তন্দ্রাভঙ্গ হবার পর আমীর কুলাল তাঁকে বললেন, আমি এই দিনের জন্যই শক্তি পরীক্ষা করেছি। রাশহাত পৃষ্ঠা ৪২-৪৩।

উল্লেখ্য, হজরত আমীর কুলাল র. ব্যতীত হজরত খাজা বাবা সাম্‌মাসীর আরও তিনজন খলিফা ছিলেন। তাঁরা খাজা বাবা সাম্‌মাসীর পর মুরিদান ও সালেকবৃন্দের তালিম-তরবিয়তের কাজে রত ছিলেন। তাঁরা হলেন—

১. খাজা সূফী সোওখরী। জন্ম সোওখর গ্রামে। যা বোখারা শহর থেকে দুই ফরসখ দূরে অবস্থিত।

২. খাজা মাহমূদ সাম্‌মাসী। তিনি ছিলেন খাজা বাবা সাম্‌মাসীর পুত্র।

৩. মাওলানা আলী দানেশ মানদ কাদ্দাসাল্লাহু আসরারাহুম।

ইন্তেকাল ঃ ৭৭২ হিজরী ৮ জমাদিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার ফজরের নামাজের সময় হজরত সাইয়্যেদ আমীর কুলাল র. ইন্তেকাল করেন। সোওখর অঞ্চলেই তাঁর মাজার শরীফ অবস্থিত।

খাজা মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ কুদ্দিসা সিররুহু

হজরত খাজার জাহেরী সম্পর্ক ছিলো হজরত আমীর কুলাল কুদ্দিসা সিররুহুর সাথে। কিন্তু প্রকৃত সম্পর্ক ছিলো খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানী র. এর সাথে। খাজেগানের সিলসিলার ওই সরদারের সাথেই তাঁর পূর্ণ রূহানী নেসবত ও বাতেনী তরবিয়ত লাভ হয়েছিলো। নুফহাত পৃষ্ঠা ৩৪৫।

হজরত আমীর কুলাল র. জীবনসায়াহ্নে তাঁর সকল মুরিদানকে খাজা বাহাউদ্দিনের অনুসরণ করার জন্য আদেশ করেন। তাঁরা আবেদন করেন,

খাজা বাহাউদ্দিন উঁচু আওয়াজে জিকির করার ক্ষেত্রে আপনার অনুসারী নন। শায়েখ বলেন, খাজা সাহেবের উপর যে হাল অতিবাহিত হচ্ছে, তা হেকমতে এলাহিতেই হচ্ছে। তাতে তাঁর কোনো ইচ্ছা বা স্বাধীনতা নেই। এটা অপরিবর্তনীয়। এরপর তিনি একটি কবিতাংশ আবৃত্তি করলেন।

যা কিছু আছে সব তুমি আর তুমি
আমি কী? তুমি যা সমীচীন মনে করো, তা-ই।

তিনি বলেন, তোমরা কি খাজেগানের খলিফাদের বাণী শোনোনি? যদি তোমাকে তোমার ইচ্ছার বহির্ভূত করে দেওয়া হয়, তাহলে তোমার কোনো ভয় নেই। আর যদি নিজে বের হয়ে যাও, তবে ভয় করো। রাশহাত পৃষ্ঠা ৫৪।

জন্ম ঃ হজরত খাজার মহাআবির্ভাব ও মহাতিরোধান বোখারা থেকে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত কসরে আরেফান নামক গ্রামে হয়েছিলো। জন্মতারিখ মোহররম মাস ৭২১ হিজরী। শৈশবকাল থেকেই তাঁর বেলায়েতের নিদর্শন প্রস্ফুটিত হয়। রাশহাত ৫৩ পৃষ্ঠায় তাঁর জন্মতারিখ ৭১৮ হিজরী উল্লেখ আছে।

খাজা বাবা সাম্মাসী র. তাঁর জন্মের পূর্বেই তাঁর ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তাঁর জন্মের পর তাঁকে নিজের মুরিদগণের মধ্যে গণ্য করেন। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব সাইয়্যেদ আমীর কুলাল র. এর উপর ন্যস্ত করেন। রাশহাত পৃষ্ঠা ৫৪।

জিকরে খফি ঃ হজরত খাজা নক্‌শবন্দ র. পরস্পর সম্পর্কের ক্ষেত্রে খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানী র. এর পক্ষ থেকে আজিমতের উপর আমল করার জন্য আদিষ্ট ছিলেন। এজন্য তিনি জিকরে খফিকেই (মনে মনে জিকর) পছন্দ করেছিলেন। যদিও এই সিলসিলার বুজর্গগণ খাজা মাহমুদ ফাগনবী র. থেকে খাজা আমীর কুলাল পর্যন্ত সকলে জিকরে খফিকে জিকরে জলির সাথে একত্রে আদায় করতেন। কিন্তু যখন হজরত আমীর কুলাল র. জিকরে জলি শুরু করতেন, তখন খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ র. হালকায়ে জিকির থেকে উঠে যেতেন। তাঁর আমল হজরত আমীর কুলাল র. এর মুরিদগণের পছন্দ হতো না। তাই তারা একদিন শায়েখের খেদমতে তাঁর বিরুদ্ধে এইমর্মে অভিযোগ করলো যে, খাজা বাহাউদ্দিন আপনার অনুসরণ-অনুকরণ করেন না। এতদসত্ত্বেও দেখা গেলো, হজরত শায়েখের দৃষ্টি ও মহব্বত হজরত খাজার প্রতি বৃদ্ধিই

পাচ্ছিলো। হজরত খাজা আমীর কুলাল র. এর খেদমতে কোনো ত্রুটি করতেন না। সর্বদা শায়খের দরবারেই পড়ে থাকতেন। হজরতের অনুসরণ করতেন।

তরবিয়ত ঃ একদিন হজরত আমীর কুলালের প্রায় পাঁচশত মুরিদ মসজিদ ও ইবাদতখানা নির্মাণের জন্য সোওখর গ্রামে সমবেত হলেন। ওই সমাবেশে তিনি এরশাদ করলেন, প্রিয় বন্ধুরা! শোনো, আমার মুরিদ খাজা বাহাউদ্দিনের ব্যাপারে তোমরা অপধারণা রেখো না। তোমরা তাঁকে চিনতে পারোনি। আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ দৃষ্টি সর্বদা তাঁর প্রতি পতিত হচ্ছে। আর আল্লাহ্র বান্দাদের দৃষ্টি আল্লাহ্র দৃষ্টির অনুগত ও অনুগামী হয়ে থাকে। তাঁর অবস্থার প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখা আমার ইচ্ছাবর্হির্ভূত কাজ। এরপর তিনি খাজা বাহাউদ্দিনকে ডেকে বললেন, হে আমার সন্তান বাহাউদ্দিন! তোমার ব্যাপারে খাজা বাবা সাম্মাসী আমাকে এইমর্মে ওসিয়ত করেছিলেন যে, আমি তোমাকে যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েছি, আমার রূহানী সন্তান বাহাউদ্দিনকে অনুরূপ শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ো। এতে কোনো শৈথিল্য কোরো না। অতঃপর আপন বক্ষদেশের দিকে ইশারা করে বললেন, আমি তোমার জন্য রূহানী আহারাধার শুষ্ক করে দিয়েছি। তোমাকে দুর্বার হতে হবে। উদার মনে প্রশস্ত ময়দানের দিকে ধাবিত হতে হবে। আমি তোমাকে এজাজত দিয়েছি। নিজ সাহস অনুযায়ী অনুসন্ধান করো, ত্রুটি কোরো না।

বিশেষ বেলায়েতের চূড়ান্ত সীমানা ঃ আমাদের হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি কুদ্দিসা সিররুহুল আজীজ লিখেছেন, খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দ র. খাজেগানের পূর্ণতা ও জয্বা হাসিলের পর উপরের সুলুকের দিকে মনোনিবেশ করেন। সেই সুলুকের শেষ সীমানা পর্যন্ত পৌঁছেন এবং ফানাফিল্লাহ্ ও বাকাবিল্লায় ভূষিত হন। আর এটা বেলায়েতের সর্বোচ্চ স্তর। এরপর শাহাদাতের মাকামে পৌঁছেন, যা বেলায়েত অপেক্ষা উচ্চ। এই দুই মাকামের মধ্যে পার্থক্য এরকম, যেমন পার্থক্য তাজাল্লীয়ে সূরী ও তাজাল্লীয়ে যাতীর মধ্যে। এরপর তিনি সিদ্দিকিয়াতের মাকামে পৌঁছেন, যা মাকামে শাহাদাতের উপরে। উল্লেখিত নেসবতের ওসিলায় তিনি উরুজ (ঊর্ধ্বারোহণ) করেন এবং মাকামে সিদ্দিকিয়াতের শেষ স্তর পর্যন্ত পৌঁছেন। পূর্ণতার স্তরে উপনীত হয়ে তিনি ওই রাস্তা অবলম্বন করেন, যে রাস্তায় হজরত আলী রা. আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছেন। হজরত আলী রা. এর রঙে তিনি ফানা হন। আর এরই মধ্যে বিলিন হয়ে খাস্সায়ে বেলায়েতে মোহাম্মদীর শেষ স্তরে উপনীত হন।

আউলিয়াদের সোহবত বা সান্নিধ্য ঃ হজরত খাজা সাত বছর পর্যন্ত মাওলানা আরেফের সাথে থাকেন, তিনি ছিলেন হজরত আমীর কুলাল র. এর খলিফা। হজরত আমীর কুলাল র. তাঁকে দীক্ষা দিয়েছেন। তিনি সময়োপযোগী কারামতওয়ালা বুজর্গ ছিলেন। তাঁর সান্নিধ্যে তিনি নিতান্ত আদব ও সম্মানের সাথেই ছিলেন। তিনি বেশ কিছু দিন কাছাম র. ও খলীল আতা র. এর সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন। ১২ বছর পর্যন্ত স্বীয় পীর খলীল আতা র. এর খেদমতে জীবন অতিবাহিত করেন। দ্বিতীয়বার হজের জন্য হেজাজ গমন করেন এবং হেরাতে এসে মাওলানা জয়নুদ্দিন আবু বকর তাবাবাদির সাথে সাক্ষাতের জন্য তাবাবাদে গমন করেন। তিন দিন তাঁর সান্নিধ্যে কাটান। খাজা মোহাম্মদ পারসাকে তাঁর সাথীদের সাথে বদরের রাস্তা দিয়ে নিশাপুরের দিকে প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি নিশাপুর থেকে হেজাজে রওয়ানা হন। ফিরে এসে সাথীদের সাথে মিলিত হন। ফেরার পথে কয়েকদিন মারভ শহরে অবস্থান করেন। এরপর বোখারা আগমন করেন এবং জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত বোখারায় অবস্থান করেন।

নক্শবন্দ ঃ যখন তিনি খাজা মাওলানা জয়নুদ্দিনের সাথে সাক্ষাতের জন্য যান, তখন একদিন ফজরের নামাজের পর মাওলানা মোরাকাবায় ও জিকিরে মশগুল হলেন। হজরত খাজা নক্শবন্দ র. ও উপস্থিত জনেরা মোরাকাবায় শরীক হলেন। মোরাকাবা শেষে মাওলানা বললেন, হে খাজা! আমাদের নক্শা আঁকুন (আমাদের অবস্থার উপর তাওয়াজ্জোহ্ দিন)। হজরত খাজা বিনয়ের সাথে উত্তর দিলেন, আমি নিজেই নক্শা হওয়ার জন্য এসেছি। এরপর মাওলানা তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আহারের আয়োজন করলেন। দু'জনের মধ্যে গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হলো। তিনি তিন দিন পর্যন্ত খাজাকে তাওয়াজ্জোহ প্রদান করলেন। সে দিন থেকেই তাঁকে নক্শবন্দ উপাধি দেওয়া হলো। এটাও হতে পারে যে, প্রথম সাক্ষাতেই সালেকের হৃদয় থেকে অন্যেদের মহব্বত বিলীন হয়ে যেতো। এজন্য তিনি এই উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'নকশবন্দ' অর্থ আকৃতি, নক্শা বা নমুনার চিত্রাবলী প্রস্তুতকারী। এটাও হতে পারে যে, যখন থেকে তাঁকে তাকবীন সিফাত (সৃষ্টিকরণ) গুণ প্রদান করা হয়, সে সময় থেকেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর এই উপাধি লাভ হয়। হজরত খাজা নিজেই ওই কথার দিকে ইঙ্গিত করেন। বলেন, হজরত ইব্রাহীম আ. এর কথা কোরআনুল করীমে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

وَاِذْقَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ

(যখন ইব্রাহীম বলিলো, হে আমার প্রভুপালক! কীভাবে তুমি মৃতকে জীবিত করো আমাকে দেখাও। তিনি বলিলেন, তবে কি তুমি বিশ্বাস করো না? সে বলিলো, কেনো করিবো না, তবে ইহা কেবল আমার চিত্তপ্রশান্তির জন্য। সূরা বাক্বারা আয়াত ২৬০)। এখানে হৃদয়ের প্রশান্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জীবিতকরণ ও দেহে প্রাণসঞ্চারের গুণ বাস্তবে পর্যবেক্ষণের অভিলাষ। রেসালায়ে ইনসিয়্যাহ পৃষ্ঠা ৩৯।

হজরত গাউছুছ্ ছাকালাইন আবদুল কাদের জিলানী র. তাঁর ফুতুহুল গায়ব কিতাবে ফানা সম্পর্কে আলোচনার পর বলেন, ফানা হলো আউলিয়া ও আবদালগণের শেষ স্তর বা অবস্থা।

এরপর এই সিফাতের উপর তাকবীন বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্তায়ালা বলেন, হে বনি আদম! আমি আল্লাহ্! আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আমি যখন কোনো বস্তুকে বলি হয়ে যাও, তা হয়ে যায়। অনুরূপভাবে আমি তোমাকে এরূপ বানাতে চাই, যখন তুমি কোনো বস্তুকে বলবে, হয়ে যাও, তখন তা হয়ে যাবে।

ওলীদের ক্ষমতা ঃ পূর্ববর্তী আউলিয়াদের ঐকমত্য এরূপ যে, কোনো কোনো আরেফ বিল্লাহ্কে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যা চাইতেন, তাই তৈরী করতেন। কিন্তু আরেফের তৈরী বা নির্মাণ আর আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আরেফের নির্মাণ ওই সময় পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত আরেফের তাওয়াজ্জোহ আলমে মেছাল বা আলমে শাহাদাতে নিবদ্ধ থাকবে। যখন তাওয়াজ্জোহ অন্যত্রগামী হবে, তখন তার নির্মাণ নিঃশেষ হয়ে যাবে।

হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দ র. থেকে জীবিতকরণ, মৃতকরণ, সৃষ্টিকরণ ইত্যাদি অনেক কারামত (সিফাতে ইলাহির প্রতিবিম্ব হিসাবে) প্রকাশিত হয়েছে। একটু পরেই এগুলোর আলোচনা আসছে।

খাজা নক্শবন্দ র. এর নিত্য দিনের কাজ ঃ হজরত খাজার নিত্য দিনের আমল সম্পর্কে হজরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী র. তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি ছয় সালামে বারো রাকাত তাহাজ্জুদের নামাজ আদায়

করতেন। বলতেন, এই নামাজ রসূল স. এর উপর ফরজ ছিলো। পরে নফল হয়েছিলো। কতিপয় আলেমের মতে সর্বদা ফরজ ছিলো। মাকামে মাহমুদের অঙ্গীকার তাহাজ্জুদ আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো। ঘুম থেকে জাগ্রত হলে তিনি সেই দোয়াই পড়তেন, যা হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। এরপর এস্তেগফারে লিপ্ত হতেন এবং মোরাকাবায় বসে যেতেন। যদি রাত বেশ বাকি থাকতো, তবে তিনি কেবলামুখী হয়ে হেলান দিয়ে বসে থাকতেন। এরপর নতুন অজু করে ফজরের সুন্নত ও ফরজ আদায় করতেন এবং মুরিদগণকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে মোরাকাবায় বসে থাকতেন। এরপর দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন।

ইশরাক ও ইস্তেখারার নামাজ ঃ রসূল স. বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করলো এবং সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌র জিকিরে মশগুল থাকলো, অতঃপর দুই রাকাত নামাজ আদায় করলো তার জন্য রয়েছ কবুল হজ্ব ও উমরার সওয়াব। মেশকাত, তিরমিজি। এরপর ইস্তেখারার নিয়তে আরও দুই রাকাত নামাজ আদায় করলো, যেমন হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে— হে বনী আদম! দিনের শুরুতে যে আমার জন্য দুই রাকাত নামাজ আদায় করবে আমি তার জন্য দিনের শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট হয়ে যাবো। রসূল স. আরও বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের পর জায়নামাজে বসে থাকলো এবং দুই রাকাত নামাজ আদায় করলো এবং ভালো ছাড়া মন্দ কথা বললো না, তার সকল গুনাহ্ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা অপেক্ষা অধিক হয়। মেশকাত।

কতিপয় আলেম বলেন, ওই আয়াত যা হজরত ইব্রাহীম আ. এর শানে নাজেল হয়েছে এভাবে— ইব্রাহীম সকল আহকাম পরিপূর্ণভাবে আদায় করেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইশরাক নামাজ।

যখন সূর্য উঁচুতে উঠতো, জমিন উত্তপ্ত হয়ে যেতো তখন তিনি চাশ্‌তের বারো রাকাত নামাজ আদায় করতেন। কখনো আট, কখনো চার, আবার কখনো দুই রাকাত আদায় করতেন। কেনোনা চাশতের নামাজের রাকাতের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। 'তিনি তওবাকারীদেরকে ক্ষমা করে দেন' এই আয়াতের উদ্দেশ্যও চাশতের নামাজ। এই নামাজের ওয়াক্ত হয় তখন, যখন দিবসের উত্তাপ শুরু হতে থাকে। আর তিনি মাগরিবের সুন্নতের পর তিন সালামে ছয় রাকাত নামাজ আদায় করতেন।

রোজা এবং নামাজ ঃ তিনি বলেন, আমাদের রোজা হলো আল্লাহ্‌র সত্তা ছাড়া সব কিছুকে অস্বীকার করা। আর আমাদের নামাজ হলো আল্লাহ্‌র দীদার। কবি বলেন—

যখন তোমার দীদার লাভ হয়, না-নামাজ না-রোজা কিছুই আর থাকে না। তোমার দীদারই আমার নামাজ, তুমি ছাড়া আমার নামাজ কেবল আকৃতি ব্যতীত তো কিছু নয়।

মাওলানা ইয়াকুব চরখী র. বলেন, মাকামে শাহাদাত লাভের পর বুঝা যায়, তাঁর দরবারে কোনো ইবাদতই উপযুক্ত নয়। যেমন আয়াতে করিমায় রয়েছে— 'তারা আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য মর্যাদা দান করে নাই'। সূরা আনআম ৯১।

প্রকৃত এখলাস ঃ তিনি বলেন, প্রকৃত এখলাস ফানা হওয়ার পর অর্জিত হয়। মানবীয় গুণাবলীর প্রাবল্য থাকলে তা অর্জিত হয় না। কবি বলেন—

আমরা পাত্রের শরাব পান করার পূর্বেই মোহগ্রস্ত হয়ে যাই, কিন্তু পেয়ালার পর পেয়ালা যদি পান করতে পারো তবেই না বুঝতে পারবে আমিত্ব ছেড়ে দিতে হবে। যতোক্ষণ এই বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে, ততোক্ষণ আল্লাহ্‌র উপাসনা হবে না।

অনুগ্রহ ও আমল ঃ তিনি বলেন, দরবেশ দুই প্রকারের—

১. কেউ সাধনা এবং মুজাহাদা করে নতিজা (ফল) প্রার্থী হয়। অবশেষে পেয়ে যায় এবং গন্তব্যে উপনীত হয়।

২. আবার কেউ কেউ আল্লাহ্‌র অনুকম্পার আশাবাদী। সাধনার তাওফিকও এই প্রকারের মনে করতে হবে। এমন আশাপোষণকারী ব্যক্তিও উদ্দেশ্যে উপনীত হয়ে যায়। মূল কথা হলো আমল করে বিনিময় চেয়ো না এবং আমল বর্জনও কোরো না।

শায়খুল ইসলাম হারবী বলেন, নেক আমল ত্যাগ কোরো না, কিন্তু তা মূল্যবান মনে করে বিনিময় চেয়ো না। রেসালায়ে নিস্‌ইয়াহ্‌ পৃষ্ঠা ৩৭।

গুণহীনতা ঃ তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র অনুকম্পায় আমার এই মাকাম অর্জিত হয়েছে এবং গুণহীনতার মাকামে বিশ বছর অতিবাহিত হয়েছে।

জনৈক কবি বলেন— যতোক্ষণ আমরা কোনো গুণের অনুসরণ করে গুণাধিকারী না হবো, যতোক্ষণ পর্যন্ত এই গুণ বিদ্যমান থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত সবই থাকবে।

দীর্ঘ সময় দুই জন জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সাথে থাকার সৌভাগ্য নসিব হয়েছিলো। আমাদের মহব্বত ও এখলাস থাকা সত্ত্বেও আমাকে চিনতে পারেনি। কেনোনা বান্দা যখন গুণহীনতার স্তরে পৌঁছে, তখন তার পরিচয় লাভ করা কঠিন। বিশেষ করে কৃত্রিম দরবেশদের জন্য। কবি বলেন— মহান ব্যক্তিগণ সাহস করে সুলুকের মঞ্জিল অতিক্রম করেন, তবে শর্ত হলো, যখন বড়ত্ব ও আমিত্বের এক বিন্দুও বিদ্যমান না থাকবে।

নক্‌শবন্দিয়া তরিকার বিশেষত্ব ঃ তিনি বলেন, যখন আমি কাবা শরীফের সফর থেকে ফিরে এসে তুস নগরীতে পৌঁছি তখন খাজা আলাউদ্দিন তাঁর ভক্ত ও মুরিদগণকে সাথে নিয়ে আমাদেরকে স্বাগতম জানানোর জন্য বোখারা থেকে বের হয়ে আসেন। সাথে নিয়ে আসেন হেরাতের গভর্নর মুইজদ্দিন হোসেনের একটি পত্র। পত্রটি প্রেরিত হয়েছিলো তাঁর দূত মারফত। চিঠির বিবরণ এরকম— এই অধম আপনার সাক্ষাতাভিলাষী। কিন্তু এতোদ্দেশ্যে আপনার কাছে আসা আমার জন্য অসুবিধাজনক। পরবর্তী সংবাদঃ

وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ -

(এবং প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করিও না। সূরা দোহা আয়াত ১০)।

খাজা নক্‌শবন্দ র. বলেন, এই আয়াত এবং ওই বাণী 'যখন আমার অন্বেষণকারীকে দেখবে তখন তুমি তার খাদেম হয়ে যাবে'— এগুলোই আমার আকুতি। পত্র পাঠের পর আমি হেরাতের দিকে যাত্রা করলাম। এক সময় বাদশাহ্‌র কাছে পৌঁছে গেলাম। বাদশাহ্ ফকিরদের কাফেলার সম্মান প্রদর্শনের পর আমার সান্নিধ্যে উপবেশন করলেন। বললেন, আপনার সাদাসিধা জীবনযাপনের কারণেই কি আপনার দরবেশী জীবন হাসিল হয়েছে? তিনি বললেন, না। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি কাওয়ালী শ্রবণ করেন, উঁচু আওয়াজে জিকির করেন? আমি বললাম, না। বাদশাহ্ বললেন, দরবেশগণ তো এসব কাজই করে থাকেন। আপনি এগুলো করেন না কেনো? আমি বললাম, যখন আল্লাহ্‌তায়ালার অসংখ্য নেয়ামত আমার উপর পতিত হলো, তখন তিনি সাধনা ছাড়াই আমাকে কবুল করে নিলেন। আমি আল্লাহ্‌তায়ালার ইশারায় খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানী র. এর সিলসিলায় প্রবেশ করলাম। ওই তরিকার বুজর্গগণ থেকে ফয়েজ লাভ করলাম। তাঁদের তরিকায় জিকরে জলি ও সেমা কাওয়ালি ইত্যাদি ছিলো

না। বাদশাহ্ জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে কী ছিলো? আমি বললাম, তাঁরা বাহ্যিকভাবে সৃষ্টজীবের সাথে থাকেন, আর বাতেনীভাবে থাকেন আল্লাহ্তায়ালার সাথে। তিনি বললেন, এটা কীভাবে সম্ভব? আমি বললাম, সম্ভব। যেমন আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন—

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ -

(সেই সব লোক যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ হইতে বিরত রাখে না। সূরা নূর আয়াত ৩৭)। আমি বললাম, নির্জনতায় আসে প্রসিদ্ধি, আর প্রসিদ্ধিতে রয়েছে বিপদ। আমাদের খাজাগণ বলেন, খলওয়াত দর আঞ্জুমান, সফর দর ওয়াতন, হুঁশ দর দম, নজর বর কদম। সেমা, কাওয়ালী, উঁচু আওয়াজে জিকির দ্বারা যে একাগ্রতা ও মত্ততা সৃষ্টি হয়, তা স্থায়ী হয় না। কিন্তু হৃদয়ের স্থিরতায় যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, তা ওই জয্বা বা আকষর্ণে উপনীত করে। কবি বলেন—

ভেতরের দাহ অগ্নিময় নয়, অন্য কোনোকিছু— যা নির্বাপিত হয় না।

জিকরে খফির হকিকত ঃ জিকরে খফির হকিকত হলো, কলবের স্থিরতা সম্পর্কে অবগত হওয়া। ওই মাকাম হাসিল হলে দিল্ বা হৃদয়ও জানে না যে, সে জিকিরে মশগুল আছে। তরিকতের মাশায়েখগণ বলেন, কলব বা হৃদয়ের যদি এমতোবোধ থাকে যে, সে জিকির করছে, তাহলে বুঝতে হবে সে এখনও উদাসীন। যেমন আল্লাহ্র বাণী—

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ

(তোমরা প্রভুপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশংকচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করিবে এবং তুমি উদাসীন হইবে না। সূরা আরাফ আয়াত ২০৫)। হজরত হাসান বসরী র. বলেন, জিকিরকে নফসের উপর প্রকাশ কোরো না। অন্যথা সেও তার বিনিময় তালাশ করবে। কোনো কোনো বুজর্গ বলেন, মুখে জিকির বাহুল্য কথন, আর হৃদয়ের জিকির কুমন্ত্রণা। কবির ভাষায়—

আমি আমার মনকে বললাম, তোমাকে তাঁর স্মরণে তুষ্ট করবো। মন জবাব দিলো, যখন আমি তাঁর মাঝে বিলিন হয়ে যাবো, তখন কার স্মরণ করবো।

বর্ণিত আছে যে, হজরত খাজা বাদশাহ্‌র অনুরোধে হেরাতে তাশরিফ রাখেন এবং বাদশাহ্‌র প্রাসাদে অবতরণ করেন। তিনি যার নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন এবং যিনি তাঁকে দেখেন তিনিই মাস্‌ত (বেকারার ও অস্থির) হয়ে যান।

চারটি নেসবত ঃ তিনি বলেন, আমাদের বুজর্গগণের তাসাউফে চারটি নেসবত রয়েছে। ১. হজরত খিজির আ.। আল্লাহ্‌তায়ালা যেনো তাঁর এলেম হেকমত আরও বৃদ্ধি করে দেন। ২. শায়েখ জুনায়েদ বাগদাদী র.। মহান আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর ভেদ-রহস্যকে পবিত্রতর করুন। ৩. সুলতানুল আরেফীন শায়েখ বায়েজিদ, যা হজরত আলী রা. থেকে তাঁর নিকটে পৌঁছেছে। ৪. আমিরুল মুমিনীন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.। এজন্য এই তরিকার দরবেশগণকে নিমকে মাশায়েখ বলা হয়। রেসালায়ে ইনসিয়াহ্ পৃষ্ঠা ১৯।

বাণী ঃ তিনি বলেন, কলবের স্থিরতা ও উকুফে আদ্‌দি সম্পর্কে নিজের ইচ্ছায় চোখ বন্ধ করবে না। কেনোনা এটা সৃষ্টজীবের অবগত হওয়ার মাধ্যম। আমীরুল মুমিনীন হজরত ওমর ফারুক রা. একবার এক লোককে ঘাড় নিচু করে বসে থাকতে দেখলেন। বললেন, হে ঘাড়ের পিতা! ঘাড় উঁচু করো। অতঃপর এমনভাবে জিকির করো, যেনো মজলিশের লোক তোমার কাজ সম্পর্কে অবগত হতে না পারে। রেসালায়ে ইনসিয়াহ্ পৃষ্ঠা ২৭।

বাণী ঃ তিনি বলেন, গাফলত দূর হওয়াকে বলে জিকির। যখন গাফলত (অমনোযোগিতা) দূর হয়ে যায়, তখন তুমি নীরব থাকলেও জিকিরকারী।

বাণী ঃ তিনি বলেন, সর্বদা দিলের (কলবের) পর্যবেক্ষণ আবশ্যক। পানাহার, কথা বলা, শ্রবণ করা, চলাফেরায়, ক্রয়-বিক্রয়, ইবাদত, নামাজ, তেলাওয়াত, পড়াশুনা, লেখা, সবক আদায়, ওয়াজ নসিহত ইত্যাদি কাজে কলবের প্রতি সার্বক্ষণিক খেয়াল রাখতে হবে। চোখের পলক পরিমাণ সময়ও আল্লাহ্‌তায়ালার স্মরণ থেকে গাফেল বা অমনোযোগী হওয়া যাবে না। এরকম করলে তোমার মকসুদ হাসিল হবে। কবির ভাষায়— এক পলক পরিমাণ সময়ও ওই বন্ধু থেকে উদাস থেকো না— হয়তো এমন হবে, যখন তিনি তোমাকে অনুগ্রহদৃষ্টি প্রদান করবেন, তুমি তখন বেখবর।

আকাবেরে তরিকত কাদ্দাসাল্লাহু আস্‌রারাহুমগণ বলেন, যে পলক পরিমাণ সময় আল্লাহ্‌তায়ালার জিকির থেকে উদাসীন থাকবে, সে সারা জীবনেও এর ক্ষতিপূরণ করতে পারবে না। বাতেনের প্রতি খেয়াল রাখা খুবই কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার। তবে আল্লাহ্‌তায়ালার করুণাতে ও আল্লাহ্‌র ওলীদের সান্নিধ্য, শিক্ষা-দীক্ষার কারণে শীঘ্রই তা হাসিল হতে পারে। কবির ভাষায়— আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র ওলীদের অনুকম্পা ছাড়া ফেরেশতাসম গুণাধিকারী ব্যক্তিরও আমলনামার তমসা দূর হয় না।

একই যুগে আল্লাহ্‌তায়ালার দুই জন এমন ওলী যাঁরা নিজেদের কাজ যথাযথভাবে আদায় করেন, একে অপরকে ভালোবাসেন, কেউ কাউকে হেয় মনে করেন না, তাঁরা তাঁদের কাজে অটল থাকেন। তাঁদের সোহবত ও সান্নিধ্যে থাকলে অতি দ্রুত মকসুদ পূর্ণ হবে। কামেলে মোকাম্মেল পীর মাশায়েখের একটি তাওয়াজ্জোহ্‌র বরকতে বাতেন জগত এই পরিমাণ পরিষ্কার ও নূরানী হয়, যা বহু রিয়াজত ও সাধনা দ্বারা লাভ করা সম্ভব হয় না। মাওলানা রুমি বলেন— শামসুদ্দিনের এক দৃষ্টিতে তাবরীজ শহরে যে কাজ হয়েছিলো অন্যদের চিল্লাকাশি ও সপ্তাহের পর সপ্তাহ নির্জন অবস্থানেও তা হয়নি। রেসালায়ে ইনসিয়াহ্‌ পৃষ্ঠা ২৫, ২৬।

বাণী ঃ তিনি বলেন, যাঁরা পথপ্রদর্শক এবং তালীম-তালকীন করে থাকেন, তাঁরা হন তিন ধরনের। ১. কামেল (পূর্ণ) ২. মোকাম্মেল (পূর্ণতা প্রদানকারী)। ৩. মোকাল্লিদ (অনুগত)।

মোকাম্মেল তথা পূর্ণতা প্রদানকারীর সংজ্ঞা ঃ হজরত খাজা আলী তিরমিজি কুদ্দিসা সিররুহু তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেন, মোকাম্মেলগণ নবীদের বেলায়েত থেকে চারটি অংশ লাভ করে থাকেন। তাঁরা নূরানী ও নূর বিতরণকারী হয়ে থাকেন। আর কামেল নিজেরা নূরানী বা জ্যোতির অধিকারী কিন্তু অন্যদেরকে নূর প্রদান করতে পারেন না। আর মোকাল্লিদ (অনুগত) ব্যক্তি শুধু শায়েখের অনুকরণ করে থাকেন। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কিছুই করেন না। তবে কামেল (পূর্ণ) ব্যক্তির একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তাঁরা মোকাম্মেল থেকে শিক্ষা লাভ করে থাকেন। অর্থাৎ মোকাম্মেল হওয়ার পথে থাকেন। উল্লেখ্য, মোর্শেদ কুতুব হন অথবা কুতুবের খলিফা হন, তাঁকে সর্বদা জিকিরে লিপ্ত থাকতে হবে, যেভাবে তাঁকে জিকির শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। পূর্ণ সময় জিকিরে মশগুল থাকতে হবে। বিশেষ করে ফজরের পূর্বে এবং এশার পরে।

মাওলানা ইয়াকুব চরখী র. বলেন, হজরত খাজা আমাকে এইমর্মে উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় জিকিরে লিপ্ত থাকবে, তাকে জাকেরীনদের মধ্যে গণ্য করা হবে এবং গাফেলদের দলভূত করা হবে না। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালার বাণী— 'তোমার প্রভুপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশংকচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করিবে এবং তুমি উদাসীন হইবে না'। সূরা আরাফ ২০৫। কতিপয় মুফাস্‌সির বলেন, সকাল-সন্ধ্যা জিকির করা দ্বারা উদ্দেশ্য সার্বক্ষণিক জিকির অর্থাৎ বিরতিহীন জিকির করা। গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন,

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً

(তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদিগের প্রভুপালককে ডাক; তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। সূরা আরাফ আয়াত ৫৫)।

আবু মুসা আশয়ারী রা. বলেন, একবার রসূল স. এর সাথে সাহাবায়ে কেরাম সফরে ছিলেন। একটি উঁচু স্থানে উপনীত হলে সাহাবায়ে কেরাম উচ্চ আওয়াজে তাকবির ও তাহলিল পাঠ করছিলেন। রসূল স. তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রাণের ভয় করো। কেনোনা তোমরা বধির ও অদৃশ্যকে ডাকছো না। বরং তোমরা এমন এক সত্তাকে ডাকছো যিনি সর্বশ্রোতা ও অতিনিকটবর্তী। উলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখগণ এই বিষয়ে একমত যে, জিকরে খফি উত্তম। আরও বলেন, ফেরেশতাগণ জিকরে জলি তথা উঁচু আওয়াজে জিকির করেন না।

ঘটনা ঃ খাজা বাহাউদ্দিন র. বলেন, যখন হজরত আমীর কুলাল র. আমাকে এই মর্মে অনুমতি দিলেন যে, তুরক ও তাজুকে তালাশ করো, যেখানে যা পাও তা হাসিল করো। তখন আমি স্বপ্নে দেখলাম, হাকীম আতা, যিনি তুর্কিস্তানের বড় বুজর্গ ছিলেন, তিনি আমাকে এক দরবেশের হাতে সমর্পণ করলেন। জাগ্রত হওয়ার পরেও সেই দরবেশের আকৃতি আমার স্মরণপটে ভাসতে লাগলো। আমার দাদী ছিলেন অতি পুণ্যবতী। আমি তাঁর কাছে আমার স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন, হে ফরজন্দ! তুর্কিস্তানের মাশায়েখদের থেকে তোমার ফয়েজ লাভ হবে। আমি সর্বদা সেই বুজর্গের সন্ধানে ছিলাম। হঠাৎ এক দিন বোখারার বাজারে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলো। আমি তাঁকে চিনতে পারলাম। তাঁর নাম খলিল। কিন্তু ওই সাক্ষাতে তাঁর সান্নিধ্য লাভ হলো না। আমি বাড়িতে ফিরে এলাম। হঠাৎ একজন এসে

বললেন, খলিল দরবেশ সাহেব তোমাকে খুঁজছিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ কিছু হাদিয়া নিয়ে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমার স্বপ্ন তাঁর কাছে ব্যক্ত করতে ইচ্ছা করলাম। তিনি বললেন, তুমি যা বলতে চাও, তা আমার জানা আছে। তাঁর এ কথায় আমি খুবই প্রভাবিত হলাম। তাঁর সান্নিধ্যে থাকার জন্য আগ্রহান্বিত হলাম। তাঁর মজলিশে আমি অনেক অত্যাশ্চর্য বিষয় প্রকাশিত হতে দেখলাম। কিছুদিন পরে তিনি অন্যত্র সফরে চলে গেলেন। বেশ কিছুদিন পর আমার নিকট এইমর্মে সংবাদ উপনীত হলো যে, দরবেশ খলিল মাওয়ারাউন্নাহারের শাসক হয়েছেন। কিছুদিন পর একটি মোকাদ্দমা মীমাংসার জন্য তাঁর রাজত্বে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলো। সেই মোকাদ্দমা মীমাংসা হলে তাঁর খেদমত ও সোহবতে থাকার সৌভাগ্য লাভ করলাম। তাঁর রাজত্বকালে বড় বড় ঘটনাবলী আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। আমার অবস্থার প্রতি তিনি দয়া প্রদর্শন করেছিলেন। খেদমতের আদব-কায়দা আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই আদব শিক্ষা করে সুলুকের পথে আমার অনেক উপকার হয়েছে। ছয় বছর পর্যন্ত তাঁর খেদমতে ছিলাম। দরবারে শাহী আদব রক্ষা করে চলতাম। আর নিভৃতে ছিলাম তাঁর বিশেষ খাদেম। তিনি প্রকাশ্য দরবারে বিশেষ লোকদের সামনে বলতেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য খেদমত করে, সে সৃষ্টজীবের মধ্যে বুজর্গীর মর্তবা লাভ করবে। তাঁর কথার উদ্দেশ্য আমার জানা ছিলো। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ১২-১৫।

তওবার কারণ ঃ তিনি বলেন, আমার তওবার কারণ নিম্নরূপ—

এক ব্যক্তির সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিলো। একদিন নির্জনে তাঁর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। দু'জনেই আলোচনামগ্ন ছিলাম। হঠাৎ আমার কানে আওয়াজ এলো, হে বাহাউদ্দিন! এখনো কি সময় হয়নি যে, সবকিছু ত্যাগ করে আমার প্রতি মনোযোগী হবে? কবি বলেন— সারা জীবন নিজ খেয়ালের উপর অতিবাহিত করলে, এখন আমার স্মরণ করার সময় এসে গেছে।

এই আওয়াজ আমার জীবনের পরিবর্তন ঘটালো। আমি অস্থির হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। তখন গ্রীষ্মকাল ছিলো। পাশেই একটি নদী ছিলো। আমি সেখানে গোসল করলাম, কাপড় ধৌত করলাম তারপর দুই রাকাত নামাজ আদায় করলাম। সেই সময় থেকেই আকাঙ্ক্ষা ছিলো, সেই নামাজের হাল যদি পুনরায় ফিরে পেতাম। কিন্তু বছরের পর বছর অতিবাহিত হলো, সেই নামাজ আর ভাগ্যে জুটলো না। আনিসুত্ ত্বলিবীন।

বাণী ঃ তিনি বলেন, প্রথম জয্‌বায় (আকর্ষণে) আমাকে বলা হলো, তুমি এই রাস্তায় কীভাবে পথ অতিক্রম করতে চাও। আমি বললাম, আমি যা চাইবো এবং বলবো, তা যেনো হয়। বলা হলো, আমি যা বলবো, তাই করতে হবে। আমি নিবেদন করলাম, এরকম শক্তি আমার নেই। আমি যা বলি তা যদি হয়, তাহলেই আমি এই রাস্তায় পা রাখবো। অন্যথা এই রাস্তা পাড়ি দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। দুই বার এভাবে প্রশ্নোত্তর হলো। এরপর আমাকে আমার নিজের অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া হলো। পনের দিন পর্যন্ত আমার অবস্থা ভালো ছিলো না। আমি শুকিয়ে গেলাম। নিরাশ হওয়ার সময় হুকুম হলো, ঠিক আছে, তুমি যে ভাবে চাও, সেভাবেই হবে। আনিসুত্‌ ত্বলিবীন।

রুটি রান্না না হওয়া ঃ তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতে রসূল স. এর উপর যেমন ঘটেছিলো, আমার ক্ষেত্রেও তেমনটি ঘটেছে। ওই সময় তাঁর ছেলে ইন্তেকাল করেন। তাঁর পবিত্র জবান থেকে বেরিয়ে আসে এই উক্তিটি— রসূল স. একবার সাহাবা কেরামের সাথে তন্দুরে রুটি লাগিয়ে ছিলেন। এরপর চুলার মুখ বন্ধ করা হলো। কিছুক্ষণ পর চুলার মুখ খোলা হলে দেখা গেলো, সবার রুটি ভাজা হয়েছে, কিন্তু রসূল স. এর রুটি রয়েছে কাঁচা। রসূল স. এর মতো আমরাও চুলায় রুটি দিয়েছিলাম। সবার রুটি ভাজা হলো। শুধু আমার রুটি রয়ে গেলো কাঁচা।

গ্রন্থকার বদরউদ্দিন সেরহিন্দী র. বলেন, রসূল স. এর রুটির খামীর কাঁচা থাকার রহস্য হলো, যে রুটিতে রসূল স. এর মোবারক হস্তের স্পর্শ লেগেছে, আগুন তার উপর কীভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে? আর রসূল স. এর অনুসরণের কারণেই হজরত খাজা বাহাউদ্দিন র. থেকেও ওরকম অবস্থা প্রকাশিত হয়েছিলা। রসূল স. এর তোফায়েলে তাঁর এরকম অবস্থাই প্রকাশ পেতো।

ঘটনা ঃ প্রাথমিক অবস্থায় হালের প্রাবল্য, আকর্ষণ ও অস্থিরতার কারণে রাতে বোখারার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘোরাফেরা করতাম এবং বিভিন্ন মাজারে যেতাম। এক রাতে তিনটি বরকতপূর্ণ মাজারে গেলাম। যে মাজারেই যেতাম, দেখতাম সেখানে প্রদীপ জ্বলছে। সেগুলো তেলে ভর্তি অথচ অনুজ্জ্বল। প্রদীপগুলোকে সামান্য নাড়াচাড়া করলাম, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো অধিকতর প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। রাতের প্রথমাংশে হজরত আবদুল ওয়ায়িসি কুদ্দিসা সিররুহুর মাজারে পৌঁছলাম। সেখান থেকে ইঙ্গিত করা

হলো, মাহমুদ আঞ্জীর ফাগনবী কুদ্দিসা সিররুহুর মাজারে যাওয়া উচিত। আমি সেখানে পৌঁছলে আমার কোমরে দুটি তরবারী বেঁধে দেওয়া হলো এবং আমাকে বসানো হলো একটি ঘোড়ার উপর। ঘোড়ার গতি খাজা মাজদাজিন কুদ্দিসা সিররুহুর মাজারের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। শেষ রাতে আমি ওই বুজর্গের মাজারে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানেও পূর্বের মাজারগুলোর মতো প্রদীপ দেখতে পেলাম। আমি বাতির সলতে উঁচু করে ধরলাম এবং কেবলার দিকে মুখ করে বসে পড়লাম। বেখবর হয়ে গেলাম। ওই আত্মহারা অবস্থায় কেবলার দিকের প্রাচীর বিদীর্ণ দেখতে পেলাম। একটি বড় সিংহাসন দৃষ্টিগোচর হলো। সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট রয়েছেন এক বুজর্গ। তাঁর সামনে টানানো রয়েছে একটি সবুজ পর্দা। সেই সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বে রয়েছেন একদল লোক। তাঁদের মধ্যে আমি বাবা সাম্মাসি কুদ্দিসা সিররুহুকে চিনতে পারলাম। আমি বুঝতে পারলাম, এ দলের সবাই পরলোকগমন করেছেন।

আমার অন্তরে প্রশ্ন উত্থিত হলো, এটা কোন্ বুজর্গগণের জামাত? তাঁদের একজন বললেন, সিংহাসনে উপবিষ্ট ওই বুজর্গ খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানী, আর ওই জামাত তাঁর খলিফা ও ভক্তবৃন্দের। তাঁদের নাম আমাকে জানানো হলো। বলা হলো, ইনি হলেন খাজা মোহাম্মদ সিদ্দিক র., ইনি আউলিয়া কবীর, ইনি খাজা আরেফ রেওগাড়ী, ইনি খাজা মাহমুদ আঞ্জীর ফাগনবী, ইনি খাজা রামেতিনি। যখন খাজা মোহাম্মদ বাবা সাম্মাসী পর্যন্ত পৌঁছলাম তখন বলা হলো, তুমি তাঁকে তাঁর জীবদ্দশায় দেখেছো। ইনিই তোমার পীর। তিনি তোমাকে তাঁর টুপি দান করেছিলেন। আমি বললাম, আমি তাঁকে চিনি। তবে টুপির কথা আমার মনে নেই। জানিনা কোথায় রেখেছি। তিনি বললেন, টুপি তোমার ঘরেই আছে। আর শোনো, তোমাকে এমন বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে কোনো বিপদ আপদ এলে তোমার বরকতে তা দূর হয়ে যাবে। এরপর ওই জামাত আমাকে বললেন, মনোযোগ দিয়ে শোনো। খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানী তোমাকে এমন নসিহত করবেন, যেগুলো সুলুকের পথে তোমার কাজে আসবে। আমি বললাম, আমি হজরতকে সালাম দিতে চাই। একথার পর সবুজ পর্দা সরিয়ে দেওয়া হলো। আমি খাজা সাহেবকে সালাম প্রদান করলাম। হজরত খাজা দুটি উপদেশ দিলেন— যেগুলো নতুন, পুরাতন সকল সালেকের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বললেন,

তুমি প্রদীপগুলো তেলপরিপূর্ণ দেখেছো। এর অর্থ— তোমার মধ্যে এই তরিকা অর্জনের যোগ্যতা রয়েছে। তবে যোগ্যতা অনুযায়ী আমল করতে হবে। তাহলে প্রদীপ সুউজ্জ্বল হবে এবং রহস্যসমূহ প্রকাশ পাবে। আর দৃঢ়তার সাথে কাজ কোরো। তাহলে উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। দ্বিতীয় ইশারা হলো, তিনি খুবই তাকিদ করে বললেন, কোনো অবস্থাতেই শরীয়ত ও সঠিক পথ থেকে পা বাইরে ফেলবে না। আজিমত ও সুন্নতের উপর আমল করবে। রুখসত ও বেদাত থেকে দূরে থাকবে। হাদিসকে সর্বদা রাহবার বানাবে অর্থাৎ হাদিসের নির্দেশনা মেনে চলবে। রসূল স. এর আদর্শ ও সাহাবা কেরামের নিদর্শনকে অনুসন্ধান করবে। এ সকল কথা শেষ হওয়ার পর খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানীর খলিফাগণ আমাকে বললেন, এ সকল কাজ বাস্তবায়নের জন্য আপনি মাওলানা শামসুদ্দিন র. এর কাছে যান। তাঁকে বলুন, অমুক তুর্কির দাবি সিকা (ভিস্তিওয়ালা) অস্বীকার করছে। আর সত্য তুর্কির পক্ষেই। কিন্তু আপনি সিকার পক্ষপাতিত্ব করছেন। তবে সিকা যদি তুর্কির দাবি সত্য হওয়াকে অস্বীকার করে, তাহলে আপনি সিকাকে বলবেন, হে সিকা! তাশিন্না— একথা বললেই সে বুঝতে পারবে। দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, সিকা এক নারীর সাথে ব্যভিচার করেছিলো। ওই নারী গর্ভবতী হলে সে তার গর্ভপাত ঘটায় এবং শিশুটিকে অমুক স্থানে দাফন করে। এই সংবাদটি পৌঁছানোর পর দ্বিতীয় দিন সকালে তিনজন রাখালকে সঙ্গে নিয়ে দাগিস্তানের পথ ধরে নাসাফ শহরের দিকে যাত্রা করবেন। পেশতা নগরীতে পৌঁছলে এক বৃদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ হবে। তিনি আপনাকে একটি গরম রুটি দিবেন। আপনি তা গ্রহণ করবেন, কিন্তু তাঁর সাথে কোনো কথা বলবেন না। এরপর এক কাফেলার সাক্ষাৎ পাবেন। কাফেলার এক সওয়ারীর সাথে দেখা হলে তাকে নসিহত করবেন। সে আপনার হাতে তওবা করবে। আর হজরতের টুপি খুঁজে বের করে নিয়ে হজরত আমীর কুলাল র. এর দরবারে উপস্থিত হবেন। এরপর আমাকে সচেতন করা হলো। আমি বাড়ি ফিরে এলাম। ঘরের সবাইকে টুপির কথা জিজ্ঞেস করলাম। তারা বললো, টুপিটা অমুক স্থানে রয়েছে। ওই বরকতময় টুপির উপর আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলেই আমার অবস্থার পরিবর্তন হলো। আমি অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলাম। ফজর নামাজ হজরত মাওলানা শামসুদ্দিন র. এর মসজিদে আদায় করে তাঁর কাছে সকল ঘটনা খুলে বললাম। তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন। সিকা সেখানে উপস্থিত ছিলো। সে তুর্কির দাবি

অস্বীকার করলো। আমি সিকাকে বললাম, আমার কাছে প্রমাণ আছে, আর তা হলো তুমি সিকায়ে তাশান্না। ঊর্ধ্বজগতে তোমার কোনো অংশ নেই। এরপর আমি সিকার ব্যভিচার, গর্ভপাত ঘটানো এবং শিশুকে দাফন করার ঘটনা খুলে বললাম। মাওলানা সাহেব ও মসজিদে উপস্থিত জনতা উক্ত স্থানে পৌঁছলেন ও ওই ঘটনার আলামত প্রত্যক্ষ করলেন। সিকা নিজের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করলো।

দ্বিতীয় দিনে ইশরাকের সময় তিন জন রাখালকে নিয়ে নাসাফের দিকে যাত্রা করলাম। যাত্রার পূর্বে মাওলানা সাহেব আমাকে তাঁর কাছে বসিয়ে অনেক তাওয়াজ্জোহ্ প্রদান করলেন। বললেন, তোমার অন্তরে তলব তথা অনুসন্ধানের বেদনা জেগে উঠেছে। এই দরদের ঔষধ আমার কাছে আছে। তুমি এখানে থেকে যাও। আমি তোমার তরবিয়ত করবো। মাওলানা সাহেবের এই ইচ্ছার উত্তরে আমার মুখ থেকে বের হলো— আমি তো অন্যের সন্তান। এমতো অবস্থা তো নিশ্চয় শোভন নয়, যেমন আপনি স্তন আমার মুখে দিলেন, অথচ আমি তা সরিয়ে দিলাম। একথা শুনে তিনি নীরবতা অবলম্বন করলেন। যাত্রার অনুমতি প্রদান করলেন।

মদ্যপের তওবা ঃ সেদিন আমার কোমর শক্তভাবে বাঁধলাম। দুইজন লোককে বললাম, দুই পাশ থেকে আমার কোমর শক্তভাবে বেঁধে দাও। এরপর আমি বিদায় নিলাম। পেশতা নগরী পার হওয়ার পর একজন দরবেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে একটি গরম রুটি দিলেন। আমি তা গ্রহণ করলাম। তাঁর সাথে বাক্যবিনিময় করলাম না। এরপর এক কাফেলার সাক্ষাৎ হলো। কাফেলার এক লোক আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি বললাম, আবনাকিত থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেখান থেকে কখন রওয়ানা হয়েছেন। আমি বললাম, সূর্যোদয়ের সময়। এখন হলো চাশতের সময়। তারা বিস্মিত হলো। বললো, আমরা আগের দিন সন্ধ্যায় রওয়ানা হয়েছি। আমি সামনে অগ্রসর হলে এক সওয়ারী আমার কাছে এসে আমাকে সালাম দিলো এবং বললো, আপনি কে? আপনাকে দেখে আমার ভয় হচ্ছে। আমি বললাম, আমি ওই ব্যক্তি, যার হাতে তোমাকে তওবা করতে হবে। একথা শোনার সাথে সাথে সে ঘোড়া থেকে নেমে এলো এবং বায়াত গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করলো। সেই সওয়ারী নিজের সাথে শরাব রাখতো। বায়াত হওয়ার পর সে তার সাথের সকল শরাব ফেলে দিলো।

আমীর কুলাল র. এর খেদমতে ঃ আমি সেখান থেকে হজরত খাজা আমীর কুলাল র. এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তাঁর সাক্ষাৎ পেয়ে ধন্য হলাম। বরকতময় টুপি তাঁর বরাবরে পেশ করলাম। আমীর কুলাল র. অনেকক্ষণ তাওয়াজ্জোহ্ প্রদানের পর বললেন, এই টুপি হজরত আজিজানের। তিনি আরও বললেন, এই টুপিকে তুমি দুটি পর্দার মধ্যে রেখে হেফাজত করবে। আমি নীরব সম্মতি জানালাম।

এরপর সাইয়্যেদ আমীর কুলাল র. আমাকে জিকরে খফি ও নফি এসবাতের জিকির শিক্ষা দিলেন। আমি তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তা পালন করতে লাগলাম। স্থায়ীভাবে জিকরে জলি বর্জন করলাম।

মনজিল ও মাকামসমূহ অতিক্রম করার সময় দুই বার মনসুর হাল্লাজের অবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছিলা। মনসুরের মুখ দিয়ে যা বের হয়েছিলো, তা আমার মুখ দিয়ে বের হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। সেখানে একটি ঘর ছিলো। আমি দুইবার নিজেকে সেই ঘরের নিকটে নিয়ে গেলাম এবং বললাম, তোমার স্থান এই ঘরেই। আল্লাহ্র বিশেষ অনুকম্পায় সেই মঞ্জিল পাড়ি দিলাম।

বাণী ঃ তিনি বলেন, যদি ওই সময় পৃথিবীতে খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানীর কোনো খলিফা বিদ্যমান থাকতেন, তাহলে মনসুর হাল্লাজের সেই মর্মান্তিক পরিণতির ঘটনাটি ঘটতো না। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ১৮-২১।

ঘটনা ঃ তিনি বলেন, আমি যওক, শওকের প্রাবল্যের সময় একদিন বোখারা থেকে নাসাফের দিকে যাচ্ছিলাম। উদ্দেশ্য ছিলো, হজরত সাইয়্যেদ আমির কুলাল র. এর সান্নিধ্যধন্য হওয়া। যখন জুগরাতির মেহমানখানায় পৌঁছলাম, তখন হজরত খিজির আ. এক আরোহীর বেশে কাঠুরিয়াদের মতো একটি বড় ছড়ি হাতে নিয়ে আমার সামনে দাঁড়ালেন এবং সেই ছড়ি দিয়ে আমাকে আঘাত করলেন। তুর্কি ভাষায় বললেন, ঘোড়া দেখেছো? আমি তাঁর কথার জবাব দিলাম না। অথচ ইতোপূর্বে তাঁর সাথে আমার কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছে। পরে আমি তাঁকে বললাম, আমি আপনাকে চিনি। আপনি খিজির। এরপর তিনি কাবাবিলের সরাইখানা পর্যন্ত আমার পশ্চাদনুসরণ করলেন। বললেন, এসো, আমরা কিছু সময়ের জন্য একত্রে বসি। আমি তাঁর কথায় সাড়া দিলাম না। এরপর আমি সাইয়্যেদ আমির কুলাল কুদ্দিসা সিররুহুর খেদমতে পৌঁছলাম। তিনি

আমাকে দেখেই বললেন, পথে হজরত খিজিরের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিলো। তাঁর প্রতি মনোযোগী হওনি কেনো? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। আমি তো কেবল আপনার প্রতি মনোযোগী ছিলাম।

আদব ঃ তিনি বলেন, আমি সুলতানুল আরেফীন হজরত বায়েজিদ বোস্তামীর মাকাম ভ্রমণ করেছি। তাঁর ভ্রমণের শেষ সীমানা পর্যন্ত পৌঁছেছি। শায়েখ জুনায়েদ, শায়েখ শিবলি ও শায়েখ মনসুর হাল্লাজের মাকামে ভ্রমণ করেছি। এই সকল বুজর্গ যে মাকামে উপনীত হয়েছিলেন, আমিও সেই মাকামে উপনীত হয়েছিলাম। এমনকি মহান এক বুজর্গের মাকামে পৌঁছলে আমি বুঝতে পারলাম, এটা প্রিয় নবী মোহাম্মদ স. এর মাকাম। আমি বেআদবী করিনি। নেহায়েত আদব ও তাজিমের সাথে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিলাম। ছিলাম অভিপ্রায়হীন নীরব। শায়েখ বায়েজিদ র. এই মাকামে উপনীত হয়ে রসূল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে ভ্রমণ করতে চাইলেন। এই অভিলাষপ্রবণতা ছিলো ওই মাকামের আদবের অননুকূল।

নৈকট্যের পথ ঃ তিনি বলেন, অবশ্যই নামাজ, রোজা, রেয়াজত, মোজাহাদা আল্লাহ্তায়ালা সমীপে উপনীত হওয়ার মাধ্যম। কিন্তু আমাদের নিকট স্বীয় অস্তিত্ব বিলীন করা এবং স্বেচ্ছাচারিতা বর্জন করা সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী পথ। এটাই অধিক প্রয়োজন। তবে স্বেচ্ছাচারিতা বর্জন ও নিজের আমলের স্বল্পতা ও ত্রুটি অবলোকন করা ব্যতীত প্রেমের পথের আবরণ উন্মুক্ত হয় না। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৪৯।

রহমতপ্রাপ্ত উম্মত ঃ তিনি বলেন, রসূল স. এরশাদ করেছেন আমার উম্মতের অংশে জাহান্নাম এমন, যেমন হজরত ইব্রাহীম আ. এর অংশে নমরুদের আগুন। রসূল স. আরও বলেন, আমার উম্মত পথভ্রষ্টতার উপর একত্র হবে না। বোখারী, মুসলিম। এখানে উম্মত বলতে অনুসারী উম্মত উদ্দেশ্য। উম্মতে দাওয়াত ও উম্মতে এযাবাত নয়। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৫৫।

ফকিরী ঃ তিনি বলেন, হাদিস শরীফে এসেছে, ধৈর্যশীল ফকির কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

ফকির দুই প্রকার ঃ ১. ইচ্ছাধীন ফকির। ২. অনিচ্ছাধীন ফকির। দ্বিতীয় প্রকার প্রথম প্রকার থেকে উত্তম। এরা আল্লাহ্র মনোনীত বান্দা। হাদিসে কুদসীতে এসেছে, যে আমার জিকির করে আমি তার সহচর সঙ্গী হয়ে যাই। এর দ্বারা জিকরে খফি তথা আহলে বাতেনদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৫৫।

বেলায়েত ঃ তিনি বলেন, বেলায়েত অতি উচ্চ নেয়ামত। ওলীর উচিত নিজেকে ওলী মনে করা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। আল্লাহ্‌র অনুকম্পায় ওলী নিরাপদে থাকেন। আল্লাহ্‌পাক তাঁকে তাঁর অবস্থার উপরে রাখেন না। মানবিক চাহিদা থেকে তাঁকে সংরক্ষণ করা হয়। কারামত বা আশ্চর্য বিষয় প্রকাশের উপর নির্ভর করবে না। মুয়ামালায় (লেনদেন-চলাফেরা) ইস্তেকামাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

আল্লাহ্‌র ওলীগণ বলেন, তুমি ইস্তেকামাত (সিরাতে মুস্তাকিমের) আকাঙ্ক্ষী হও, কারামতের জন্য লালায়িত হয়ো না। তোমার প্রভুপালক তোমার কাছে ইস্তেকামাত চান, আর তোমার নফস চায় কারামত।

বুজর্গানে দ্বীন বলেন, যদি ওলী কোনো বাগান দিয়ে অতিক্রম করে, আর গাছের প্রতিটি পাতা থেকে ধ্বনিত হয়— হে আল্লাহ্‌র ওলী! তথাপিও প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে সেদিকে মনোযোগী হবে না। বরং প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদত তথা আল্লাহ্‌র স্মরণ, বিনয়, নম্রতা ও কোমলতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় থাকবে। রসূল স. বলেন, যখন তোমার উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামত-সম্মান পূর্ণ হবে, তখন তোমার থেকে সেই পরিমাণ বন্দেগী, কৃতজ্ঞতা, বিনয়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। এই কারণে রসূল স. বলেন, আমি কি আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞবান্দা হবো না?

তরিকায়ে নক্‌শবন্দিয়া ঃ তিনি বলেন, আমাদের তরিকা দুর্লভ সংযমশীলতা ও শক্ত হাতলবিশিষ্ট। যদি রসূল স. এর অনুসরণ ও সাহাবায়ে কেরামের অনুকরণ করা হয়, তাহলে এই পথই আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের মাকামে পৌঁছে দিবে। শেষ পর্যন্ত আমরা মহান আল্লাহ্‌র অনুকম্পা পরিদর্শন করেছি— এটা আমলের আধিক্যের কারণে নয়, আল্লাহ্‌র করুণাতে। আমাদের তরিকায় অল্প আমলে অনেক সফলতা রয়েছে। তবে এ পথে অনুসরণ বা এত্তেবার প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আনিসুত্‌ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭।

বাণী ঃ তিনি বলেন, আমাদের তরিকা থেকে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে তাদের দ্বীন বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। আনিসুত্‌ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৫৮।

বাণী ঃ তিনি বলেন, সোহবত হাসিলই আমাদের তরিকা। মিলে মিশে কাজ করা অর্থাৎ শায়েখের মাঝে বিলিন হয়ে কাজ করা। কেনোনা নিভৃতির মধ্যে রয়েছে প্রসিদ্ধি। আর প্রসিদ্ধির মধ্যেই রয়েছে বিপদ। উত্তম হলো খায়রিয়তে জমিয়তে অর্থাৎ কল্যাণকর কাজে দিল্‌ বা অন্তর স্থির রাখা বা

আল্লাহ্‌র স্মরণ ব্যতীত সকল কিছু ভুলে যাওয়া। 'সোহবতে জমিয়ত' তথা একে অন্যের প্রতি বিলীন হয়ে যাওয়াই সান্নিধ্য বা সোহবত। আনিসুত্‌ ত্বলিবীন ৫৮।

বাণী ঃ তিনি বলেন, আমাদের তরিকায় এটাও আছে যে, সালেকের জন্য সব সময় এই বিষয়টি জানা উচিত নয় যে, সে কোন্‌ মাকামে রয়েছে। আর এই অবগতি তার চলার পথের প্রতিবন্ধক হয়ে যেতে পারে। আনিসুত্‌ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৫৮।

বাণী ঃ পীরের উচিত মুরিদের অতীত বর্তমান অবস্থা জেনে তরবিয়ত বা দীক্ষা প্রদান করা। আর মুরিদের জন্য শর্ত হলো, যখন সে কোনো পীরের হাতে বায়াত হবে, তখন তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা ও সোহবত বা সান্নিধ্যে থাকা। এরপর সে অতীত জীবনকে বর্তমানের সাথে মিলাবে। যদি ত্রুটি কম হয় ও গুণ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ তাঁর সোহবতে আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয় তাহলে তাঁর সোহবতকে অবশ্য কর্তব্য মনে করবে। আনিসুত্‌ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৫৯।

বাণী ঃ সত্য পথে শয়তানের ধোকা ও নফসের কুমন্ত্রণা প্রতিহত করার ব্যাপারে সালেকীনের পদক্ষেপ বিভিন্ন রকমের হয়। কেউ কেউ এমন আছেন যে, নফস ও শয়তান তার হৃদয়ে ক্রিয়া করার পূর্বেই সে তাকে দেখে ফেলে, বাধা দেয় ও প্রতিহত করে। আবার কেউ কুমন্ত্রণা তার হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ার পূর্বেই তা প্রতিহত করে। এটা ভালো নয়। তবে যদি এই কুমন্ত্রণা উৎপত্তির কারণ উপলব্ধি করে তা প্রতিহত করার শক্তি অর্জন করতে পারে তবে সেটাই উত্তম। আর কুমন্ত্রণা উপলব্ধি করা— অবস্থার পরিবর্তন সাধন, এক বৈশিষ্ট্য থেকে অন্য বৈশিষ্ট্যে গমন খুবই কঠিন কাজ। আনিসুত্‌ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৬১।

মোরাকাবা, মোশাহাদা ও মোহাসাবা ঃ যে পথে সাধকেরা আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করে থাকেন, অন্যরা তা থেকে বঞ্চিত। এর তিনটি পদ্ধতি— ১. মোরাকাবা ২. মোশাহাদা ৩. মোহাসাবা।

মোরাকাবা হলো মাখলুকের দর্শন ভুলে গিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।

প্রতিনিয়ত মোরাকাবার হালতে থাকা কঠিন কাজ। এই জামাতের অল্পসংখ্যক লোক এটা অর্জন করতে পেরেছে। আমি এই পথ প্রাপ্তির পদ্ধতি উপলব্ধি করতে পেরেছি। আর তা হলো নফসের বিরোধিতা করা ও সুন্নতের অনুসরণ।

মোশাহাদা ও ইরাদাত ঃ অদৃশ্যের বিষয় চাক্ষুষ দর্শন করার নাম মোশাহাদা, যা সালেকের দিলে অবতীর্ণ হয়। আর যা অতি দ্রুত অতিক্রান্ত হয়, তা স্থির হয় না বলে উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু এই গুণটি আমার হালে পরিণত হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে আমি কব্জ (আত্মিক সংকোচন) ও বস্ত (আত্মিক প্রসারণ) এর পরিচয় লাভ করেছি। কবজের অবস্থায় সিফাতে জালাল মোশাহাদা করেছি, আর বসতের অবস্থায় উপলব্ধি করেছি সিফাতে জামালকে ।

মোহাসাবা ঃ যা কিছু আমাদের উপর অতিবাহিত হচ্ছে, প্রতিটি মুহূর্ত যেভাবে অতিক্রম করছি তার হিশাব রাখার নাম মোহাসাবা। যদি ক্ষতিকারক কিছু দেখতে পাই তা থেকে বেঁচে থাকি এবং নতুনভাবে কাজ করতে থাকি। উত্তম কাজ দেখতে পেলে কৃতজ্ঞতার সাথে তা করতে থাকি। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৬২।

খাজার তাওয়াজ্জোহ্ ঃ খাজা আলাউদ্দিন আত্তার কাদ্দাসাল্লাহু আসরারাহুম বলেন, হজরত খাজার তওয়াজ্জোহ্ দ্বারা মুরিদগণের অবস্থা এমন হয় যে, আমরা প্রথম কদম রেখেই মোরাকাবা দ্বারা উপকৃত হই। যখন রসূল স. এর তাওয়াজ্জোহ্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন ফানার মাকামে উপনীত হই। তখন সহজ ও স্বাভাবিকভাবে হকের সাথে ফানা ও বাকা হাসিল হয়ে যায়। হজরত খাজা বলেন, আমরা শুধু দৌলত লাভের মাধ্যম হয়ে থাকি। আমাদের থেকে পৃথক হয়ে প্রকৃত উদ্দেশ্যের সাথে মিলিত হও। এই পথের মনীষীদের নিয়ম এরকম— তাঁরা এই পথের পথিকদেরকে তরিকতের দোলনায় শুইয়ে দিয়ে তরবিয়তের দুগ্ধ পান করান। এভাবে এক পর্যায়ে তারা আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন। তখন দুগ্ধপানপর্ব শেষ হয়ে যায়। তাদেরকে আল্লাহ্র হাতে সম্পূর্ণ ন্যস্ত করা হয়, যাতে তাঁরা পীর সাহেবের মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি আল্লাহ্ থেকে ফয়েজ লাভ করতে পারেন। আনিসুত্ ত্বলিবীন ৬২।

বাণী ঃ তিনি বলেন, ইবাদত-বন্দেগীতে স্বীয় ব্যক্তিত্ব তলব করা হয়। আর উবুদিয়াত তথা দাসত্বে স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বকে বিলীন করে দিতে হয়। যতোক্ষণ মুরিদের মধ্যে ব্যক্তিত্ববোধ অবশিষ্ট থাকে, ততোক্ষণ কোনো আমল ফলদায়ক হয় না। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৬৩।

বাণী ঃ তুমি আবদালের মাকাম হাসিল করতে চাইলে তোমার অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। এখানে নফসের বিরোধিতা ও কুপ্রবৃত্তি বর্জনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৬৩-৬৪।

আরেফের তাওয়াজ্জোহ্ ঃ তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে চিনতে পেরেছে, তার কাছে কোনো কিছু গোপন থাকে না। অর্থাৎ সে যে দিকে মনোনিবেশ করবে, সে দিক তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৬৩-৬৪।

আয়নাওয়ালা ঃ অন্যান্য শায়েখদের আয়নার দুটি দিক থাকে, আর আমাদের আয়নার রয়েছে ছয়টি দিক। তিনি আরও বলেন, চল্লিশ বছর যাবত আমরা আয়নাওয়ালা। আমাদের আমিত্বের আয়না কখনো ভুল করে না। এই কথার দ্বারা ওই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, আউলিয়া কেরাম যা প্রত্যক্ষ করেন, তা নূরে ফেরাসাত দ্বারা করে থাকেন। যা আল্লাহ্প্রদত্ত তা নিশ্চয়ই সত্য ও সঠিক।

ভ্রমণ ঃ শায়েখ আবদুল কুদ্দুস র. বলেন, হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দ র. এর ভ্রমণ আসমান ও জমিনের সকল স্তরে বিরাজমান ছিলো। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৬৪।

আরেফগণের দৃষ্টি ঃ তিনি বলেন, হজরত আজিজান কুদ্দিসা সিররুহু বলেন, আমাদের দৃষ্টিতে এই দুনিয়া দস্তরখানার মতো। আর আমরা বলি নখের মতো। কাজেই জমিনের কোনো বস্তু তাদের দৃষ্টির আড়ালে নয়। আর হজরত আজিজান কুদ্দিসা সিররুহু সেই বাণী উচ্চারণের সময় দস্ত রখানায় ছিলেন।

শিরিক ঃ তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিজের নিরাপত্তাকে আল্লাহ্র কাছে অর্পণ করেছে, তার জন্য আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে কোনো কিছু চাওয়া শিরিক। এই শিরিক সাধারণ মানুষের জন্য ক্ষমা করা হবে, কিন্তু বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য ক্ষমা করা হবে না।

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্নির্ভরতা ঃ তিনি বলেন, তাওয়াক্কুলকারীদের উচিত নিজেকে তাওয়াক্কুলকারীদের মধ্যে গণ্য না করা। নিজের তাওয়াক্কুলকে উপকরণের ব্যবহারের মধ্যে গোপন করা। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৫৪।

তিনি বলেন, আল্লাহ্তায়ালা আমাকে দুনিয়ার অনিষ্ট থেকে লোকদেরকে বাঁচানোর জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু লোকজন আমার কাছে দুনিয়ার উন্নতির জন্য আসে। তিনি আরও বলেন, যদি কোনো অজুদ (অস্তিত্ব) আমার অজুদ থেকে অধিকতর গোপন হতো, তাহলে অভাবের খাজানা (ধনরত্ন) এর মধ্যে স্থাপন করা যেতো। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৫৪।

সোহ্বতের ফয়েজ ঃ তিনি বলেন, আল্লাহ্র ওলীগণ সৃষ্টজীবের সাথে সম্পর্ক এজন্য রাখতে বলেন, যাতে তারা আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হয়। অথবা কোনো ওলীর সোহবত লাভ হয়। কেনোনা কোনো ওলী এমন নন, যার উপর আল্লাহ্র অনুকম্পার দৃষ্টি পতিত না হয়, সেই ওলী বিষয়টি অবগত হন বা না হন। যখন কোনো লোক আল্লাহ্র কোনো ওলীর সাথে মিলিত হয়, তখন আল্লাহ্র কৃপাদৃষ্টি তার উপর পতিত হয়।

কবির ভাষায়—

মকসুদ অন্বেষী হাজার বার শত্রুর জন্য দস্তরখান বিছিয়ে দেয়, এই আশায় যে, হয়তো কোনো বন্ধু তাতে অংশ গ্রহণ করবে।

বাণী ঃ তিনি বলেন, তোমরা প্রদীপের আলোর মতো হয়ো, প্রদীপের মতো হয়ো না। কারণ প্রদীপ অন্যকে আলো দেয়, কিন্তু নিজে থাকে অন্ধকারে। তোমরা এমন হয়ো না। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৬৫।

খাজার সুপারিশ ঃ তিনি বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি আমাদের জুতা এগিয়ে দেয়, তবে আমি তার জন্যও সুপারিশ করবো। তিনি বলেন, প্রথমে খারাপ রিক্তহস্ত লোকদেরকে আসল হালাতে আনতে চেষ্টা-সাধনা করো। এরপর কলবের সংশোধনের চেষ্টা করো। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৬৬। তিনি আরও বলেন, এই রাস্তায় অহংকারীদের দ্বারা কাজ করানো খুবই কঠিন।

কবির ভাষায়—

যদিও তোমার ও আল্লাহ্র মধ্যে রয়েছে অনেক পর্দা, তথাপিও সেগুলো তোমার আত্মঅহমিকা থেকে বড় নয়। তিনি বলেন, ফকিরের উচিত যা কিছু বলবে, তা হৃদয়ের ব্যথা-ব্যকুলতা থেকে বলবে। যদি হৃদয়ের দরদ ছাড়া বলে, তবে তার উপকার থেকে বঞ্চিত থাকবে।

বাণী ঃ তিনি বলেন, এটা নিশ্চিত নয় যে, যে ব্যক্তি দৌড়ালো সে আল্লাহ্কে পেয়ে গেলো। কিন্তু আল্লাহ্কে পেতে গেলে তাকে দৌড়াতে হবেই। এখানে দৌড়ানো অর্থ সর্বদা তাঁর পথে চেষ্টা-সাধনা করা।

বাণী ঃ তিনি বলেন, আল্লাহ্র ওলীদেরকে ভেদ-রহস্য সম্পর্কে অবগত করানো হয়। কিন্তু তাঁরা আল্লাহ্র নির্দেশ ছাড়া তা প্রকাশ করেন না। যিনি ভেদ সম্পর্কে অবগত তিনি তা গোপন রাখেন। আর যে অবগত নয়, সে বাচালতা করে। ভেদ বা রহস্য গোপন রাখা নেককারগণের পদ্ধতি। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৬৭।

তিনি বলেন, রসূল স. এর দোয়ার বরকতে (পাপের কারণে) বাইরের রূপ পরিবর্তন হয় না, কিন্তু হৃদয় বিকারগ্রস্ত হয়।

কবিতা ঃ হে জ্ঞানীগণ! এই উম্মতের চেহারা পরিবর্তিত হবে না কিন্তু হৃদয় পরিবর্তিত হবে। তাই এটাকে (কলবকে) হেফাজত করো।

বাণী ঃ তিনি বলেন, আমাদের হৃদয়ের অবস্থা, আমল যা কিছু প্রকাশিত হয়, সেগুলোতে আমাদের কোনো দখল নেই। হয়তো এলহাম দ্বারা বা অন্য কোনো উপায়ে তা জানানো হয়।

বাণী ঃ তিনি বলেন, প্রত্যেক কাজে বিষয়ের বিশুদ্ধতা আবশ্যক। আর নিয়ত আল্লাহ্তায়ালার অনুকম্পাসমূহের মধ্যে একটি। নিয়ত এমন বিষয়, যা বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়। এক বুজর্গ হজরত হাসান বসরি র. এর নামাজে জানাযায় উপস্থিত হননি। তিনি বলেন, আমি আমার নিয়তকে উপস্থিত করতে পরিনি। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৬৭।

বাণী ঃ তিনি বলেন, হককে বাতিল থেকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে মানতেক তথা যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা করা জায়েয। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৬৮।

বাণী ঃ যে ব্যক্তির যোগ্যতার হিরকখণ্ড মন্দসান্নিধ্যের কারণে বিনষ্ট হয়েছে, তার সংশোধন কঠিন ব্যাপার। তবে আল্লাহ্র ওলীদের সোহবতে তার সাফল্য আসতে পারে।

কবির ভাষায়—

আল্লাহ্র মহব্বতে মগ্ন ব্যক্তির সান্নিধ্য ব্যতীত কোনো কিছু পছন্দ কোরো না। হৃদয়ে অযোগ্য লোকদের সাথে সাক্ষাতের বাসনা স্থান দিয়ো না। প্রত্যেকেই তোমাদেরকে নিজেদের দিকে আহ্বান করে। পেঁচা পাখি বিরান প্রান্তরের দিকে, আর তোতা পাখি খাঁচার দিকে।

বাণী ঃ ইচ্ছার অবশিষ্ট থাকার মধ্যেও রয়েছে বৃহৎ সৌভাগ্য। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির বিপরীতে কোনো কাজ সংঘটিত হলে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে। তওবা করবে। আর যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অনুযায়ী কোনো কাজে লিপ্ত হতে পারো, তবে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করবে। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৬৮।

বাণী ঃ হুজুরী দিলে অনুপস্থিত থাকা হুজুরী দিল্ ব্যতীত উপস্থিত থাকার চেয়ে উত্তম। অর্থাৎ মানসিক বা আন্তরিক উপস্থিতি শারীরিক উপস্থিতির চেয়ে উত্তম।

হজরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ স. একদিন বললেন, হে আবু হুরায়রা! বিলম্বে সাক্ষাৎ করো অথবা একদিন পর পর সাক্ষাৎ করো— এতে করে মহব্বতে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাবে। হজরত আবু হুরায়রা রা. উস্তুনে হান্নানা স্তম্ভের পিছনে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনার থেকে পৃথক হওয়ার শক্তি আমার নেই। হজরত আবু হুরায়রা রা. যদিও নিরেট ভালোবাসার জন্যই একথা বলেছেন, তথাপি যদি তিনি রসূলের নির্দেশ প্রতিপালন করতেন, তাহলে তা হতো উত্তমতর। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৬৯।

বাণী ঃ তিনি বলেন, যদি তালেব মোর্শেদের কাজকে কঠিন মনে করে তবে তার উচিত হবে যথাসম্ভব ধৈর্যধারণ করা। বিশ্বাসে ও ভালোবাসায় যেনো সংশয় না আসে। হতে পারে এর ভেদ-রহস্য পরে প্রকাশিত হবে। আর তালেব নতুন হলে ও ধৈর্যধারণের শক্তি-সামর্থ্য তার না থাকলে শায়েখকে জিজ্ঞেস করতে পারে। নতুন অবস্থায় জিজ্ঞেস করা জায়েয আছে। কিন্তু মধ্যম অবস্থায় প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। কাজেই সে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকবে। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৬৯।

কারামত ১ ঃ একবার হজরত খাজা নক্শবন্দ র. এর কাছে কারামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, আমার কারামত খুবই কম। (এটাও তো কারামত) গোনাহ্ থাকা সত্ত্বেও জমিনের উপর রয়েছি, চলতে পারছি। তিনি আরও বললেন, মুরিদের নিকট শায়েখের অবস্থা প্রকাশ পাওয়া মুরিদের কারামত। শায়েখ আবুল আব্বাস কাস্সাব কুদ্দিসা সিররুহু’র নিকট কারামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। তিনি বলেছিলেন, আমি বকরি জবেহকারীর ছেলে। আমার নিকট এতো মানুষ আসে কেনো? আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৭২।

কারামত ২. তাওয়াজ্জোহের বরকত ঃ হজরত খাজার এক ভক্ত বলেন, সেকালে কাচ্চাকের দিক থেকে একটি বাহিনী এসে বোখারা শহরে আক্রমণ করে। অনেক লোক মেরে ফেলে এবং অনেককে বন্দী করে। বন্দীদের মধ্যে আমার ভাইও ছিলো। আমার পিতা তাঁর ছেলের জন্য খুবই পেরেশান ছিলেন। তিনি প্রায়ই আমাকে বলতেন, আমার সন্তুষ্টি পেতে হলে তোমার ভাইয়ের তালাশে কাচ্চাকের প্রান্তরে যাও। আমি এই ঘটনা আমার খাজার নিকট বললাম। তিনি বললেন, ঠিক আছে,

তুমি তোমার পিতার সন্তুষ্টি অর্জন করো। এতে অনেক সৌভাগ্য ও বরকত রয়েছে। তিনি আরও বললেন, যদি এই সফরে তোমার কোনো বিপদ আসে তাহলে আমার প্রতি মনোনিবেশী হয়ো। সেই সফরে অল্প ব্যবসায় অনেক লাভ হয়েছিলো এবং কঠিন কোনো অবস্থার সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই আমি আমার ভাইকে খাওয়ারিজমে পেয়ে গেলাম। দেখলাম, তারা বন্দীদেরকে একটি নৌকায় উঠিয়ে নিয়ে বোখারার দিকে যাচ্ছে। নৌকায় অনেক লোক ছিলো। বাতাস ছিলো প্রতিকূল। নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। লোকজন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কান্নাকাটি শুরু করলো। এমন সময় শুনতে পেলাম, কে যেনো হজরত খাজার নাম স্মরণ করলো। সাথে সাথেই আমার মনে পড়লো হজরত খাজার বাণী— বিপদে পড়লে আমাকে স্মরণ কোরো। আমি হজরত খাজার প্রতি মনোনিবেশ করলাম। তিনি উপস্থিত হলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। হজরতের বরকতে বাতাসের গতি পরিবর্তন হলো। কিছুদিন পর আমরা দুই ভাই বোখারায় পৌঁছে গেলাম এবং হজরত খাজা কুদ্দিসা সিররুহুর খেদমতে হাজির হলাম। সালাম দিলাম। তিনি মৃদু হেসে বললেন, যখন তোমরা নৌকায় আমাকে সালাম দিয়েছিলে, তখন আমি তোমাদের সালামের জবাব দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা শুনতে পাওনি। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯।

কারামত ৩. ফেরেশতাদের নামাজ ঃ খাজা আলাউদ্দিন আত্তার কুদ্দিসা সিররুহু বর্ণনা করেন, এক বাদলা দিনে হজরত আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, জোহরের নামাজের ওয়াক্ত হয়েছে কি? আমি বললাম, এখনও হয়নি। তিনি বললেন, আকাশের দিকে তাকাও। আমি তখন দেখলাম, আকাশ পরিষ্কার আর আকাশের ফেরেশতারা জোহরের নামাজ আদায় করছে। হজরত বললেন, অথচ তোমরা বলছো, এখনো জোহরের ওয়াক্ত হয়নি। আমি লজ্জিত হলাম। ইস্তেগফার করলাম।

কারামত ৪. পুত্রোৎসর্গ ঃ হজরত খাজা সাহেব বায়তুল্লাহ জিয়ারতের জন্য মক্কা শরীফে উপস্থিত হলেন। হাজী সাহেবেরা ঈদের দিন কোরবানী করছিলেন। খাজা সাহেব বললেন, আমিও কোরবানী করবো। আমার এক ছেলে আছে, আমি তাকেই কোরবানী করবো। সফর থেকে ফিরে এসে জানা গেলো, ঈদের দিন খাজা সাহেবের ছেলে কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন।

কারামত ৫. হস্তক্ষেপ ঃ একদা তিনি দরবেশগণের একটি দলের সাথে ছিলেন। তখন তিনি শাহী টুপি পরিধান করলেন। সেই সময় তাঁর হৃদয়ের অবস্থা ছিলো বাসীত্ব (সুসম্প্রসারিত)। তাঁর হাল সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করলো। সকলের উপর জওক (ভাবোচ্ছাস) প্রবল হলো। হজরত খাজা বললেন, আমরা শাহী টুপি পরিধান করেছি। এজন্য রাজত্বের মধ্যে আমাদের হস্তক্ষেপ করতে হবে। আমরা আমাদের কোনো এক প্রশাসককে আক্রমণ করতে চাই। এক দরবেশ মাওয়ারাউন্নাহারের গভর্নরের নাম উল্লেখ করলেন। হজরত খাজা বললেন, আমরা তাকে আক্রমণ করলাম। তিনি এই বার্তা বোখারার গভর্নরকে পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, যিনি ওই (মাওয়ারাউন্নাহারের) গভর্নরের ভয়ে কাবুলে চলে গিয়েছিলেন। খাজা বোখারার গভর্নরকে নির্দেশ দিলেন, ফকিরদের জন্য পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করো। কিছুদিন পর সকলে জানতে পারলো মাওয়ারাউন্নাহারের গভর্নর সেদিনই নিহত হয়েছিলো, যেদিন হজরত খাজা আক্রমণ করেছিলেন।

কারামত ৬. একই সময়ে তিন স্থানে ঃ হজরত খাজা আলাউদ্দিন আত্তার র. বর্ণনা করেন, একদিন হজরত খাজা দরবেশগণের একটি দলের সাথে জনৈক দরবেশের প্রকোষ্ঠে অবস্থান করছিলেন। তাঁদের কয়েকজন খাদ্য তৈরীর জন্য বের হলেন। তাঁরা দু'ভাগ হলেন। একদল গেলেন বাজারে। তাঁরা হজরত খাজাকে বাজারে দেখতে পেলেন। ভাবলেন, হজরত খাজা হয়তো হুজরাখানা থেকে বের হয়ে এসেছেন। দ্বিতীয় দল চকের দিকে গেলেন। তাঁরা সেখানে হজরত শায়েখকে দেখতে পেলেন। তাঁরাও ভাবলেন, হজরত শায়েখ হয়তো হুজরাখানা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। বাজারে বাজী মোহাম্মদ দরঅহনীর সাথে দরবেশগণের সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, আমি তো হজরত খাজাকে অমুকস্থানে দেখে এসেছি। দেখলাম, তিনি এক দিকে যাচ্ছেন। দরবেশগণ এইমর্মে সংশয়াক্রান্ত হলেন যে, হজরত খাজার সাথে তাহলে কোথায় মোলাকাত হবে। ইতোমধ্যে তাঁদের কাছে একজন দরবেশ এসে বললেন, হজরত খাজা আপনাদেরকে স্মরণ করছেন। আপনারা এতো দেরী করছেন কেনো? দরবেশগণ তাঁর নিকট সকল ঘটনা খুলে বললেন। তিনি বললেন, আপনারা হুজরাখানা থেকে বের হওয়ার পর থেকে আমি তো সেখানেই তাঁর সাথে আছি। তিনি তো কোথাও যাননি। আমি তো সেখান থেকেই আসছি। হুজরাখানায় ফিরে এসে দরবেশগণ এই কারামতের কথা হজরত খাজার নিকট বর্ণনা করলেন। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ৯৩।

হজরত খাজা বর্ণনা করেন, এক রজনীতে দরবেশ মোহাম্মদ জাহেদ জিওর শায়েখ সাদীর বাড়ীতে ছিলেন। তাঁরা ছিলেন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ছিলেন পরস্পরকে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে সমসতর্ক। আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ ছিলো তাঁদের স্বভাবগুণ। একদিন তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেললেন। লোকেরা মনে করলো তাঁদের আত্মা দেহ থেকে পৃথক হয়েছে। হজরত খাজা আরেফগণের খানকা থেকে বের হলেন। দরবেশদ্বয়কে রূহানী তাওয়াজ্জোহ প্রয়োগ করে ফিরিয়ে আনলেন। তিনি বললেন, আমি সফরে আরেফগণের খানকায় ছিলাম। অকস্মাৎ আমাকে এইমর্মে নির্দেশ দেওয়া হলো, যাও তোমার বন্ধুদেরকে সহযোগিতা করো। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ১০২।

কারামত ৭. বিপরীতমুখী স্রোত ঃ একবার হজরত খাজা কুদ্দিসা সিররুহু দরবেশগণের সাথে একটি নদীর তীরে উপস্থিত হলেন, যা হজরত শায়েখ সাইফুদ্দিনের বরাবর ছিলো। এমন সময় এক ব্যক্তির মুখ থেকে বের হয়ে এলো, পূর্বের যুগের বুজর্গগণের দ্বারা অনেক আশ্চর্য বিষয় ও কারামত প্রকাশ পেতো, কিন্তু বর্তমান যুগে এমন কোনো বুজর্গ নেই যাদের দ্বারা কারামত প্রকাশ পায়। হজরত খাজা বললেন, এখনো এমন বুজর্গ আছেন, যিনি এই নদীর স্রোতকে ইশারা করলে নদীর স্রোত বিপরীত গতি ধারণ করবে। তৎক্ষণাৎ নদীর স্রোত বিপরীত দিকে প্রবাহিত হতে লাগলো। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ১০৩-২০৭।

কারামত ৮ ঃ এক দরবেশ হজরত খাজার দরবারে এসে হজরতের পায়ে পড়ে গেলো। হজরত খাজা তাঁর অবস্থার প্রতি কোনো গুরুত্ব দিলেন না। বললেন, মাখানের লোকজন তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর তুমি আমার অনুমতি ছাড়াই সেখান থেকে চলে এসেছো। তিনি জালালী হালে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। ওই দরবেশের অবস্থা পরিবর্তন হলো। সে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। তার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। উপস্থিত কেউই তার ব্যাপারে সুপারিশ করার সাহস পাচ্ছিলো না। অবশেষে সবাই খাজা নক্শবন্দ র. এর পিতার কাছে গেলেন। তাঁর পিতা বিনয়ের সাথে বললেন, হজরত খাজা! সকল দরবেশ তার ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করছেন। হজরত খাজা বললেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে তার এলাকায় গিয়ে লোকজনকে রাজি না করাবে এবং তারা তার কষ্ট থেকে মুক্তি না পাবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

এরপর হজরত খাজা তার বক্ষদেশে তাঁর কদম মোবারক স্থাপন করলেন এবং বললেন, ওঠো। লোকটি সাথে সাথে হুঁশ ফিরে পেলো। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ১০৬-১০৭।

কারামত ৯ ঃ একদা হজরত খাজা গাদিউতে এক দরবেশের বাড়িতে চুলা জ্বালাচ্ছিলেন। এমন সময় হজরত খাজার বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হলো। তিনি তাঁর মোবারক হস্ত জ্বলন্ত উনুনে প্রবেশ করিয়ে দিলেন এবং অনেকক্ষণ তাঁর হাত আগুনের মধ্যেই রাখলেন। যখন হাত বের করে আনলেন, দেখা গেলো তাঁর হাতের একটি পশমও জ্বলেনি।

কবির ভাষায়—

হজরত ইব্রাহীম আ. আগুনে পতিত হওয়ার সময় বলেছিলেন, আমার শরীরের একটি পশমও যেনো বাকী না থাকে, সব কটি যেনো জ্বলে যায়।

কারামত ১০ ঃ এক দিনের ঘটনা। কয়েকজন দরবেশ তরমুজের ক্ষেতে পানি দিচ্ছিলেন। তাঁদের একজন বললেন, খানদানে খাজেগানের একজন দরবেশ তরমুজের ক্ষেতে পানি দিচ্ছে। রুটি খাওয়ার সময় মুরিদগণের একজন বললেন, উত্তম হতো যদি তরমুজ হতো। এক ব্যক্তি তরমুজের ক্ষেত থেকে এসে তরমুজ বের করে দিলেন। এই ঘটনা আলোচনার সময় হজরত খাজা বাহাউদ্দিন স্বীয় মুরিদগণকে বললেন, কী বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। এক দরবেশ এই ঘটনা হজরত খাজার নিকট ব্যক্ত করলেন। হজরত খাজা তাঁদের কথা শুনলেন। সেখান থেকেই তাঁর পবিত্র হাত প্রসারিত করে দিয়ে তরমুজের ক্ষেত থেকে একটি তরমুজ এনে দিলেন। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ১৫৯।

কারামত ১১ ঃ আমীর তাজ নামক এক দরবেশের এমন হাল ছিলো যে, তাঁকে কোনো কাজে পাঠালে তিনি কাজ সমাধা করে অল্প সময়ের মধ্যে ফিরে আসতে পারতেন। অনেক সময় পাখা ছাড়াই পাখিদের মতো উড়তেন। একদিন দরবেশগণ তাঁকে বোখারা প্রেরণ করলে তিনি বাতাসে ভর করে উড়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় হজরত খাজা তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। উড়ন্ত দরবেশ ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেলেন। এরপর থেকে তিনি আর কখনো উড়তে পারেননি। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ১৫৪।

কারামত ১২. হেফাজত ঃ জনৈক দরবেশ বর্ণনা করেন, একদা কোনো এক ব্যক্তির প্রতি আমি আমার আন্তরিক আকর্ষণ অনুভব করলাম। আকর্ষণ প্রবলতর হতে লাগলো। নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না।

আবেগতাড়িত অবস্থায় তার কাছে পৌঁছলাম। সহসা সেখানে খাজা সাহেব হাতে একটি লাঠি নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং আমাকে লাঠি দিয়ে মারতে উদ্যত হলেন। আমি ভীত হলাম। দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে চোখ বন্ধ করে নিজ বাড়িতে ফিরে এলাম। বেশ কিছু দিন পর্যন্ত আমার হাল অবস্থা এমন ছিলো যে, আমি কোনোকিছুর দিকে তাকাতে পারতাম না। অথচ খাজা সাহেব সেখান থেকে দশ দিনের দূরত্বে অবস্থান করতেন।

কারামত ১৩. বৃষ্টি থেমে যাওয়া ঃ একদা হজরত খাজা কাসরে আরেফানের এক বাগানে ছিলেন। সেখানে হজরত আমীর কুলাল কুদ্দিসা সিররুহুর পুত্র আমীর বোরহানউদ্দিন চুলায় রুটি পাকাচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে আকাশ মেঘে ছেয়ে গেলো। একটু পরেই বৃষ্টি শুরু হলো। সকলে হয়রান পেরেশান হয়ে গেলো। হজরত খাজা নক্শবন্দ র. হজরত আমীর বোরহানউদ্দিনকে বললেন, বৃষ্টিকে বলে দাও যেখানে আমরা আছি, সেখানে যেনো সে না আসে। আমীর বোরহানউদ্দিন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, আমার কী এমন যোগ্যতা আছে যে, আমি এমন কথা বলবো। হজরত খাজা বললেন, আমি তোমাকে বলছি তুমি বলো, আর তোমার নফসকে হেফাজত করো। আমীর বোরহানউদ্দিন এবার হুকুম তামিল করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলো। চারপাশে বৃষ্টি পড়তে লাগলো আগের মতোই। নাসাফ থেকে যেদিন হজরত খাজা বোখারা যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, সেদিনও চারদিকে বৃষ্টি হচ্ছিলো। হজরত খাজা সাহেব খাজা পারসাকে বললেন, অনেক বৃষ্টি হয়েছে। এখন দোয়া করো, যাতে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। বলো, বৃষ্টি বন্ধ হও। খাজা পারসা আমীর বোরহানউদ্দিনের মতো বিনয় প্রকাশ করলেন। হজরত খাজা বললেন, আমি বলছি তুমি বলো। খাজা পারসা বললেন, হে বৃষ্টি! থেমে যাও। তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি থেমে গেলো। বাতাস প্রবাহিত হতে হতে মেঘ সরে গেলো। আত্মপ্রকাশ করলো সুউজ্জ্বল সূর্য।

কারামত ১৪. পাহাড়কে স্বর্ণ বানিয়ে দাও ঃ শায়েখ সাদী র. বলেন, যখন আমি হজরত খাজার নেক দৃষ্টিতে এসে গেলাম, তখন কোরবানী (আত্মত্যাগ) ও বদান্যতাকে প্রধান্য দেওয়া আমার জন্য সহজ হয়ে গেলো। আমার কাছে একশত স্বর্ণমুদ্রা ছিলো। একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বললো, এগুলো লুকিয়ে রাখো। বিশ্বাসের দুর্বলতার কারণে আমি তার কথায় সম্মত হলাম। বোখারায় চলে এলাম। আর ওই দিনার দিয়ে দামী মোজা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করলাম। বিশেষ কারণে কাসরে আরেফান

থেকে গাদীওয়াতে যেতে হলো। অবশেষে হজরত খাজার খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, বোখারায় কেনো গিয়েছিলে? আমি বললাম, কিছু কাজ ছিলো। তিনি বললেন, চামড়ার দামী মোজা এবং যা কিছু ক্রয় করেছো, তা উপস্থিত করো। আমি সবকিছু হজরত খাজার সামনে উপস্থিত করলাম। হজরত খাজা বললেন, একশত দিনারের মধ্যে যেগুলো খরচ হয়নি, সেগুলোও উপস্থিত করো। আমি সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট মুদ্রাসমূহ তাঁর সামনে পেশ করলাম। তিনি বললেন, তুমি দিনার চাইলে আল্লাহ্‌র কৃপায় পাহাড়কে তোমার জন্য স্বর্ণ বানিয়ে দিবো। কিন্তু আমরা ফকির দরবেশ। এগুলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়। ফকিরদের দৃষ্টি এই জগতের দিকে নয়। তোমার যা কিছু প্রয়োজন, তা তো তুমি যথাসময়ে পাবেই। তাহলে জমা করবে কেনো?

কারামত ১৫. সবুজ উদ্যান ঃ হজরত মাওলানা সা'দুদ্দিন বর্ণনা করেন, একদিন হজরত খাজা আমার বাগানে আগমন করলেন। তখন ছিলো বসন্ত কাল। তবু আমার দৃষ্টিতে বাগানটি ছিলো প্রায় উজাড়। কেমন যেনো এলোমেলো অগোছালো লতাগুল্ম অর্থাৎ ঝোপঝাড়ে পূর্ণ। হজরত খাজা বললেন, আমরা তোমার বাগানকে সবুজ ও সতেজ বানিয়ে দিচ্ছি, যাতে তোমার বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। এরপর তিনি বললেন, এবার উদ্যানের দিকে তাকাও। আমি দেখতে পেলাম, বাগান ফুলে ফলে ভর্তি। আমি মনে মনে বললাম, এই বাগান আমার নয়। হজরত খাজা বললেন, এটাই তোমার বাগান। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় আমার প্রতীতি জন্মালো। মনে সৃষ্টি হলো হজরতের বেলায়েতের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ১৩৭।

কারামত ১৬ ঃ হজরত খাজা আলাউদ্দিন আত্তার কুদ্দিসা সিররুহু বর্ণনা করেন, হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ র. একবার খাজা মাশুক তুশীর মাজার শরীফ জিয়ারতের জন্য তুশ নগরে তাশরীফ আনলেন। তাঁর কবরের পাশে গিয়ে বললেন, আসসালামু আলাইকুম হে মাশুক তুশি! আপনি ভালো আছেন তো? কবর থেকে আওয়াজ এলো, তোমার উপরও সালাম হে বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ! আমরা ভালো আছি। খাজার সঙ্গী দরবেশগণ সকলেই এ কথা শুনতে পেলেন। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ১৩৬।

কারামত ১৭. কাওয়ালী ঃ একবার হজরত খাজা সাহেব দরবেশ আতার বাড়ির উপরের তলায় অবস্থান করছিলেন। বোখারার আমীরের

মহল সেই বাড়ীর কাছেই ছিলো। সেখানে কাওয়ালীদের একটি দল গানবাদ্য করতো। হজরত খাজা বললেন, যা শোনা যাচ্ছে, সব শরিয়তবহির্ভূত। এর চিকিৎসা হলো আমরা যেনো আমাদের কানে তুলো দিয়ে রাখি। তাহলে সকাল পর্যন্ত এই আওয়াজ শোনা থেকে বাঁচতে পারবো। এই কথা বলে তিনি সূফীদের উপর তাওয়াজ্জোহ্ প্রদান করলেন। তাদের অবস্থার পরিবর্তন হলো। হারাম আওয়াজ তাদের কান পর্যন্ত পৌঁছলো না। প্রতিবেশীরা সকালে দরবেশগণকে জিজ্ঞেস করলো, রাত কাটলো কীভাবে? হজরত খাজা সাহেব ও তাঁর মুরিদগণ তো কাওয়ালী শুনতে নিষেধ করেন। দরবেশগণ বললেন, কই? আমরা তো কিছুই শুনতে পাইনি।

কারামত ১৮. দূরালাপন ঃ হজরত খাজা একবার বোখারার একটি গ্রামে অবস্থান করছিলেন। বললেন, মাওলানা আরেফ রেওগাড়ী আমাকে ডাকছেন। তিনি নাসাফে মাওলানা খাজা মোবারকের কাছে বসে আছেন। একথা বলেই তিনি নাসাফের দিকে চলে গেলেন। মাওলানার সাথে দেখা হলো। তিনি বললেন, আমরা তিন বার তলব না করা পর্যন্ত আমাদের কাছে আসবে না।

কারামত ১৯ ঃ একদা হজরত খাজা আমীর বোরহানউদ্দিন ইবনে সাইয়্যেদ আমীর কুলাল এর সোওখর গ্রামে তাঁর নিজের বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। ইবনে আমীর হজরত খাজার কাছে আবেদন করলেন, মাওলানা খাজা আরেফের সাথে সাক্ষাতের জন্য আমার মন উদগ্রীব। আর তিনি এখন নাসাফে। আপনি মনোনিবেশ করলে মাওলানা এখানে তশরীফ আনবেন। হজরত বললেন, আমি মাওলানাকে খুঁজছি। একথা বলে হজরত খাজা আমীরের বাড়ীর ছাদে উঠলেন। এরপর তিনবার বললেন, হে মাওলানা আরেফ চলে আসুন। এরপর বললেন, মাওলানা আরেফ আমার আওয়াজ শুনেছেন এবং এই দিকে রওয়ানা করেছেন। যখন মাওলানা আরেফ হজরতের নিকট পৌঁছলেন তখন তিনি বললেন, আমি অমুক দিন অমুক সময় নাসাফে বন্ধুদের সাথে বসা ছিলাম। অকস্মাৎ হজরত খাজার আওয়াজ আমার কানে পৌঁছলো। তখন আমি নাসাফ থেকে বোখারার দিকে রওয়ানা হলাম। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ১৩৫।

কারামত ২০ ঃ হজরত খাজা বলেন, আমাদের দলের এক দরবেশ হজরত মাওলানা নাজমুদ্দিন বোখারার ওয়াদরাকে থাকেন। আমি তাঁকে এইমর্মে তলব করলাম যে, আগামী দিন জোহরের সময় এখানে উপস্থিত

হবেন। পরের দিন জোহরের সময় মাওলানা নাজমুদ্দিন হজরত খাজার দরবারে মাকামে কারশীতে পৌঁছলেন। বললেন, গতকাল হজরত খাজার ডাক আমার কানে পৌঁছেছে। তাই অস্থির হয়ে সেই সময়ই রওয়ানা করেছি। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ১৩৫।

কারামত ২১. নদী থেকে তরমুজ ঃ এক দরবেশ বর্ণনা করেন, এক প্রান্তরে আমি হজরত খাজার খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন ছিলো বসন্ত কাল। আমার তরমুজ খেতে ইচ্ছা করলো। আমি হজরত খাজার কাছে আমার মনের কথা জানালাম। কাছেই একটি নদী ছিলো। হজরত খাজা ওই নদীর দিকে ইশারা করে বললেন, নদীর তীরে যাও, তরমুজ পেয়ে যাবে। আমি নদীর তীরে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটি তাজা তরমুজ ভেসে ভেসে আমার কাছে এলো। আমি তরমুজটি উঠিয়ে নিলাম।

কারামত ২২. আটার মধ্যে বরকত ঃ এক দরবেশ বর্ণনা করেন, একবার হজরত খাজা নক্শবন্দ র. আমার বাড়ীতে এলেন। আমি অত্যধিক আনন্দিত ও উৎফুল্ল হলাম। আমার ঘরে সামান্য আটা ছিলো। আমি তাই নিয়ে এলাম। খাজা বললেন, এই আটা সংরক্ষণ করবে এবং এ থেকে ব্যয় করবে। কিন্তু এই আটার কম-বেশীর রহস্য কারো কাছে বর্ণনা করবে না। হজরত খাজা আমার বাড়িতে দুই মাস অবস্থান করলেন। সেই সময় হজরত খাজার অসংখ্য ভক্ত মুরিদান বন্ধুবর্গ তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতেন। আমরা ওই আটা থেকেই তাঁদের জন্য রুটি পাকাতাম। আটা সামান্যও কমলো না। তাঁর বিদায় গ্রহণের পরও আমরা ওই আটা থেকে রুটি বানিয়ে খেতাম। কিন্তু আটা কমতো না। তবে একদিন হজরতের কথার বিপরীত করলে অর্থাৎ আমার পরিবার-পরিজনের নিকট এর রহস্য বর্ণনা করলে ওই বরকত বিদায় নেয়। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ১৩৫।

কারামত ২৩ ঃ এক দরবেশ বর্ণনা করেন, আমি প্রথম জীবনে দোকানদারী করতাম। একবার হজরত আমার দোকানে এলেন। হজরত সুলতানুল আরেফীন বায়েজিদ বোস্তামী র. এর গুণাবলী ও কারামতের কথা উল্লেখ করলেন। বললেন, সুলতানুল আরেফীন বলেছেন, যদি আমার রুমালের একটি কোণা কোনো ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি, তাহলে সে আমার ভক্ত ও আশেক হয়ে যাবে। আমার তালাশে বেরিয়ে পড়বে। আর আমি বলি, যদি আমি আমার জামার হাতা নাড়াচাড়া করি, তাহলে বোখারার সকল লোক আমার আশেক ও অনুরক্ত হয়ে যাবে। আমার জন্য

পাগলপারা হয়ে যাবে। আমাকে ছাড়া কিছুই বুঝবে না। ঘর বাড়ি ছেড়ে আমার পিছনে দৌড়াতে থাকবে। কথা বলতে বলতে হজরত স্বীয় জামার হাতা নাড়ালেন। আর আমার চোখ হজরতের আস্তিনের কোণার দিকে পড়লো। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। মাটিতে পড়ে গেলাম। স্বাভাবিক অবস্থায় যখন এলাম, তখন হজরতের প্রতি আমার এশ্‌ক, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা সুদৃঢ় হলো। আমার যাবতীয় সম্পদ, ঘর-বাড়ি, দোকানপাট ছেড়ে দিয়ে আমি হজরতের ভক্তদের দলে শরীক হয়ে গেলাম।

কারামত ২৪. পানির উপর চলা ঃ একবার শীতের মৌসুমে হজরত খাজা এক দরবেশকে লাকড়ি সংগ্রহ করতে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ মোতাবেক কাঠ সংগ্রহ করা হলো। পরের দিন শিলাবৃষ্টি শুরু হলো। বর্ষণ চললো একাধারে চল্লিশ দিন ধরে। ওই অবস্থায় হজরত শায়েখ খাজা খাওয়ারিজম শহরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। শেখ সাদী নামক একজন দরবেশ তাঁর সাথী ছিলেন। যখন তিনি নদীর কিনারে উপনীত হলেন, তখন শেখ সাদীকে বললেন, পানির উপর দিয়ে চলতে থাকো। শেখ সাদী ডুবে যাওয়ার ভয়ে পানির উপর দিয়ে চলতে সাহস করলেন না। হজরত খাজা পুনরায় বললেন, চলো। একথা বলে রাগত চোখে তাঁর দিকে তাকালেন। শেখ সাদী বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। হুঁশ ফিরে এলে পানির উপর দিয়ে চলতে লাগলেন। হজরত খাজা চললেন তাঁর পিছনে পিছনে। নদী পার হওয়ার পর হজরত খাজা শেখ সাদীকে বললেন, তোমার মোজা ভিজেছে কি? শেখ সাদী তার মোজার দিকে তাকালেন। দেখলেন, তার মোজাতে পানির কোনো চিহ্ন নেই। আনিসুত্‌ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ১২৮।

কারামত ২৫ ঃ একদা নাসাফে বর্ষা মৌসুমের একদিন প্রচণ্ড গরম অনুভব হচ্ছিলো। হজরত খাজার ভক্তরা বৃষ্টির জন্য এক দরবেশকে হজরত খাজার দরবারে প্রেরণ করলেন। তিনি সেই দরবেশকে দেখেই বললেন, নাসাফবাসীরা ভালোই আছে। বৃষ্টির জন্য তারা তোমাকে আমার নিকট পাঠিয়েছে। দরবেশ বললেন, হ্যাঁ। হজরত বললেন, এবার আমরা তোমাদের জন্য বোখারা থেকে পানি প্রেরণ করবো। তিনি সেই দরবেশকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বললেন। কিছুক্ষণ পর আকাশে এক খণ্ড মেঘ ভেসে উঠলো। পরক্ষণেই বৃষ্টি শুরু হলো। বর্ষণ চললো সারাদিন ধরে। পরদিন তিনি ওই দরবেশকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। বৃষ্টি হলো তিন দিন ধরে। আনিসুত্‌ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ১২৭।

কারামত ২৬. উচ্চস্বরে জিকির ও নৃত্য ঃ এক দরবেশ বর্ণনা করেন, আমি একবার কারশী নামক স্থানে দরবেশদের একটি দলের সাথে নৃত্য-সংগীতে রত ছিলাম। আমার নিকট একটি দামী রুমাল ছিলো। আমি সেটি কাওয়ালী পরিবেশনকারীকে উপহার দিয়েছিলাম। পরে কোনো কাজের জন্য বাড়ী থেকে বের হলাম। ওই সময় হজরত খাজা কুশনগরী থেকে আসছিলেন। কারশীতে হজরত খাজার সাথে সাক্ষাৎকারী আমিই প্রথম ব্যক্তি। সাক্ষাতের সময় হজরত খাজা আমাকে বললেন, নৈকট্যধারী ফকিরগণের সাথে একাত্মতা রাখা উচিত। আমাদের তরিকায় জিকরে জলি ও নৃত্যসংগীত নেই। হজরত খাজার এই কথা শোনার পর আমার অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেলো। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি আমাকে তাঁর দরবারে আসার অনুমতি দেননি। দরবেশগণের একটি দলের সুপারিশ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর সোহবত, সান্নিধ্যের সৌভাগ্য হয়নি। তাঁর কোনো নেসবতও আমি পাইনি। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ১২২।

কারামত ২৭ ঃ এক দরবেশ বর্ণনা করেন, আমার সন্তানাদি ছিলো না। আমি হজরতের দরবারে সন্তান হওয়ার জন্য আবেদন করলাম। হজরত খাজা আমার জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহ্তায়ালা আমাকে একটি পুত্রসন্তান দান করলেন। আমি হজরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে ছেলের জন্য একটি কোর্তা (জামা) চাইলাম। হজরত খাজা বললেন, বাড়ী যাও। তোমার ছেলের জন্য জামা দেওয়া হবে না। আমি বাড়িতে ফিরে এসে দেখি আমার ছেলের ইন্তেকাল হয়েছে। আমি পুনরায় খাজার দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, তুমি সন্তানের জন্য আবেদন করেছিলে। তোমার আশা পূরণও হয়েছিলো। এবার আল্লাহ্তায়ালা তোমাকে দুটি সন্তান দান করবেন। তারা দীর্ঘজীবি হবে। তারা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। এরপর আমার একটি পুত্রসন্তান জন্ম নিলো। কিন্তু কিছুদিন পর সে অসুস্থ হয়ে পড়লো। আমি হজরতের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, সে তো আমার সন্তান। তার চিকিৎসার ব্যাপারে ভেবো না? অনেক বার অসুস্থ হবে, আবার সুস্থ হবে। এরপর আমার আরেকটি ছেলে জন্ম নিলো। আনিসুত্ ত্বলিবীন পৃষ্ঠা ১২০।

কারামত ২৮ দু'টি নেকড়ে বাঘ ঃ এক দরবেশ বলেন, হজরত খাজা একটি কাজের জন্য আমাকে বাইরে পাঠালেন। তখন ছিলো গ্রীষ্মকাল। ফেরার পথে একটি গাছের ছায়ায় বসে পড়লাম এবং ওই গাছের সাথে

হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কখন যেনো ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম, হজরত খাজা লাঠি হাতে নিয়ে আমার দিকে তেড়ে আসছেন। বলছেন, এটা ঘুমানোর জায়গা নয়। তাড়াতাড়ি ওঠো। আমি ঘুম থেকে জেগে দেখলাম, আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটি নেকড়ে বাঘ। আমি দ্রুত কাসরে আরেফানের দিকে রওয়ানা হলাম। যখন কাছাকাছি পৌঁছলাম তখন দেখতে পেলাম, হজরত খাজা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, ওরকম স্থানে কেউ নিদ্রা যায় নাকি? আনিসুত্ ত্বলিবীন।

কারামত ২৯ ঃ একবার হজরত বললেন, আমার অন্তিম যাত্রাকালে আমি দরবেশগণক মৃত্যুবরণের নিয়ম শিক্ষা দিবো। দরবেশগণ অন্তিম মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিলেন। হজরত খাজার অন্তিম মুহূর্তে তিনি একটি সরাইখানায় প্রবেশ করে একটি কক্ষে অবস্থান গ্রহণ করলেন। বিশেষ বিশেষ মুরিদগণ তাঁর খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। হজরত খাজা সকলের হালের প্রতি রহমতের বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। অবশেষে উভয় হাত উত্তোলন করে অনেকক্ষণ দোয়া করলেন ও উভয় হাত চেহারা মোবারকে রাখলেন এবং ওই অবস্থায় এই নশ্বর জগত থেকে চিরবিদায় নিলেন।

কারামত ৩০ ঃ হজরত আলাউদ্দিন গজদাওয়ানী র. বর্ণনা করেন, হজরত খাজার অন্তিমকালে আমি তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম। হজরত খাজা আমাকে দেখে বললেন, হে আলা! দস্তরখানা নিয়ে এসে খানা খাও। তিনি আমাকে আলা বলে ডাকতেন। হজরতের নির্দেশ পালনার্থে দস্তরখান বিছিয়ে কয়েক লোকমা আহার করলাম। ওই অবস্থায় আমি ভালোমতো খেতে পারছিলাম না। তাই দস্তরখান গুছিয়ে ফেললাম। তিনি চোখ খুলে বললেন, আলা! দস্তরখানা বিছিয়ে আহার করো। আমি কয়েক লোকমা খেয়ে দস্তরখানা ওঠালাম। হজরত পুনরায় বললেন, দস্তরখানা বিছিয়ে খাবার খাও। কেনোনা কাজ করার জন্য খাদ্যগ্রহণ আবশ্যক। এভাবে তিনি চারবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাশহাত পৃষ্ঠা ১৫৭।

কারামত ৩১ ঃ তাঁর অন্তিমকালে মুরিদগণের কারো কারো এরকম খেয়াল হলো যে, দেখা যাক, হজরত কাকে এজাজত প্রদান করেন। তিনি তাঁদের মনোভাব লক্ষ্য করে বললেন, এই সময়ে আমাকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলো না। এই কাজটি আমার ইচ্ছাধীন নয়। আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের মধ্যে হতে কাউকে এই মর্যাদায় উন্নীত করবেন, আর তিনিই এই বিষয়টি মীমাংসা করবেন। হজরত খাজার কতিপয় মুরিদ বললেন, ওই সময় তিনি

বললেন, কথা ওটাই— যা আমি হেজাজের রাস্তায় বলেছিলাম। যে আমাকে দেখার ইচ্ছা করে, সে যেনো খাজা মোহাম্মদ পারসাকে দেখে নেয়। এই কথা বলার পরের দিন তিনি পরপারে পাড়ি দেন। রাশহাত পৃষ্ঠা ১৫৭।

কারামত ৩২ ঃ হজরত খাজা আলাউদ্দিন কুদ্দিসা সিররুহু বলেন, হজরত খাজার ইন্তেকালের সময় আমি সূরা ইয়াসিন পড়ছিলাম। সূরার অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছলে নূর ও জ্যোতি বিকশিত হতে লাগলো। আমরা কলেমা শরীফ পড়তে লাগলাম। হজরতের শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো। ৭৩ অথবা ৭৪ বৎসর বয়সে সোমবার দিন রবিউল আউয়াল মাসে ৭৯০ অথবা ৭৯১ হিজরীতে তিনি তাঁর পরম বন্ধুর (রফিকে আ'লার) সঙ্গে মিলিত হলেন।

কবি হাফেজ শিরাজি বলেন—

তিনি সত্য ও দ্বীনের আলো, তাঁর গন্তব্যস্থল সুন্দর হোক।
ছিলেন তিনি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ইমাম।

যখন এই জগত থেকে তিনি চলে গেলেন, তখন তিনি সম্মানিত ব্যক্তিদের জন্য এই পঙ্ক্তি উচ্চারণ করলেন—

আল্লাহ্‌র আনুগত্যে নৈকট্য লাভ হয়।
যদি পারো তবে নফির মাধ্যমে নিজেকে বিলীন করে দাও।

তাঁর মাজার শরীফ বোখারাতে। এই অধম তাঁর পরকাল যাত্রার সন প্রথম তারিখ আবজাদ অক্ষর অনুসরণে আর দ্বিতীয় তারিখ হিসেবে তিনি এই উম্মতের চেরাগ অথবা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ইমাম।

আমীর বোরহানউদ্দিন কুদ্দিসা সিররুহু

হজরত আমীর কুলাল কুদ্দিসা সিররুহুর চার ছেলে ছিলো। চারজনই ছিলেন খলিফা। তাঁরা ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের বিশেষ ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর চার পুত্রের দীক্ষার দায়িত্ব দেন তাঁর চার খলিফার উপর। আমীর বোরহানউদ্দিন ছিলেন হজরত আমীর কুলাল র. এর বড় ছেলে। তাঁর দীক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয় হজরত খাজা বাহাউদ্দিনের উপর। তিনি তাঁকে বলেন, উস্তাদ ছাত্রের তরবিয়ত করবেন। তরবিয়তের প্রভাব যেনো ছাত্রের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। যেনো বুঝা যায় তরবিয়ত তার উপরে কাজ করছে। আর তার মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখলে তা সংশোধন করে নিবে। এরপর হজরত খাজা নক্‌শবন্দকে বললেন, আমার ছেলে আমীর বোরহানউদ্দিন উপস্থিত। তার উপরে কারো হস্তক্ষেপ নেই। অর্থাৎ তার আত্মিক দীক্ষা

হয়নি। তুমি আমার সামনে তার তরবিয়ত (দীক্ষা) শুরু করো, যাতে তোমার দীক্ষার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আমি পর্যবেক্ষণ করতে পারি, যেনো তোমার দীক্ষাগুণের প্রতি আমার প্রতীতি জন্মে। হজরত খাজা আদবের কারণে কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। হজরত আমীর বললেন, বিলম্ব করা অনুচিত। অবশেষে হজরত খাজা আমীর বোরহানউদ্দিনের বাতেনের প্রতি তাওয়াজ্জোহ দিলেন। তাওয়াজ্জোহের প্রভাবে তার বাতেন জগতে বিশাল পরিবর্তন দেখা দিলো। প্রকৃত বেহুঁশের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেলো। এরপর আমীর বোরহানউদ্দিন হজরত খাজার তরবিয়তে পূর্ণ ও পূর্ণতা প্রদানকারী অবস্থায় উপনীত হলেন। হলেন তাসাররুফ ও কারামতের অধিকারী। হজরত আমীর বোরহানউদ্দিনের তরিকা বা পদ্ধতি ছিলো সৃষ্টজীব থেকে পৃথক থাকা। তিনি কারো সাথে সম্পর্ক রাখতেন না। কেউ তাঁর বাতেন সম্পর্কে অবগত হতে পারতেন না। হজরত আমীর বোরহানউদ্দিনের বাতেনী শক্তি এমন প্রখর ও শক্তিশালী ছিলো যে, তার প্রভাবে হজরত খাজার কোনো কোনো মুরিদের হাল-অবস্থা নিষ্প্রভ হয়ে যেতো।

কারামত ৩৩. শায়েখের ভাবনা হস্তক্ষেপ ঃ শায়েখ নেকরোজ বোখারী হজরত খাজার একজন মুরিদ থেকে বর্ণনা করেন, যখন আমার সাথে রাস্তায় আমীর বোরহানউদ্দিনের সাক্ষাৎ হতো তখন আমার বাতেনী অবস্থা কোথায় যেনো অদৃশ্য হয়ে যেতো। একদিন আমি হজরত খাজার খেদমতে আমীর বোরহানউদ্দিনের বিষয়ে অনুযোগ উত্থাপন করলাম। তিনি আমাকে দেখেই বললেন, তুমি আমীর বোরহানউদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে এসেছো। আমি বললাম, হজরতের অন্তর্দৃষ্টি চাঁদের আলোর মত স্বচ্ছ। হজরত বললেন, যখন সে তোমার প্রতি তাওয়াজ্জোহ্ দিবে, তখন তুমি আমার প্রতি মনোনিবেশ করবে। আর মনে মনে খেয়াল রাখবে আমি কিছুই নই। যা কিছু আছে তা খাজার মেহেরবানী। এরপর আমীর বোরহানউদ্দিনের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমার প্রতি তাওয়াজ্জোহ্ দিলেন। আমি দ্রুত হজরত খাজার চেহারার প্রতি মনোনিবেশ করলাম এবং বললাম, আমি কিছুই নই। তবে হজরত খাজার মেহেরবানী। ওই সময় আমি দেখলাম, আমীর বোরহানউদ্দিনের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেলো এবং তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। এরপর আর কখনো তিনি আমার অবস্থার প্রতি মনোযোগ প্রদান করেননি।

কারামত ৩৪ ঃ আমীর বোরহানউদ্দিন কুদ্দিসা সিররুহু বলেন, একদা কোরবানীর ঈদের দিন লোকজন ঈদের নামাজ শেষে ফিরে আসছিলো। হজরত খাজার সাথে অনেক লোক ছিলো। আমি সবার পিছনে ছিলাম। হজরত খাজার সাথে লোকজনের ভিড় দেখে আমার মনে উদয় হলো, এখন হজরতের প্রাথমিক কাল। তাঁর তাওয়াজ্জোহ্ ও কারামত কেবল শুরু। লোকজনের ভিড়ে হজরতের সময় নষ্ট হবে। হজরত খাজা থেমে গেলেন। আমি তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি আমার জামার কলার চেপে ধরে নাড়াচাড়া দিলেন। আমার বাতেনের মধ্যে অর্থাৎ আমার অভ্যন্তরে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হলো। তাঁর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে আমার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেলো। আমি ভূলুণ্ঠিত হওয়ার উপক্রম হলাম। হজরত খাজা আমাকে এ অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনলেন। বেশকিছু সময় এভাবেই অতিবাহিত হলো। আমার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে হজরত খাজা আমাকে বললেন, তুমি মনে মনে কী ভাবছো? এখনও কি আগের ধারণা অবশিষ্ট আছে? আমি লজ্জিত হয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লাম।

আমীর হামজা কুদ্দিসা সিররুহু

তিনি ছিলেন হজরত আমীর কুলাল র. এর দ্বিতীয় সাহেবজাদা। হজরত আমীর কুলাল র. পুত্রের নাম তাঁর পিতার নামে রেখেছিলেন। এজন্য তিনি তাকে 'আব্বা' বলে ডাকতেন। তাঁর তরবিয়তের দায়িত্ব ছিলো মাওলানা আরেফ বেগ গুরানী র. এর উপর। মাওলানার দীক্ষার ফলে তিনি পূর্ণতার স্তরে পৌঁছেন। হজরত আমীর কুলাল র. এর ইন্তেকালের পর তিনিই তাঁর গদ্দিনসীন হন এবং দীর্ঘ কাল ধরে সৃষ্টজীবের হেদায়েতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ৮০৮ হিজরীতে শাওয়াল মাসে ইন্তেকাল করেন। রাশহাত পৃষ্ঠা ৪৫।

আমীর শাহ কুদ্দিসা সিররুহু

তিনি হজরত আমীর কুলাল র. এর তৃতীয় পুত্র। তাঁর তরবিয়তের দায়িত্ব ছিলো শায়েখ ইয়াদ্গার র. এর উপর। তিনি সৃষ্টজীবের সেবার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতেন ও চেষ্টা সাধনা করতেন। মানুষের সমস্যাবলী অতি সহজে সমাধান করতেন। আন্তরিকতার সাথে মানুষের সেবা করতেন। প্রয়োজন পরিমাণ দুনিয়া থেকে গ্রহণ করতেন। তিনি বলতেন, প্রতিটি বস্তু গ্রহণের জন্য জবাবদিহিতা রয়েছে। রাশহাত পৃষ্ঠা ৪৮।

আমীর আমর কুদ্দিসা সিররুহু

তিনি হজরত আমীর কুলাল কুদ্দিসা সিররুহু'র চতুর্থ সাহেবজাদা। হজরত আমীর কুলাল র. তাঁর তরবিয়তের দায়িত্ব ন্যস্ত করেন শায়েখ জামালউদ্দিন দাহাস্তানী র. এর উপর। আমীর আমর র. কারামাতের অধিকারী ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় স্বীয় নফসের হিশাবে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি চিন্তাশীল ও আত্মমর্যাদাশালী ছিলেন।

বাণী ঃ তিনি বলেন, আকাবেরে আউলিয়াগণ বলতেন, যখন গাভীর মাথা কাটার সময় হয় অর্থাৎ জবাইয়ের সময় হয়, তখন তাকে শস্য গোলার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। যখন কাষ্ঠখণ্ড জ্বালানোর সময় হয়, তখন প্রাচীরের উপর রেখে যখন ইচ্ছা তখন বের করে আনা হয়। রাশহাত পৃষ্ঠা ৪৮।

মাওলানা আরেফ দেগ গেরানী কুদ্দিসা সিররুহু

তিনি হজরত আমীর কুলাল কুদ্দিসা সিররুহুর দ্বিতীয় খলিফা। তাঁর জন্মস্থান ও আবাস কেন্দ্র দেগ গেরানে, যা হাজারা প্রদেশের কোহাকের প্রান্তে অবস্থিত। সেখান থেকে বোখারা নয় ক্রোশ দূরে। তাঁর আলোকিত মাজার শরীফ হাজারা গ্রামের রাস্তার পাশেই অবস্থিত। রাশহাত পৃষ্ঠা ৪৮।

আদব ঃ হজরত আমীর কুলাল কুদ্দিসা সিররুহু প্রায়শঃ বলতেন, আমার মুরিদগণের মধ্যে খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দ এবং মাওলানা আরেফ দেগ গিরানীর মতো আর কেউ নেই। এরা দুজন সকলের অগ্রগামী। হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দ র. হজরত আমীর কুলাল র. থেকে খেলাফত লাভের পর সাত বছর পর্যন্ত মাওলানা আরেফের সোহবতে থাকেন। তাঁর আদব ও সম্মান রক্ষা করে সুলুকের রাস্তা পাড়ি দেন। তিনি ওজু করার সময়ও কখনো শায়েখ থেকে উঁচু স্থানে বসতেন না। পথ চলার সময় তাঁর পশ্চাতে চলতেন। সর্বদাই তাঁকে অনুসরণ করতেন। কেনোনা হজরত আমীর কুলালের সান্নিধ্যে থাকা অবস্থায় হজরত মাওলানার মর্তবা ও মর্যাদা ছিলো শীর্ষস্থানে। হজরত খাজার কয়েক বছর পূর্বেই মাওলানা আমীর কুলাল র. এর তরবিয়তের মাধ্যমে পূর্ণতার দরজায় উপনীত হন। হজরত খাজা বলেন, যখন আমরা জিকরে খফিতে মশগুল থাকতাম এবং আমাদের মধ্যে চেতনাবোধ জাগ্রত হতো, তখন আমরা মূল বিষয়ের অন্বেষণে থাকতাম। তেইশ বছর যাবত এই মূল বিষয়ের অনুসন্ধানেই ছিলাম। দুইবার হজের সফর করেছি। চারদিকে অনুসন্ধান করেছি, যদি

কোথাও মাওলানা আরেফের মতো কাউকে পেতাম, তাহলে আমরা ফিরে আসতাম না। এমন একজন বিনয়ী ব্যক্তির অনুসন্ধানে ছিলাম, যিনি সায়েরের ক্ষেত্রে আকাশ ভেদ করেছেন এবং জাহের ও বাতেনে সিদ্ধি লাভ করেছেন।

বাণী ঃ তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি শুধু নিজের ফিকিরে ব্যস্ত, সে দোজখে আছে। আর যে ব্যক্তি তকদীরে এলাহীতে বিশ্বাসী, সে বেহেশতী। রাশহাত পৃষ্ঠা ৪৯।

আহারের সময় জিকির ঃ একদিন মাওলানা সাহেব তাঁর মুরিদগণকে বললেন, আহারের সময় প্রতিটি অঙ্গ নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে। তখন দিল্ কোন্ কাজে ব্যস্ত থাকে? তিনি বলেন, সেই সময় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা জিকির নয়। বরং সেই সময়ের জিকির হলো এই সকল উপকরণের সৃষ্টিকর্তা ও নেয়ামত প্রদানকারীর প্রতি দৃষ্টি রাখা। রাশহাত পৃষ্ঠা ৪৯।

বাণী ঃ একদা এক ব্যক্তি মাওলানার নিকটে এসে বললো, আমার অমুক কাজটি যদি আপনার দোয়ার বরকতে সমাধা হতো। মাওলানা তার কথাটি গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন, দায়িত্বগ্রহণ ওই প্রয়োজনওয়ালা ব্যক্তিরই কাজ। তার মোবারক হিম্মত দ্বারাই তা পূর্ণ হয়। দায়িত্বগ্রহণ আমার কাজ নয়। এমন সাহস আমার নেই। রাশহাত পৃষ্ঠা ৪৯।

কারামত ঃ একবার দেগ্গেরান গ্রামে কোহাক থেকে পানির ঢল নামলো। গ্রাম ভেসে যাওয়ার উপক্রম হলো। লোকজন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ফরিয়াদ করতে লাগলো। মাওলানা লোকজনের চিৎকার শুনে বের হয়ে এলেন এবং যে স্থান দিয়ে তীব্র স্রোত নেমে আসছিলো, সেখানে দাঁড়িয়ে বললেন, হে পানি! শক্তি থাকলে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাও। সাথে সাথেই স্রোত থেমে গেলো এবং সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

বাণী ঃ একবার হজরত খাজা নক্শবন্দ কুদ্দিসা সিররুহু মাওলানা বাহাউদ্দিন কাশ্লাকী কুদ্দিসা সিররুহুর সোহবতে ছিলেন। তিনি এলমে জাহের, এলমে বাতেন ও কারামতের অধিকারী ছিলেন এবং হজরত খাজার পীর-মোর্শেদ ও শায়খুল হাদিস ছিলেন। একবার কথার এক ফাঁকে তিনি বললেন, এমন উঁচুতে উঠানেওয়ালা আপনি, না আপনার বন্ধু মাওলানা আরেফ দেগগেরামী। হজরত খাজা বললেন, হায়! যদি আজই মাওলানার সান্নিধ্য পেতাম। মাওলানার সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষা হজরত খাজার উপর প্রবল হলো। ওই সময় মাওলানা আরেফ নিজ গ্রামে মুরিদগণকে নিয়ে তুলা চাষে

লিপ্ত ছিলেন। মাওলানা বাহাউদ্দিন কাশ্‌লাকী বলেন, তুমি যদি হজরত মাওলানা আরেফের সাক্ষাতের অতি আগ্রহী হও, তাহলে আমি তাঁকে ডেকে দিচ্ছি। তিনি অবশ্যই চলে আসবেন। তিনি 'হে মাওলানা আরেফ' বলে তিন বার ডাক দিলেন। মাওলানা সাথে সাথেই তুলা বপন থেকে বিরত হলেন। মুরিদগণকে বললেন, তোমরা বাড়ি চলে যাও। আমাকে মাওলানা বাহাউদ্দিন কাশ্‌লাকী ডেকেছেন। তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন। চুলা থেকে ডেক নামানোর পূর্বেই হজরত মাওলানা সেখানে উপস্থিত হলেন। অথচ দেগ্‌গেরান এবং কাশ্‌লাকের মধ্যে দূরত্ব ছিলো বিশ ক্রোশ। হজরত খাজা ও মাওলানা আরেফ র. এর মধ্যে এই প্রথম সাক্ষাৎ সংঘটিত হলো।

শায়েখ ইয়াদ্‌গার কুদ্দিসা সিররুহু ঃ তিনি ছিলেন হজরত আমীর কুলাল র. এর তৃতীয় খলিফা। তাঁর নিবাস ছিল কুনসারান গ্রামে, যা বোখারা শহর থেকে দুই ক্রোশ দূরে। হজরত আমীর শাহ কুদ্দিসা সিররুহু তাঁর তরবিয়ত ও সান্নিধ্যে থেকে আত্মশুদ্ধির উচ্চশিখরে উপনীত হন। রাশহাত পৃষ্ঠা ৫১।

শায়েখ জামাল উদ্দিন দাহাস্তানী কুদ্দিসা সিররুহু ঃ তিনি ছিলেন হজরত আমীর কুলাল র. এর চতুর্থ খলিফা। হজরত আমীর কুলাল র. এর চতুর্থ ছেলে আমীর আমরকে তাঁর তরবিয়ত ও সান্নিধ্যে প্রেরণ করেন। হজরত আমীর আমর র. তাঁর তরবিয়ত ও সান্নিধ্যে থেকে তরিকতের পূর্ণতার উচ্চস্তরে উপনীত হন। হজরত আমীর কুলাল র. এর এই চারজন বিশিষ্ট খলিফা ছাড়াও আরও খলিফা ছিলেন।

শায়েখ মোহাম্মদ ছিলেন হজরত আমীর কুলাল র. এর উল্লেখযোগ্য খলিফা ও প্রধান মুরিদগণের একজন। হজরত আমীর কুলাল র. মনে করতেন, তাঁর তালেবান ও মুরিদগণকে তিনি তরবিয়ত করবেন। হজরত শায়েখ শামসুদ্দিন হজরত আমীর কুলাল র. এর উচ্চপর্যায়ের মুরিদ ছিলেন। সফরে তিনি আমীর কুলাল র. এর সাথী হতেন। কুরশি গ্রাম থেকে কাফাশ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যেতেন। ইরাকী মাশায়েখগণ তাঁর সোহবতে থাকতেন। মাওয়ারাউন্নাহারে মোরাকাবা করতেন। সেখানে তাঁর প্রসিদ্ধি ও পরিচিতি বৃদ্ধি পায়। মাওলানা আলাউদ্দিন হজরত আমীর কুলাল র. এর বিশিষ্ট মুরিদ ছিলেন। হজরত দারাজুনী (যিনি এলমে জাহের ও এলমে বাতেনে পরিপূর্ণ ছিলেন), হজরত মাওলানা বাহাউদ্দিন তাওয়ালেসী, শায়েখ বদরউদ্দিন মিরানী, মাওলানা সুলায়মান, শায়েখ আরমান, খাজা মোহাম্মদ প্রমুখ হজরত খাজা আমীর কুলাল র. এর মুরিদ ছিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁদের আসরারকে (রহস্যকে) পবিত্র করুন। আমীন। রাশহাত পৃষ্ঠা ৫১-৫২।

হজরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী কুদ্দিসা সিররুহু

তিনি হজরত বাহাউল হক ওয়াদ্দিন হজরত নক্শবন্দ কাদ্দাসাল্লাহু সিররুহুল আজীজ এর হাতে বায়াত হন। তাঁর আদি নিবাস চরখে, যা গজনীর একটি গ্রাম। তাঁর মাজার শরীফ হাসার এলাকায়।

প্রথম জীবনে তিনি জামে হেরাতে আর পরবর্তী জীবনে মিসরে লেখপড়া করেন এবং শায়েখ জয়নুদ্দিন খাওয়ানী কুদ্দিসা সিররুহুর সাথে একই শ্রেণীতে লেখাপড়া করতেন। তাঁরা উভয়ে হজরত মাওলানা শিহাবুদ্দিন সিরাজী র. এর দরবারে উপস্থিত হন। তিনি তখনকার সময়ের বড় আলেম ছিলেন। তাঁরা উভয়ে তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁরা উভয়ে বন্ধু ছিলেন।

বাণী ঃ তিনি বলেন, হজরত খাজার সিলসিলায় প্রবেশের পূর্বেই তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা ছিল। বড় বড় আলেমে দ্বীন থেকে ফতোয়া অর্জনের পূর্বেই আমি মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেছিলাম। হঠাৎ একদিন হজরতের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আবেদন করলাম, আমার প্রতি হজরতের কৃপাদৃষ্টি কামনা করি। তিনি বললেন, কোন্ উদ্দেশ্যে এখানে এসেছো? আমি বললাম, আপনার খেদমত করার আকাঙ্খায়। হজরত বললেন, কেনো? আমি বললাম, আপনি বুজর্গ মানুষ। সকলের কাছেই প্রিয়। তিনি বললেন, এই কথার কোনো দলিল-প্রমাণ আছে কি? হতে পারে এটা শয়তানের ওয়াস্ওয়াসা। আমি বললাম, সহীহ্ হাদিসে এসেছে, মহান আল্লাহ্তায়ালা যখন কোনো বান্দাকে নির্বাচন করেন অর্থাৎ ভালোবাসেন, তখন তাঁর ভালোবাসা সকল বান্দাদের দিলে প্রবিষ্ট করিয়ে দেন। তিনি এই কথা শুনে মৃদু হাসলেন। বললেন, আমরা আজিজান। এই কথা শুনেই আমার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেলো এই কারণে যে, ইতোপূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম কেউ আমাকে বলেছিলেন, আজিজানের মুরিদ হও। এখন সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়লো। আমি হজরত খাজাকে বললাম, আমার কলবে তাওয়াজ্জোহ্ দিন। একথা শুনে তিনি বললেন, এক ব্যক্তি হজরত আজিজানকে বলেছিলেন, আমাকে স্মরণ রাখবেন। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছু স্মরণ থাকে না। তুমি কিছু রেখে যাও। সেই বস্তু দেখলে তোমার কথা স্মরণ হবে। কিন্তু তোমার কাছে তো এমন কিছুই

দেখছি না, যা তুমি আমার কাছে রেখে যেতে পারো। এই বলে তিনি নিজেই তাঁর টুপি মোবারক আমাকে দিয়ে বললেন, এটাকে যত্ন সহকারে হেফাজত করবে। এটা দেখলে আমার কথা মনে হবে। আর আমার কথা মনে হলেই আমার দরবারে উপস্থিত হয়ে যাবে। এরপর বললেন, কোলকীর জংগলে অবশ্যই মাওলানা তাজুদ্দিনের সাথে সাক্ষাৎ করবে। কেনোনা তিনি এই জামানার ওলীদের একজন। আমার ইচ্ছা ছিলো বলখে যাবো এবং সেখান থেকে নিজ বাড়িতে যাবো। কোথায় বলখ আর কোথায় কোলকী? আমি তাঁর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বলখের দিকে রওয়ানা হলাম। ঘটনাক্রমে বিশেষ কারণে কোলকীতে যেতে হলো। তখন হজরত খাজার নির্দেশ আমার মনে পড়ে গেলো। আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম। এক পর্যায়ে মাওলানা তাজুদ্দিন এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। মাওলানার সাথে সাক্ষাতের পর হজরত খাজার প্রতি আমার ভালোবাসা অনেক গুণে বৃদ্ধি পেলো। এমন কিছু কারণ ঘটে গেলো যে, আমাকে পুনরায় হজরত খাজার সাক্ষাতের জন্য বোখারায় যেতে হলো। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, হজরত খাজার হাতে বায়াত হবো। বোখারায় একজন মজ্জুব ছিলেন। তাঁর সাথে আমার খুব সখ্য ছিলো। রাস্তায় তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম। তাঁকে বললাম, বোখারায় যাবো কি? তিনি বললেন, জলদি যাও। মাটিতে কিছু রেখা টানলেন, আমি মনে মনে ভাবলাম, এই রেখাগুলো গণনা করবো। যদি বেজোড় সংখ্যা হয়, তাহলে সেটা হবে আমার খেয়াল সত্য হওয়ার প্রমাণ। কেনোনা আল্লাহ্তায়ালা বেজোড় আর তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন। সংখ্যাগুলো গণনা করে বেজোড় সংখ্যা পেলাম। এরপর পূর্ণ বিশ্বাস ও ভালোবাসা নিয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হলাম এবং হজরত খাজার নিকট আমার মনের বাসনা ব্যক্ত করলাম।

হজরত বললেন, আমি নিজের পক্ষ থেকে কাউকে কবুল করি না। দেখি, আজ রাতে তোমার ব্যাপারে কী নির্দেশ আসে। যদি দয়াময় আল্লাহ্তায়ালা তোমাকে কবুল করেন, তাহলে আমিও কবুল করবো।

ওই রাতটি আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন রাত ছিলো। আমাকে কবুল করা হবে কিনা— এ বিষয়ে দোদুল্যমান ছিলাম। সকালে ফজরের নামাজের পর হজরত আমাকে বললেন, মোবারকবাদ! গ্রহণের জন্য ইশারা করা হয়েছে। আমরা সহজে কাউকে কবুল করি না। বিভিন্ন জন বিভিন্ন

নিয়তে এসে থাকে। এরপর তিনি মাশায়েখগণের ধারাবাহিকতা হজরত খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানী র. পর্যন্ত বর্ণনা করলেন। আমাকে তাসবীহের আমল দিলেন। বললেন, যথাসম্ভব বেজোড় সংখ্যক গণনা করবে। এরপর সেই নিদর্শনের দিকে ইশারা করলেন, যেটাকে আমি হক হওয়ার দলিল মনে করতাম। হজরত আমাকে বললেন, এটা এলমে লাদুন্নির প্রথম সবক, যা হজরত খিজির আ. হজরত আবদুল খালেক গজদাওয়ানীকে দান করেছিলেন। রাশহাত পৃষ্ঠা ৬৭।

বাণী ঃ হজরত মাওলানা স্বীয় কিতাব 'মানাকিব' এর ভূমিকায় লিখেন, আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে যখন বান্দার দিলে তলব (মওলার অনুসন্ধান) সৃষ্টি হলো, তখন অসংখ্য আকর্ষণ জাগ্রত হলো। তখন আল্লাহ্ কৃপা করে খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দের সান্নিধ্যের দিকে টেনে নিলেন। তখন আমি বোখারায় তাঁর খেদমতে ছুটে এলাম। হজরত খাজার অনুকম্পায় আমি তাঁর তাওয়াজ্জোহ্ ও নেক দৃষ্টি পেলাম। এমনকি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে গায়েবী ইশারা মারফত আমি বুঝতে পারলাম, তিনি আল্লাহ্‌র ওলী। তিনি কামেল ও মোকাম্মেল। অনেক ঘটনা ও কালামে এলাহী থেকে নকলি দলিল পেলাম। যথা, এই আয়াত—

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ -

(উহাদিগকেই আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন, সুতরাং তুমি তাহাদের পথের অনুসরণ করো। সূরা আনআম আয়াত ৯০)।

দ্বিতীয় দিন আমার নিবাসস্থল ফাতাহাবাদে হজরত শায়েখ সাইফুদ্দিন বোখরাজি কুদ্দিসা সিররুহুর দিকে মনোনিবেশে করলাম। আল্লাহ্‌র দরবারে তা দ্রুত কবুল হয়ে গেলো ও আমার হৃদয়কে অস্থির করে তুললো। আমি হজরতের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলাম। আমি হজরতের আবাসস্থল কাসরে আরেফানে পৌঁছলাম। হজরতকে রাস্তায় দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলাম। হজরতের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো এবং মাগরিবের নামাজের পর তিনি আমাকে তাঁর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ দিলেন। হজরতের ব্যক্তিত্ববোধ আমার উপর এমন প্রভাব ফেললো যে, কথা বলার সাহস হারিয়ে ফেললাম। কথার ফাঁকে হজরত শায়েখ বললেন, হাদিস শরীফে এরশাদ হয়েছে—

এলেম দুই প্রকার— ১. হৃদয়ের এলেম। এটাই উপকারী এলেম। এটাই নবী-রসূলগণের এলেম। ২. জবানী এলেম। এটা বনী আদমের উপর আল্লাহ্র দলিল।

আমি আশা করছি এলমে বাতেনের অংশ তোমার মিলবে। এরপর তিনি বললেন, হাদিস শরীফে এসেছে— তোমরা যখন সত্যবাদীদের সাথে বসবে, তখন সততার সাথে বসবে। কেনোনা তাঁরা হৃদয়ে কল্পিত বিষয়ের অবলোকনকারী। তাঁরা তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। তোমাদের সাহস দেখেন।

বেশ কিছু দিন হজরত খাজার সান্নিধ্যে অতিবাহিত হলো। অতঃপর হজরত খাজা আমাকে বোখারা থেকে প্রস্থানের অনুমতি দিলেন। বললেন, যা কিছু আমার থেকে তোমার নিকট পৌঁছেছে, তা আল্লাহ্র বান্দাদের নিকট পৌঁছানোই সৌভাগ্যের কারণ হবে। বিদায়ের সময় হজরত খাজা আমাকে বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করলাম। এই সমর্পণের মধ্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে— যখন কোনো ব্যক্তি কাউকে আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করেন, তখন আল্লাহ্তায়ালা তাকে হেফাজত করেন। আমি বোখারা শহর থেকে বের হয়ে কেশ শহরে পৌঁছে সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করলাম। সেই সময়ই হজরত খাজার ইন্তেকালের সংবাদ আমার কাছে পৌঁছলো। এই সংবাদ আমার হৃদয়ে বিশাল আঘাত হানলো। আমার মনে হতে লাগলো, আমার সব কিছুই হারিয়ে গেলো। আমি হজরত খাজাকে স্বপ্নে দেখতে পেলাম। তিনি হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিস আলোচনা করছেন এবং এই আয়াতটি পাঠ করছেন—

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ

(মোহাম্মদ একজন রসূল মাত্র, তাহার পূর্বে বহু রসূল গত হইয়াছে সুতরাং যদি সে মারা যায়, বা নিহত হয়, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে? সূরা আলে ইমরান আয়াত ১৪৪)।

এরপর যখন হজরত খাজার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হলাম, তখন অনেক চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম, এই জামানার অন্য কোনো দরবেশের নিকট যাবো। এরপর আবার হজরত খাজাকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি হজরত

যায়েদ ইবনে হারেছা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস বর্ণনা করছেন এভাবে— হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা রা. বলেন, ধর্ম একটিই। এই হাদিসের মর্মবাণী দ্বারা বুঝতে পারলাম যে, অন্য কারো কাছে যাওয়ার অনুমতি নেই।

হজরত খাজার সাহাবীদের মধ্য থেকে হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা রা. এর হাদিস বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো, হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা রা. ছিলেন রসূল স. এর পালক পুত্র। আর হজরত খাজেগানরাও শিষ্য-মুরিদানদেরকে নিজেদের রূহানী সন্তান মনে করেন। এজন্য হজরত খাজেগানদের মুরিদগণ অন্যদের তুলনায় বিশেষ বা স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

দ্বিতীয়বার আমি যখন হজরত খাজাকে স্বপ্নে দেখলাম, তখন জিজ্ঞেস করলাম, কিয়ামতে আপনাকে কোন্ জিনিসের বিনিময়ে পাবো? তিনি বললেন, শরীয়তের আমল করার দ্বারা। এই কথা ওই দিকেই ইংগিত করে, অর্থাৎ কোরআন-হাদিসের অনুসরণ করা। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র অনুকম্পায় আমরা যা কিছু পেয়েছি, তা শুধুই দয়া। কল্যাণকর যা, তা হলো কোরআন ও হাদিসের আমল করার দ্বারা, আমল থেকে ফলাফল বের করার দ্বারা, তাকওয়া বা শরীয়তের সীমার মধ্যে আমল করার দ্বারা, সুন্নত তরিকায় আমল করার মাধ্যমে, সংঘবদ্ধভাবে চলা ও বেদআত থেকে বেঁচে থাকার দ্বারাই।

হজরত খাজা যখন এই ফকিরকে বোখারা থেকে সফর করার অনুমতি দিলেন, হজরত খাজা আলাউদ্দিন আত্তারের ডাকে তিনি আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর অনুসরণ-অনুকরণের আদেশ করেছিলেন। আমি বোখারা থেকে কুশ নগরীতে পৌঁছলাম। কুশ নগর থেকে বদখ্‌শানে গেলাম। সেখান থেকে চরখে গিয়ে এলেম অন্বেষণে লিপ্ত হলাম। আল্লাহ্‌র অনুকম্পায় আলাউদ্দিন আত্তার বোখারা থেকে এক দূতের মাধ্যমে এই ফকিরের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাতে তাঁর অনুসরণের বিষয়টি উল্লেখ করেন। তাই আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তাঁর অনুগ্রহের দৃষ্টি অন্যদের তুলনায় এই ফকিরের উপর অধিক ছিলো। আমি তাঁর সান্নিধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করলাম। তাঁর ইন্তেকালের পর আমার মনে হলো হজরত খাজার নির্দেশ ছিলো— আমাদের নিকট থেকে তোমার কাছে যা পৌঁছেছে, তা আল্লাহ্‌র বান্দাদের নিকট পৌঁছে দাও। এই কাজে যথাসম্ভব চেষ্টা করতে থাকো। ফকির নিজেকে এই কাজের যোগ্য মনে করতো না। কিন্তু এই বিশ্বাস ছিলো যে, হজরত খাজার বাণী প্রজ্ঞাশূন্য নয়। ইনসিয়্যাহ পৃষ্ঠা ৪৭৩।

বাণী ঃ হজরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার কুদ্দিসা সিররুহু বর্ণনা করেন, একদিন মাওলানা ইয়াকুব চরখী এই ফকিরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা খোরাশান প্রদেশে থাকেন। লোকজন বলে যে, হজরত শায়েখ জয়নুদ্দিন খানী মুরিদগণের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। স্বপ্নকে ধর্তব্য বিষয় মনে করেন। এই কথা কি ঠিক? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি স্বপ্নকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। একথা শুনে মাওলানা স্বীয় হাত স্বীয় দাড়িতে রাখলেন এবং তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। তিনি প্রায়ই এমন অবচেতন হয়ে পড়তেন। সেদিন এই অবস্থায় তাঁর মাথা মোবারক আমার বক্ষদেশে পতিত হলো। দুই তিনটি কেশ মোবারক তাঁর আঙুলে আটকে থাকলো।

কারামত ১ ঃ হজরত উবায়দুল্লাহ আহরার র. বর্ণনা করেছেন, হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দ র. বলেছেন, সুলুকের প্রথম দিকে আমাকে বলা হলো তুমি এই পথ কীভাবে অতিক্রম করতে চাও? আমি বললাম, আমি যা চাইবো তা-ই যেনো হয়। আমার কথার উত্তর দেওয়া হলো এভাবে— আমি যা চাইবো তা-ই হবে। আমি বললাম, তাহলে আমার দ্বারা এটা হবে না। এরপর পনেরো দিন আমাকে আমার অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া হলো। আমার অবস্থা খারাপ হলো। শরীর শুষ্ক ও দুর্বল হয়ে পড়লো। বিষয়টি প্রায় নৈরাশ্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলো। এরপর মহান প্রভুপালকের পক্ষ থেকে সম্বোধন করা হলো— তুমি যেভাবে চাইবে সেভাবেই হবে।

'মাকামাতে হজরত খাজা' গ্রন্থে ঘটনাটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু হজরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী কুদ্দিসা সিররুহু বিষয়টি বর্ণনা করেন এভাবে— যখন এই সম্ভাষণ করা হলো 'তুমি যা চাইবে তাই হবে' তখন আমি ওই পন্থাই অবলম্বন করলাম, যা আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

কারামত ২ ঃ হজরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার র. বর্ণনা করেন, এক সওদাগর মাওলানা ইয়াকুব চরখী র. এর ভক্ত ছিলেন। আমি তাঁর কাছেই মাওলানার প্রশংসা শুনতে পেলাম। মাওলানার সান্নিধ্যে থাকার জন্য হুলতাগুরের দিকে রওয়ানা করলাম। চুগনিয়া প্রদেশে পৌঁছলাম। সেখানে বিশ দিন পর্যন্ত জ্বরে আক্রান্ত ছিলাম। দুর্বলতার কারণে সেখান থেকে রওয়ানা হতে পারছিলাম না। সেখানে কতিপয় লোক মাওলানা ইয়াকুব চরখীর গীবত করলো। অসুস্থ অবস্থায় তাঁর ব্যাপারে মন্তব্য শোনার কারণে আমার অন্তর থেকে তাঁর প্রতি ভালোবাসা স্তিমিত হলো। শেষে আমার ধারণা হলো, এতো দূর থেকে আসার পর মাওলানার খেদমতে উপস্থিত

না হয়ে চলে যাওয়া ঠিক হবে না। আমি মাওলানার খেদমতে উপস্থিত হলাম। তাঁর স্নেহ-ভালোবাসা পেলাম। মনোমুগ্ধকর বাণী শুনলাম। দ্বিতীয় দিন তিনি ক্রোধান্বিত অবস্থায় এলেন ও কঠোরতা প্রকাশ করলেন। আমি বুঝত পারলাম, মাওলানার এই ক্রোধ ও কঠোরতার কারণ তাঁর গীবত শোনার পর তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও আকর্ষণের কমতি, যদিও আমার আচরণে তা প্রকাশ পায়নি। এরপর তিনি বললেন, এটা কি সমীচীন যে, কোনো লোক কারো সাথে সাক্ষাতের জন্য দুই মাসের পথ সফর করে এলো, অথচ সাক্ষাৎ না করে চলে গেলো। এবার আমি স্পটই বুঝতে পারলাম, এই রাগের কারণ হলো ওই গীবত শোনা ও তাঁর প্রতি ভালোবাসা দুর্বল হওয়া। একটু পরেই তিনি আবার নম্র ও কোমল ভাষায় কথা বললেন। তিনি হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দ র. এর খেদমতে উপস্থিতির ঘটনা বর্ণনা করলেন। এরপর তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এসো, আমার হাতে বায়াত হয়ে যাও। আমার স্বভাব এটা পছন্দ করলো না। আর হজরত মাওলানার কপালে একটি শুভ্র দাগ ছিল। এক দৃষ্টিতেই তিনি আমার স্বভাবের অপছন্দনীয় বিষয়গুলো অবগত হয়ে হাত গুটিয়ে নিলেন। স্বীয় আকৃতিকে এমনভাবে প্রকাশ করলেন যে, আমি অভিভূত হলাম। মনে হলো তাঁকে জড়িয়ে ধরি। এরপর তিনি স্বীয় হস্ত প্রসারিত করলেন এবং বললেন, হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দ র. আমার হাত ধরে বলেছিলেন, তোমার হাত আমারই হাত। যে তোমার হাত ধরলো, নিশ্চয়ই সে বাহাউদ্দিনের হাত ধরলো। আমি তৎক্ষণাৎ মাওলানার হাত ধরলাম। হজরত আমাকে কিছু আমল ওযীফা দিলেন।

হজরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী র. এর স্বরচিত একটি তাফসীর রয়েছে। এছাড়া তিনি অসংখ্য গ্রন্থের প্রণেতা। ৮৩৮ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। হালতাগুর নামক স্থানে তিনি সমাধিস্থ হন। বলাবাহুল্য, মাওলানা ইয়াকুব চরখী ব্যতীত খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দের আরও অনেক খলিফা ছিলেন। এবার তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা শুরু হলো।

খাজা আলাউদ্দিন গজদাওয়ানী কুদ্দিসা সিররুহু

হজরত খাজা আলাউদ্দিন গজদাওয়ানী র. হজরত বাহাউদ্দিন নক্শবন্দ র. এর অন্যতম মুরিদ ও খলিফা ছিলেন। তিনি গজদাওয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তুলমুর্জা নামক স্থানে তাঁর মাজার শরীফ অবস্থিত, যা বোখারা থেকে দক্ষিণ দিকে ঈদগাহের নিকটবর্তী একটি স্থান। সেই গ্রামে

একটি টিলা রয়েছে। তিনি সেখানেই সমাধিস্থ হন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ষোলো বছর বয়সে হজরত আমীর কুলাল ওয়াশী র. এর কাছে পৌঁছেন, যিনি সাইয়্যেদ আমীর কুলাল র. এর খলিফা ছিলেন। তিনি তাঁর নিকট থেকেই জিকিরের তালিম পেয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি যৌবন কালেই হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ র. এর খেদমতে পৌঁছেন ও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেন। হজরত খাজা বাহাউদ্দিনের ইন্তেকালের পর তাঁর সুসংবাদ ও ইশারাতেই বাকি জীবন হজরত খাজা মোহাম্মদ পারসা ও খাজা বোরহানউদ্দিন আবু নসরের সান্নিধ্যে থাকেন। এই দুই বুজর্গ তাঁর সান্নিধ্যকে গনিমত মনে করতেন।

খাজা আলাউদ্দিন মিষ্টভাষী ছিলেন। সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রেমে ডুবে থাকতেন। কথা বলতে বলতে নিজেকে বিলীন করে দিতেন। অধিক সময় জিকিরে মশগুল থাকতেন। অধিক সময় জিকিরে লিপ্ত থাকার কারণে তিনি নিজেই নেসবতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি একই বৈঠকে পা উঠানা ছাড়া সারারাত অতিবাহিত করতে পারতেন অথচ তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো নব্বই বছর। অত্যন্ত দুর্বলও হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

বাণী ঃ খাজা আলাউদ্দিন বলেন, যখন থেকে আমার বোধশক্তি হলো, তখন থেকে আমি আল্লাহ্‌র জিকির থেকে এতোটুকু সময় উদাসীন হইনি, যতোটুকু সময় চড়ুই পাখি পানি পান করার জন্য ঠোঁট পানির মধ্যে ডোবায়। জাগ্রত ও ঘুমন্ত কোনো অবস্থাতেই আমি আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে উদাসীন হইনি। রাশহাত পৃষ্ঠা ৬৯।

শায়েখ সিরাজুদ্দিন পীর মাস্তি কুদ্দিসা সিররুহু

তিনি হজরত খাজার দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান পীর মাস্ত নামক স্থান। এটা ওয়াবকান এলাকায় অবস্থিত, যা বোখারা থেকে চার ক্রোশ দূরে। তিনি প্রথমে হজরত আমীর হামজার মুরিদ ছিলেন। পরবর্তীতে নক্‌শবন্দিয়া তরিকায় প্রবেশ করেন। বর্ণিত আছে, মাওলানা সা'দুদ্দিন কাশগড়ী জীবনের প্রারম্ভে তরিকায়ে নক্‌শবন্দিয়ার নফী এসবাত জিকির করতেন।

কথিত আছে, তিনি হজরত আমীর হামজার সান্নিধ্যে প্রাথমিক কালে অনেক সাধনা ও মেহনত করতেন। একবার তাঁর অবস্থা এমন হলো যে, একটানা তিন দিন তিন রাত ধরে তিনি বেহুঁশ হয়ে রইলেন। তাঁর এই

অবস্থা হজরত আমীর হামজাকে জানানো হলে তিনি বললেন, তাঁর কানে কানে বলে দাও যে, আমীর হামজা বলেছেন, তুমি যেখানে পৌঁছেছো সেখান থেকে ফিরে এসো। হজরতের এই কথা তাঁর কানে পৌঁছানো হলে তাঁর হুঁশ ফিরে আসে।

হজরত খাজা আহরার কুদ্দিসা সিররুহু বর্ণনা করেন, শায়েখ সিরাজুদ্দিনের নিয়ম ছিলো— দিনের বেলায় মাটির পাত্র তৈরী করতেন। আর রাতে এভাবে মোরাকাবায় বসতেন যে, এক পা থেকে অন্য পায়ে ভর দিতেন না।

তিনি বড় বড় কিতাব খুব কমই পড়তেন। কিন্তু তাঁর কথা এমন তথ্যমূলক ও প্রাঞ্জল ছিলো যে, সেই যুগের বড় বড় পণ্ডিত ও দরবেশগণের মজলিশে এ সকল জ্ঞানের কথা শোনা যেতো না।

কারামত ১ ঃ মেহমান আগমনের সামান্য পূর্বে তিনি চারপাশ ঝাড়ু দিতেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, একটি জিন আমার অনুগত। মেহমান আসার পূর্বেই আমাকে আগমনকারী সম্পর্কে জানিয়ে দেয়। তিনি নিজের অবস্থা গোপন রাখার জন্যই এরূপ বলেছিলেন।

কারামত ২ ঃ একদা শায়েখ আবুল হাসান ইশ্‌কীর মুরিদগণের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। ওই দরবেশগণ মনে করলেন, তিনি তাঁদেরকে মুরিদ বানাতে চান। তাঁরা বললেন, হে শায়েখ! আপনি সময়ক্ষেপণ করবেন না। আমরা শায়েখ আবুল হাসানের মহব্বতে মাতোয়ারা। তাঁদের কথায় তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ আহত হলো। তিনি তাঁদের হৃদয়ে এমন প্রভাব বিস্তার করলেন যে, তাঁরা জমিনে লুটিয়ে পড়লেন। নিজেদের জামার কলার ছিঁড়তে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ তাঁরা বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে থাকলেন। এরপর তিনি তাঁদের উপর পুনরায় তাওয়াজ্জোহ দিলেন। তারা হুঁশ ফিরে পেলেন। তখন তাঁরা শায়েখকে খোশামোদ করতে লাগলেন। বিনয়ের সাথে মুরিদ হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, কোনো অসুবিধা নেই। আমি এবং শায়েখ আবুল হাসান একই ঝর্ণা থেকে পানি পান করে থাকি। রাশহাত পৃষ্ঠা ৭২-৭৩।

মাওলানা সাইফুদ্দিন মানারী কুদ্দিসা সিররুহু

তিনি মানার নামক গ্রামে অবস্থান করতেন, যা অবস্থিত ছিলো ফারকাত প্রদেশে। সমরকন্দ ও তাসকন্দ থেকে চার ক্রোশ দূরে। তিনি খাজা

বাহাউদ্দিন নক্শবন্দ র. এর উঁচুস্তরের মুরিদ ছিলেন। তাঁর উপর হজরত খাজার বিশেষ দৃষ্টি ও মনোনিবেশ ছিলো। তিনি তাঁর যুগের আল্লামা তথা মহাজ্ঞানী ছিলেন। জ্ঞানচর্চায় মশগুল থাকতেন। জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তিনি মাওলানা হামিদুদ্দিন শশীর শিষ্য ছিলেন।

মাওলানা সাইফুদ্দিন খোশখা বোখারী কুদ্দিসা সিররুহু

তিনি খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দ র. এর প্রিয় ও আস্থাভাজন ছিলেন। হজরত খাজার কাছে মুরিদ হওয়ার কারণ ছিলো এরকম— তিনি বোখারা থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে খাওয়ারিজমে গেলেন। সেখানে খাজা আলাউদ্দিন আত্তার কুদ্দিসা সিররুহুর সংস্পর্শে থেকে তাঁর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হলেন। যখন বোখারায় ফিরে এলেন, তখন হজরত খাজার সান্নিধ্যে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। তাঁর তরিকা শিখতে লাগলেন। পরিপূর্ণ মেহনতের সাথে তার সান্নিধ্যে আমলে লিপ্ত হলেন। পূর্ণ হিম্মতের সাথে হজরত খাজার নেসবতের দিকে মনোনিবেশ করলেন। পূর্বের শায়েখদের সান্নিধ্য বর্জন করলেন। হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দ র. এর বরকতে পূর্ণ স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হলেন।

খাজা আলাউদ্দিন আত্তার কুদ্দিসা সিররুহু

হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দ র. এর মেয়ের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। হজরত খাজা তাঁর দিকে বিশেষ নজর রাখতেন। নিজের কাছে বসিয়ে তাওয়াজ্জোহ্ দিতেন। তাঁকে পূর্ণতার স্তরে পৌঁছে দেন। আল্লাহ্তায়ালার আলোতে আলোকিত করে দেন। তিনি জীবদ্দশাতেই আল্লাহ্র আশেকদেরকে তাঁর দায়িত্বে ন্যস্ত করেন। তিনি বলতেন, আলাউদ্দিন আমার বোঝাকে অনেক হাল্কা করে দিয়েছে। অনেক আশেক যারা আল্লাহ্ থেকে অনেক দূরে ছিলেন, তারা তাঁর বরকতে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে ধন্য হয়েছেন। পূর্ণতার স্তরে পৌঁছেছেন। হজরত খাজার ইন্তেকালের পর তাঁর ভক্তবৃন্দ তাঁর হাতে বায়াত হয়েছিলেন। এমন কি খাজা মোহাম্মদ পারসা কুদ্দিসা সিররুহুও তাঁর হাতে বায়াত হন।

কথিত আছে, হজরত খাজা মোহাম্মদ পারসা তাওয়াজ্জোহ্ ও মোরাকাবায় অনেক বার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলতেন। হজরত খাজা আলাউদ্দিন হুঁশে থাকতেন। তিনি অনুভূতি ও সুস্থতাকে বিলুপ্ত হতে দিতেন

না। হজরত খাজা আলাউদ্দিন আত্তার হজরত খাজার প্রথম ও স্থলাভিষিক্ত খলিফা। তিনি বিশেষ তরিকার অধিকারী ছিলেন। তাঁর তরিকাকে আলাইয়া তরিকা বলা হতো। তাঁর পূর্ণ গুণাবলী, মর্যাদা, বাণী ও কারামত ছিলো অসংখ্য। এখানে সামান্য কয়েকটি নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করা হলো।

বাণী ঃ আমাদের শায়েখ মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. লিখেছেন, হজরত খাজা আলাউদ্দিন আত্তার নেসবতে বেলায়েত ও সিদ্দিকিয়াতের তরিকায় আল্লাহ্‌র সত্তার পথে ধাবিত হয়েছিলেন এবং চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি বাকার স্তরে উপনীত হয়েছিলেন। আর সেই বাকার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন কুতুবে এরশাদ। কেনোনা কুতুবে মাদারের ভিত্তি কুতুবে এরশাদের উপর। যতোক্ষণ পর্যন্ত এই মাকামে ফানা ও বাকা না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত কুতুবিয়াত অর্জিত হবে না। হজরত খাজা আলাউদ্দিন আত্তার ওই মাকামে পৌঁছার জন্য বিশেষ তরিকা উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁর খলিফাগণ তাঁর উদ্দেশ্যকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, সকল তরিকার মধ্যে নিকটতম তরিকা হলো তরিকায়ে আলাইয়া। এতে সন্দেহ নেই যে, তরিকায়ে আলাইয়ার মাধ্যমে খুবই সহজভাবে শেষ সীমানায় পৌঁছানো যায়। খুব কমসংখ্যক আউলিয়া এ পথ পাড়ি দিয়েছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনে কোনো তরিকা উদ্ভাবন একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। এটা শুধু তরিকায়ে খাস আলাইয়াই অর্জন করতে পারে। হজরত খাজা পারসা র. এবং মাওলানা ইয়াকুব চরখী র. উভয়ই খাজা আলাউদ্দিন আত্তারের সান্নিধ্যে থেকে এই তরিকায় চলতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর বুজর্গ পিতা খাজা হাসান আত্তার ও অন্যান্য খলিফা এই রাস্তা অতিক্রম করেছেন। তিনি তাঁর সালেকদেরকে এই পথে পরিচালিত করতেন।

হজরত খাজা মোহাম্মদ পারসা র. ও মাওলানা ইয়াকুব চরখী র. এই তরিকায় অংশ নিয়েছেন এবং তাঁর খলিফারাও সেই বরকতে ওই জামানায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই পথ অতিক্রমকারী শায়েখ দীনুরী তালেবদেরকে ফায়দা পৌঁছিয়েছেন। হজরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী র. জয্‌বা থেকে অদৃশ্য পর্যন্ত সায়েরে আনফুসির রাস্তায় মনোনিবেশ করেন। এ দ্বারা বুঝা যায়, খাজেগানদের জয্‌বা দুই ধরনের— ১. ওই জয্‌বা যা সঙ্গীদের রাস্তায় পরিচালিত করে। ২. খাস জয্‌বা অর্থাৎ যে পথে কেবল আলাউদ্দিন আত্তার চলেছেন।

কারামত ১. আল্লাহ্র দর্শন ঃ একদা ওলামাদের মধ্যে আল্লাহ্র দীদার হবে কি না— এ বিষয়ে আলোচনা চলছিলো। আলোচনাকারীরা হজরত খাজা আলাউদ্দিন আত্তার র.কে বিচারক নির্বাচন করলেন। তিনি দীদার অস্বীকারকারীদেরকে বললেন, তোমরা তিন দিন ওজুর সাথে আমাদের সান্নিধ্যে থাকো। তাঁরা তাই করলেন। তৃতীয় দিন তাঁদের অবস্থা এমন হলো যে, তাঁরা অস্তিত্ব হারিয়ে ফেললেন। আল্লাহ্ই ভালো জানেন, ওই অবস্থায় তাঁরা কী দেখেছেন। হুঁশ ফিরে আসার পর তাঁরা বলতে লাগলেন, আমাদের বিশ্বাস জন্মেছে যে, আল্লাহ্র দর্শন সত্য। এরপর থেকে তাঁরা কখনো হজরতের মজলিশ ত্যাগ করেননি।

বাণী ঃ অন্তিমকালে তিনি বলেন, আল্লাহ্র অনুকম্পা ও বুজর্গদের নেক দৃষ্টির ফলে আমি এমন স্তরে উপনীত হতে পেরেছি যে, ইচ্ছা করলে সকল আলমকে মকসুদে হাকিকির সাথে মিলিয়ে দিতে পারি।

ফানা ঃ হজরত বলেন, যদি সালেকের হৃদয় থেকে রাষ্ট্র ও ক্ষমতার লোভ দূর হয়ে যায়, অর্থাৎ পার্থিব বিষয়ের স্মৃতি বিদূরিত হয় তবে সে ফানার স্তরে উপনীত হতে পারে, অথবা সালেক নিজের অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেললেও ফানার স্তর লাভ করতে পারে। রাশহাত পৃষ্ঠা ৮১।

বাণী- মোর্শেদ ঃ তিনি বলেন, মোর্শেদের সাথে সম্পর্ক রাখা এক প্রকারের গায়রত— আত্মমর্যাদাবোধ। এজন্য আমি অবশেষে এই সম্পর্ককেও নিষেধ করি। এটা প্রাথমিকভাবে অগ্রসর হওয়ার মাধ্যম। মহান আল্লাহ্ ছাড়া সকল কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া সালেকের জন্য অত্যাবশ্যক। সকল বিষয়ে শুধু তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করতে হবে। রাশহাত পৃষ্ঠা ৮২।

রেয়াজত বা সাধনা ঃ সাধনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শারীরিক উন্নয়ন ও সম্পর্ক বর্জন করা। আলমে আরওয়াহ্ ও আলমে হকিকতের দিকে ধাবমান হওয়া।

সুলুক তথা আত্মশুদ্ধির পথে পরিভ্রমণ ঃ সুলুকের পথে চলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বান্দা নিজের ইচ্ছা ও উপার্জন থেকে ওই সম্পর্ককে বর্জন করবে, যা সুলুকের পথে প্রতিবন্ধক। ওই সকল সম্পর্ক একটি একটি করে বর্জন করতে থাকবে। কোনো সম্পর্কের সাথে স্থির হয়ে গেলে ও তাতে নিজের মন বসে গেলে সেই সম্পর্ক সুলুকের রাস্তায় প্রতিবন্ধক হয়। সুতরাং সেই সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা-তদবীর করবে। আমাদের খাজা যখন কোনো

নতুন কাপড় পরিধান করতেন, তখন বলতেন, এটা অমুকের অনুগ্রহ। কাজেই তার প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিধান করা উচিত।

তাওফিক ঃ তিনি বলেন, আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন, চেষ্টার সাথে তাওফিক সংশ্লিষ্ট। আর মোর্শেদের রূহানী তাওয়াজ্জোহ্ ওই সীমা পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। মুরিদগণ মোর্শেদের হুকুম অনুযায়ী আমল করবে, কিন্তু স্বীয় চেষ্টা ব্যতীত তার বাকা অর্জিত হবে না। রাশহাত পৃষ্ঠা ৮৪।

কান্নাকাটি ঃ তিনি বলেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র গুণাবলী প্রত্যক্ষের লক্ষণ হলো, বিনয়ের সাথে কান্নাকাটি করা। আল্লাহ্‌র নিকট তওবা অনুশোচনা করা, তাঁর দিকেই ফিরে যাওয়া। এই গুণাবলী প্রত্যক্ষের সঠিক আলামত হলো— তাঁর দিকে মনোযোগী হওয়া, তাঁর থেকে বিমুখ না হওয়া। এরশাদ হয়েছে—

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰهَا -

(অতঃপর উহাকে উহার অসৎকর্ম ও উহার সৎকর্মের জ্ঞান দান করিয়াছেন। সূরা শামস্ আয়াত ৮)। এর হেকমত হলো যখন আগ্রহ ও উদ্দীপনা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির দিকে দেখবে, তখন শুকরিয়া আদায় করবে। আর যখন মনোযোগ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির বিপরীত দেখবে, তখন কান্নাকাটি করবে এবং আল্লাহ্‌র দিকে মনোযোগী হবে। আল্লাহ্‌র অমুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌কে ভয় করবে।

আল্লাহ্‌তায়ালার বাণী—

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ -

(জেনে রাখো! আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। সূরা ইউনুস আয়াত ৬২)। অর্থাৎ তাদের এই ভয় নেই যে, তাদের মনে স্বভাবজাত কোনো বিষয় প্রভাব বিস্তার করবে বা তার আত্মপ্রকাশ ঘটবে। কেনোনা ফানাপ্রাপ্ত ব্যক্তি পূর্বের স্বভাবের দিকে ফিরে যাবে না)।

মাজার শরীফ থেকে ফয়েজ লাভ ঃ আল্লাহ্‌র ওলীদের মাজার জিয়ারতকারী এই পরিমাণ ফয়েজ লাভে ধন্য হবে, যে পরিমাণ ওই বুর্জগের মর্যাদা সম্পর্কে সে জানতে পারবে। তাঁর প্রতি মনোনিবদ্ধ করলে তাঁর ওই গুণ অর্জন করতে পারবে, যদিও জিয়ারতে দৈহিক নৈকট্যের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মূলতঃ আত্মিক মনোনিবেশের বেলায় দৈহিক দূরত্ব

প্রতিবন্ধক নয়। যেমন রসূল স. এরশাদ করেন— তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো আমার প্রতি দরূদ পাঠ কোরো। বাহ্যিকভাবে কবরবাসীদের আকৃতি জিয়ারত করা ধর্তব্য বিষয় নয়। তাঁদের বাতেনী সিফাত জিয়ারত করাই মূলতঃ জিয়ারত।

নৈকট্য ঃ আল্লাহ্তায়ালার সাথে হজরত খাজার গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তিনি বলতেন, আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন সৃষ্টজীবের প্রতি মনোনিবেশ অপেক্ষা উত্তম ও পছন্দনীয়। যেমন কবি বলেন—

তুমি কবুল হওয়ার ধারণায় গমন করো, যদিও কবরবাসীর মাকাম পর্যন্ত পৌঁছা তোমার জন্য সম্ভব নয়।

ওলীদের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্য হলো, তাঁদের মাধ্যমে যেনো আল্লাহ্তায়ালার দিকে মনোনিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়। সুতরাং তাঁদের আত্মাকে তাওয়াজ্জোহের মাধ্যম বানাবে। তেমনিভাবে সৃষ্টজীবের সাথে যে বিনয় প্রকাশ করা হয়, মূলতঃ তা আল্লাহ্তায়ালার প্রতি বিনয় ও নম্রতা। আর সৃষ্টজীবের সাথে বিনয়াচরণ তখনই উত্তম হবে, যখন তা খাসভাবে আল্লাহ্তায়ালার জন্য হবে। তেমনি মাখলুকের মধ্যে যে কুদরত ও প্রজ্ঞার প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, তা যদি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে না হয়, তাহলে তা এক ধরনের লৌকিকতা ছাড়া কিছু নয়। মূলত সেটা বিনয় নয়। নুফহাতুল উন্স পৃষ্ঠা ৩৫১।

একাগ্রতা ও গ্রহণযোগ্যতা ঃ তিনি বলেন, নফী এসবাতের মোরাকাবা করা মাকামে জয্বার অধিক নিকটবর্তী। মোরাকাবার মাধ্যমে জ্যোতি, রাজ্য ও বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়। বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। শিষ্যদের প্রতি ক্ষমাদৃষ্টি, তাদের বাতেনকে আলোকিত করা ও দৃঢ়তা-স্থিরতার শক্তি অর্জিত হয় এবং মোরাকাবার মাধ্যমেই হৃদয়ে স্থিরতা ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়। আর একেই একাগ্রতা ও গ্রহণযোগ্যতা বলে।

আত্মশুদ্ধিতে লিপ্ত হওয়া ঃ তিনি বলেন, প্রথমে যখন খাওয়ারিজমে গেলাম, তখন প্রত্যেক বন্ধুর সাথে আত্মশুদ্ধির বিষয়টি পর্যালোচনা করলাম এবং জানতে পারলাম, নিজের মধ্যে এই পূর্ণতার স্থায়িত্ব আছে কি না? এই লিপ্ততার (মোরকাবার) ফলে আমার বেশ উপকার হয়েছে। ওই শক্তি (আত্মিক শক্তি) এই নেসবতের মধ্যে বিদ্যমান। তিনি বলেন, মানুষের নীরবতা

তিনটি বৈশিষ্ট্য বা গুণ থেকে মুক্ত না হওয়া আবশ্যক— ১. বিপদাপদের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। ২. সার্বক্ষণিক দিলে জিকির জারী থকাতে হবে ও এই হালতের মোশাহাদা হতে হবে। ৩. যা দিলে প্রতিনিয়ত জারী থাকে, অর্থাৎ সার্বক্ষণিক কলবের জিকিরের স্থিরতার উপলব্ধি থাকতে হবে।

বাণী ঃ তিনি বলেন, আল্লাহ্ওয়ালাদের সোহবত-সান্নিধ্য জ্ঞান প্রবৃদ্ধির কারণ।

তিনি আরও বলেন, সোহবত সুন্নতে মোয়াক্কাদা। প্রত্যহ অথবা একদিন অন্তর অন্তর ওলীগণের সান্নিধ্য আবশ্যক। আর দূরে থাকলে এক মাস অথবা দু'মাসের মধ্যেই নিজের জাহেরী ও বাতেনী অবস্থা জানিয়ে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

অন্তিমশয্যায় তিনি বলেন, আমার কোনো কিছুর দিকে খেয়াল নেই। ব্যথা পাই শুধু একথা ভেবে যে, বন্ধুরা আসবে, আর আমাকে না পেয়ে দুঃখ পেয়ে ফিরে যাবে। তিনি আরও বলেন, কুসংস্কার ও কুঅভ্যাস ত্যাগ করো। মানুষের চিরাচরিত অভ্যাস দূর করো। সুন্নতের অনুসরণ-অনুকরণ করো। এটাই নবী রসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য। সকল কাজ সাবধানতা, সতর্কতা ও সহজতার সাথে আদায় করো। বুজর্গগণের সোহবতে থাকো। এই আমলটি সুন্নতে মোয়াক্কাদা। এসকল কথা বলতে বলতেই তিনি উঁচু আওয়াজে কালেমায়ে তাওহিদ পাঠ শুরু করলেন ও চিরবিদায় গ্রহণ করলেন।

কারামত ১ ঃ তিনি অন্তিম মুহূর্তে খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দকে উপস্থিত দেখেন। তাঁর সাথে কথাবার্তা বলেন।

কারামত ২ ঃ তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় ও দুনিয়ায় জীবিত থাকার বিষয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে মুরিদগণকে বললেন, আমার বিদায় নেওয়া ও জীবিত থাকার বিষয়ে তোমাদের মধ্যে দু'টি দল হবে। তোমাদেরকে এক দলভুক্ত হওয়া উচিত। আমিও এর উপরই আছি। বর্ণিত আছে, ইন্তেকালের ১৫ দিন পূর্বে তিনি বিদায় নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গুরুত্বের সাথে বললেন, আমি ইরাদা করার পর আর ফিরে আসবো না। তাঁর রোগ ছিলো মাথা ব্যথা। রজব মাসের দুই তারিখ শনিবার দিন থেকে তাঁর অসুস্থতা শুরু হয়। ৮০২ হিজরী রজব মাসের বিশ তারিখ বুধবার দিন ইশার নামাজের পর তিনি ইন্তেকাল করেন। নুচগানিয়ায় তাঁর মাজার শরীফ অবস্থিত। ফকিরের নিকট (কিতাবের লেখক) খাজা আলাউদ্দিন আত্তারের ইন্তেকালের তারিখ এরকমই পৌঁছেছে।

ঘটনা ঃ জনৈক দরবেশ একবার স্বপ্নে বড় শানদার একটি ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করলেন। দেখলেন, হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ র. ও খাজা আলাউদ্দিন আত্তার র. ওই শানদার মজলিশের অতি নিকটবর্তী। মজলিশের শান দেখে বুঝা গেলো সেটা রসূলেপাক স. এর মজলিশ। ইতোমধ্যেই তিনি দেখতে পেলেন, খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ র. রসূল স. এর দর্শনের জন্য উক্ত মজলিশে প্রবেশ করলেন এবং কিছুক্ষণ পর প্রফুল্ল বদনে ফিরে এসে বললেন, আমাকে এই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে যে, আমি আমার কবর থেকে একশত ক্রোশ দূর পর্যন্ত কবরবাসীদের জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশে সুপারিশ করতে পারবো। আর আলাউদ্দিন আত্তারকে দেওয়া হয়েছে তাঁর কবর থেকে চল্লিশ ক্রোশ দূরের কবরবাসীদের জন্য সুপারিশের অনুমতি। আর আমাদের তরিকতপন্থী বন্ধু-বান্ধব ভক্তবৃন্দকে দেওয়া হয়েছে এক ক্রোশ দূরের কবরবাসীদের সুপারিশের অনুমতি। কেউ কেউ ঘটনাটি অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন ।

খাজা মোহাম্মদ পারসা কুদ্দিসা সিররুহু

খাজা মোহাম্মদ পারসা কুদ্দিসা সিররুহু হজরত বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ র. এর খলিফা ছিলেন। খানদানে খাজেগানদের মধ্যে তিনি ওই সময়ের বড় আলেম, জাহেদ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। প্রথম অবস্থায় তিনি হজরত খাজা বাহাউদ্দিন র. এর সান্নিধ্য অবলম্বন করেন। সাধনাকালে একবার তিনি খাজা বাহাউদ্দিন র. এর বাড়ীতে আসেন এবং হজরত খাজার জন্য দরজায় অপেক্ষা করেন। ইতোমধ্যে এক খাদেমা বাইরে থেকে ভেতরে আসেন। হজরত খাজা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, বাইরে কে? খাদেমা বলেন, পারসা অর্থাৎ পুণ্যবান ব্যক্তি। আপনার অপেক্ষায় আছেন। হজরত খাজা বাইরে এলেন এবং খাজা মোহাম্মদকে দেখে বললেন, তুমি পারসা (পুণ্যবান)। হজরত খাজার পবিত্র মুখে পারসা উচ্চারণের কারণে সাধারণের মধ্যে এই নামটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। হজরত খাজা যখন তাঁকে মুরিদ হওয়ার অনুমতি দেন, তখন তাঁর সম্পর্কে বলেন, তুমি যা কিছু বলবে, তাই হবে। যার উপর তোমার প্রভাব পড়বে, সে তোমার অনুগত হবে। অন্য সময় বলেন, তুমি যা কিছু নিবেদন করবে মহান আল্লাহ্‌তায়ালা তাই করবেন। এরপর তিনি তাঁকে বরখ উপাধিতে ভূষিত করেন। রাশহাত পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮।

সিফাতে বরখ ঃ উল্লেখ্য যে, বরখ একজন ওলীর নাম। তিনি হজরত মূসা আ. এর জামানার প্রসিদ্ধ ওলী ছিলেন। যেরূপ ওয়ায়েস্‌করনী আমাদের নবীর উম্মতের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ওলী। পূর্ববর্তী উম্মতের ওই দলকে বরখ বলা হতো, যারা মৌখিক শিক্ষা ছাড়াই সোহবতের মাধ্যমে বা সাধনা ব্যতিরেকেই সমবয়সী সাথীদের চেয়ে মারেফতের জ্ঞানে অধিক অগ্রগামী হতেন, তাঁদেরকেই বরখিয়া বলা হতো। আর হজরত মোহাম্মদ স. এর উম্মতের মধ্যে যাঁরা ওই গুণে গুণান্বিত তাঁদেকে ওয়ায়ইসী বলা হয়।

হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ র. হেজায সফরের সময় খাজা পারসাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, খাজেগানদের মাধ্যমে আমার কাছে যে আমানত আল্লাহ্‌তায়ালা এই অধমকে দান করেছেন এবং আমি এই পথে যা অর্জন করেছি, তার সকলকিছু তোমাকে অর্পণ করলাম। যেমন দ্বীনি ভাই মাওলানা আরেফ তোমাকে ন্যস্ত করেছেন। তুমি এই আমানতকে কবুল করো। আল্লাহ্‌র সৃষ্টজীবের নিকট উপকার পৌঁছে দাও। হজরত খাজা পারসা অনেক কাকুতি-মিনতি সহকারে নিজের অপারগতা প্রকাশ করলেন। অবশেষে তা কবুল করলেন। হজরত খাজা তাঁকে বললেন, আমার কাছে যা কিছু আছে, সব নিয়ে নাও। রাশহাত ৫৮।

হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ র. হজরত পারসা সম্পর্কে আরও বলেন আমাদের প্রকাশের উদ্দেশ্য হলো খাজা মোহাম্মদ পারসার অস্তিত্ব। কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন এভাবে— আমাদের অস্তিত্ব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, খাজা মোহাম্মদ পারসার আত্মপ্রকাশ। আমরা তাকে জয্‌বা ও সুলুক উভয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়েছি। তিনি আত্মশুদ্ধিতে লিপ্ত হলে একটি জগত আলোকিত হবে। রাশহাত ৫৯।

একদা হজরত খাজা বাহাউদ্দিন একটি মাজারের উদ্যানে হাউজের কিনারায় উপস্থিত হন। সেখানে দেখতে পান, খাজা মোহাম্মদ পারসা পানিতে পা ডুবিয়ে মোরাকাবায় মগ্ন। নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছেন। হজরত খাজা বাহাউদ্দিন তৎক্ষণাৎ লুঙ্গি বেঁধে পানিতে নামলেন। তাঁর পায়ের পিছনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভুপালক! এই সব পায়ের হুরমতে বাহাউদ্দিনের উপর দয়া করো।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. লিখেছেন, খাজা মোহাম্মদ পারসা হজরত খাজা বাহাউদ্দিনের দীক্ষায় জয্‌বা ও সুলুকের রাস্তা পাড়ি দেন এবং প্রকৃত ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ দ্বারা ভূষিত হন। বেলায়েতের স্তরে উন্নীত হন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি ফরদিয়াতের নেসবত হজরত মাওলানা আরেফ থেকে

অর্জন করেন। হজরত খাজা বাহাউদ্দিনের মাধ্যমে ফরদিয়াতের রাস্তা থেকে গাইবে হুরিয়াতের মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছেন। এই নেসবতের প্রাবল্যই এই জগতের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের কারণ হয়। এই এরশাদই পূর্ণতায় পৌঁছতে বাধা হয়ে দাড়ায়। অন্যথা পূর্ণতার মাকাম তিনি পূর্ণভাবে লাভ করতে পারতেন।

কারামত ১ ঃ মির্জা খলীল সমরকন্দের বাদশাহ্ ছিলেন। আর মির্জা শাহরুখ ছিলেন খোরাসানের বাদশাহ্। হজরত খাজা মোহাম্মদ পারসা সৃষ্টজীবের সমস্যা সমাধানের জন্য মির্জা শাহরুখের নিকট একটি পত্র লেখেন। এতে মির্জা খলীলের আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগে। অবশেষে ঘটনা এই পর্যায়ে পৌঁছে যে, বাদশাহ্ একজনের মাধ্যমে হজরতের খেদমতে এই সংবাদটি পাঠান যে, আপনি এখান থেকে জঙ্গলে চলে যান। হজরত খাজা বলেন, ঠিক আছে। ওলীগণের মাজার জিয়ারতের পর চলে যাবো। তখন তিনি ঘোড়া তলব করলেন ও কসরে আরেফানে উপস্থিত হলেন। হজরতের মাজার জিয়ারত শেষে যখন বের হলেন, তখন তাঁর চেহারায় শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের চিহ্ন প্রকাশিত হয়। এরপর সেখান থেকে সোওখরে যান। কিছু সময় হজরত আমীর কুলাল র. এর মাজারে অবস্থান করেন। যখন তিনি বুজর্গগণের মাজার জিয়ারত থেকে অবসর হন তখন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে খোরাসানের দিকে রওয়ানা হন।

হামারা যের ও যবর কুন না যবর মানাদ না যের
তাবেদানান্দ কেহ্ আমরোজ দরী ময়দানে কিস্ত।

অর্থ ঃ আমাদের পরিভ্রমণ সাধারণ ভ্রমণের মতো নয়। মূলতঃ আমরা ভিন্ন এক ময়দানে পরিভ্রমণরত।

তিনি সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে বোখারায় তাশরীফ আনেন। ওই সময় মির্জা শাহরুখ মির্জা খলীলের নামে পত্র লিখেন, তুমি যুদ্ধের আয়োজন করো। আমি আসছি।

খাজা মোহাম্মদ পারসা বলেন, পত্রটি মসজিদে জামের মিম্বরে পাঠ করো। এরপর পত্রটি মির্জা খলীলের নিকট সমরকন্দে প্রেরণ করো। মির্জা শাহরুখ পত্র প্রেরণের পরপরই সেখানে পৌঁছেন ও মির্জা খলীলকে হত্যা করেন।

কারামত ২ ঃ খাজা আবু নসর পারসা ইবনে খাজা মোহাম্মদ পারসা বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতার ইন্তেকালের সময় উপস্থিত ছিলাম না। তাঁর ইন্তেকালের পর আমি এলাম। শেষ দেখার জন্য তাঁর চেহারার আবরণ উন্মোচন করলাম। তিনি চোখ খুললেন ও মৃদু হাসলেন। ইহা দেখে আমার

অস্থিরতা ও দোদুল্যমানতা বৃদ্ধি পেলো। আমি তাঁর পায়ের কাছে গেলাম এবং আমার মুখ তাঁর পায়ের সাথে মিলালাম। তিনি পা টেনে নিলেন। রাশহাত পৃষ্ঠা ৬১-৬২।

ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি ৮২২ হিজরীতে ৪ জমাদিউল উখরা শুক্রবার দিন মদিনা মনোয়ারায় ইন্তেকাল করেন। মাওলানা শামসুদ্দিন মানারী র. মদিনাবাসী ও কাফেলার লোকজনসহ তাঁর জানাযার নামাজ পড়েন। হজরত আব্বাস রা. এর মাজারের নিকটে তাঁর কবর শরীফ অবস্থিত।

হজরত শায়েখ জয়নুদ্দিন খানী র. মিসর থেকে একটি শাদা পাথর এনে তাঁর কবরে পুঁতে দেন। ওই পাথর অন্যান্য কবর থেকে তাঁর কবরকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। রাশহাত পৃষ্ঠা ৬২-৬৩। 'নুফহাতুল উন্‌স' কিতাবে তাঁর ইন্তেকালে তারিখ ২৪শে জিলহজ্ব ৮২২ হিজরী বলে উল্লেখ রয়েছে।

হজরত খাজা নাসিরউদ্দিন উবায়দুল্লাহ আহ্‌রার কাদ্দাসাল্লাহু সিররুহু

এই সিলসিলায় তাঁর সম্পর্ক মাওলানা ইয়াকুব চরখী র. এর সাথে। হজরত খাজা বুজর্গ বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ র. মাওলানা ইয়াকুব চরখী র.কে বলেছিলেন, আমাদের নিকট থেকে তোমার কাছে যা পৌঁছেছে, তা আল্লাহ্‌র বান্দাদের নিকট পৌঁছে দাও। এই কথা দ্বারা হজরত উবায়দুল্লাহ আহরার এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কেনোনা উবায়দুল্লাহ অর্থ আল্লাহ্‌র বান্দা। আর মাওলানা আবদুর রহমান জামী কুদ্দিসা সিররুহু এর বাণী, যা তিনি হজরত উবায়দুল্লাহ আহরার সম্পর্কে বলেছিলেন 'ইয়াকুব চরখী উবায়দুল্লাহ আহরারের জন্য আমানতদার'— এই বাণী আমাদের কথার সমর্থক।

হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ র. মাওলানা ইয়াকুব চরখীকে বিদায় দেয়ার সময় বলেছিলেন, আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র কাছে অর্পণ করলাম। এর অর্থ এই আমানতকে যথার্থ প্রাপকের নিকট পৌঁছে দাও। আর যে ব্যক্তি আমানত আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত করে, আল্লাহ্‌তায়ালা তার ধারক-বাহক-হেফাজতকারী হয়ে যান।

হজরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার র. খাজা আলাউদ্দিন আত্তার র. এর সান্নিধ্যে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করেন। তাঁর থেকে খেলাফতও লাভ করেন। তিনি স্বীয় যুগের মহানিদর্শন ও কারামতের অধিকারী এবং কুতুবুল আকতাব ছিলেন। ছিলেন ওই সময়ের আল্লাহ্‌অন্বেষণকারী বান্দাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।

হজরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী র. বলেন, যখন কোনো মুরিদ কোনো শায়খের কাছে আসে, তখন তার উবায়দুল্লাহর কাছে যাওয়া উচিত। বাতি ও সলতে প্রস্তুত, শুধু আগুনের প্রয়োজন। যখন মাওলানা ইয়াকুব চরখী হজরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহ্‌রারকে উকুফে আদ্‌দীর শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন তিনি বলতেন, যা কিছু আমরা হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ থেকে লাভ করেছি— তা এটাই। আর যদি তুমি মুরিদদেরকে জয্‌বার পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে চাও, তাহলে তা তোমার ইচ্ছা। তাঁর এই কথা দ্বারা হজরত মাওলানার কতক মুরিদের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে। মাওলানা ইয়াকুব চরখী বলেন, খাজা উবায়দুল্লাহ আহরারের ভিতরে তাওয়াজ্জোহ্‌ প্রদানের শক্তি রয়েছে— শুধু অনুমতির প্রয়োজন।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি কুদ্দিসা সিররুহু লিখেছেন, সায়্যিদুল মুহাক্কিক্বীন নাসিরুদ্দিন হজরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার কুদ্দিসা সিররুহু বুজর্গগণের জয্‌বার মাকামে অতি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ওই মাকামে পুরোপুরি ফানা অর্জন করে একটি সুনির্দিষ্ট বাকায় স্থিত হয়েছিলেন। আর সেই বাকা থেকে নূরে ফাউকানী (ঊর্ধ্ব উদ্ভাসিত নূর) পর্যন্ত উন্নীত হয়েছিলেন এবং সমাপ্তির সর্বশেষ স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আধিক্যের মধ্যে একত্বের পর্যবেক্ষণ এই পদ্ধতিতে করতেন যে, মাঝখানে আধিক্যের কোনো অন্তরাল থাকতো না। সুলুকে আফাকীর (ঊর্ধ্বরোহণের) পথ পরিক্রমাতেও তিনি ওই এসেম (নাম) পর্যন্ত পৌঁছে যেতেন, যা ছিলো তাঁর মাবদায়ে তা'য়ূন (প্রথম অবতরণস্থল)। সেই এসেম স্থায়িত্বের পরিমিতি সৃষ্টি করে। কিন্তু পুরোটাই বিনষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলো। বরং ওই জয্‌বাতে পূর্বের ফানার পদ্ধতিতে বিশেষ বিনষ্টি সহযোগে অর্জন করেন। তিনি জয্‌বার মাকামে বিশেষ বাকাসহ উদ্ভাসের সাফল্যের নূরে তরবিয়ত করতেন। আর আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের দাসত্ব থেকে তিনি সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন। সত্তাগত অদৃশ্যের দিক থেকে হজরত জুন্‌নূরাইন রা. থেকে হজরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার কুদ্দিসা সিররুহু এর পুরোপুরি অংশ অর্জিত হয়। আর সেই পথেই তিনি অদৃশ্যের মাকামের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। এ ছাড়াও এই কামালিয়তের অর্জন বারো কুতুব থেকেও পেয়েছিলেন। আর এটা সেই মাকামে গায়েব যা অসম্পৃক্ততা থেকেও পুরোপুরি নেসবতযোগ্য। সহুর (সজ্ঞানতার) একটি সুনির্দিষ্ট প্রকার আছে। সত্তাগত মহব্বত সেই মাকামের জন্য আবশ্যক। শরীয়ত প্রশিক্ষণ এবং

শরীয়তের বিধানাবলী প্রতিপালন এই মাকামের সাথে সম্পৃক্ত। হজরত ইমামে আজম কুফী র. ওই কুতুবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। হজরত খাজা আহরার কুদ্দিসা সিররুহু দ্বাদশ কুতুব দলভুক্ত ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের কামালিয়তের অংশীদার ছিলেন। তাঁর দ্বীনি সহায়তা, সদুপদেশ সেই মাকামেরই ফল। এ কারণেই তাঁকে নাসিরুদ্দিন (ধর্মসহযোগী) বলা হয়। আরও জানা যায় যে, তিনি এই নেসবত মাতৃকুলের মহান ব্যক্তিদের নিকট থেকে অর্জন করেছিলেন। এই সকল কামালিয়ত তাঁর অভ্যন্তরে সন্নিবেশিত ছিলো। তিনি ছিলেন এক বিশাল গৃহের সুউজ্জ্বল প্রদীপ।

বাণী ঃ হজরত খাজা আহরার কুদ্দিসা সিররুহু বলেন, আমি যখন হজরত মাওলানার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলাম, তখন তিনি হজরত খাজেগানগণের তরিকা পুরোপুরি বর্ণনা করেন। যখন রাবেতাসূত্রের তরিকার আলোচনা এলো তখন তিনি বললেন, এই তরিকার বর্ণনা করতে যেয়ে ভয় কোরো না। একে নির্ভরযোগ্য লোকদের শিক্ষা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ো। রাশহাত পৃষ্ঠা ২৪২।

বাণী ঃ হজরত খাজা একদিন এক লোককে বললেন, যদি খাজা বাহাউদ্দিনের সোহবতে থেকে তোমার কোনো নেসবত হাসিল হয়, এরপর তুমি অন্য কোনো শায়েখের দরবারে যাও এবং সেখান থেকেও কিছু লাভ হয়, তাহলে তুমি কী করবে? তুমি কি তখন খাজা বাহাউদ্দিনকে ছেড়ে দিবে? এরপর তিনি নিজেই উত্তর দিলেন, যেখান থেকেই তুমি এই নেসবত পাও না কেনো, তা বাহাউদ্দিন থেকেই পেয়েছো মনে করবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন এভাবে— শায়েখ কুতুবুদ্দিন হায়দার কুদ্দিসা সিররুহু'র একজন মুরিদ শায়েখ শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী র. এর খানকায় আসেন। তখন তাঁর খুব ক্ষুধা পেয়েছিলো। তিনি তাঁর পীর সাহেবের গ্রামের দিকে মুখ করে বললেন, হে শায়েখ কুতুবুদ্দিন হায়দার! আল্লাহ্‌রওয়াস্তে কিছু খাদ্য পাঠিয়ে দিন। শায়েখ শিহাবুদ্দিন এই বিষয়টি অবগত হলেন। খাদেমকে আদেশ করলেন, ওই দরবেশকে কিছু খাবার দাও। দরবেশ খানা শেষ করে তার পীর-মোর্শেদের গ্রামের দিকে মুখ করে বললেন, আল্লাহ্‌র শুকরিয়া হে কুতুবুদ্দিন হায়দার! আপনি আমাদেরকে কোথাও ক্ষুধার্ত রাখেন না। খাদেম এই ঘটনা তার শায়েখকে জানালো। বললো, লোকটিকে আজব মনে হচ্ছে। খাবার খেলো আপনার আর শুকরিয়া আদায় করলো কুতুবুদ্দিন হায়দারের। শায়েখ

বললেন, মুরিদ কাকে বলে তার কাছ থেকে শিখে নাও। আরও জেনে রাখো, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল ধরনের উপকার যেখান থেকেই হাসিল হোক না কেনো, তা পীর-মোর্শেদের বরকতেই হাসিল হয়েছে জানবে।

বাণী ঃ তিনি বলেন, জীবনের ফল ওই ব্যক্তি উপভোগ করতে পেরেছে, যার দিল্ দুনিয়া থেকে উঠে গিয়েছে এবং আল্লাহ্‌র জিকির তার দিলের মধ্যে এমনভাবে আসন গেড়েছে যে, দুনিয়ার মহব্বতের কোনো স্থান তার অন্তরে নেই। তার অন্তরে আল্লাহ্ ব্যত্যীত অন্য কারোই স্থান নেই।

তিনি বলেন, জিহ্বা হৃদয়ের আয়না, হৃদয় আত্মার আয়না, আত্মা প্রকৃত মানবতার আয়না আর প্রকৃত মানবতা আল্লাহ্‌তায়ালার আয়না। অদৃশ্যের সত্যতা অদৃশ্য সত্তা হতে অতি দূরের পথ পাড়ি দিয়ে জবানে আসে আর তা সূরতে লফজী অর্থাৎ বাহ্যিক শব্দরূপে এর মূল রহস্য অতীত লোকদের কান পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে থাকে।

বাণী ঃ তিনি বলেন, আমি বড় বড় আউলিয়াগণের সোহবত অবলম্বন করেছি। তাঁরা আমাকে দু'টি জিনিস দিয়েছেন— ১. আমি যেনো নতুন তথ্য লিখি। পুরানো কথার পুনরাবৃত্তি না করি। ২. গ্রহণযোগ্য কথা বলি, যেনো প্রত্যাখ্যাত না হয়।

বাণী ঃ তিনি প্রশ্ন করেন, পীর কে? তিনিই জবাব দেন, পীর হলেন ওই ব্যক্তি যাঁর মধ্যে রসূল স. এর অপছন্দনীয় কোনো কাজ খুঁজে পাওয়া যায় না। আর যে কাজ রসূল স. করেছেন বলে প্রমাণ নেই, এমন কাজ যেনো তাঁর চরিত্রে না থাকে। বরং তাঁর চাহিদা এমন হওয়া উচিত, যেনো রসূল স. এর চরিত্র ও গুণাবলী ছাড়া তাঁর মধ্যে অন্য কিছুই নেই। রসূল স. এর গুণাবলীর গুণে গুণান্বিত হওয়ার এই মাকামে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং তা মুরিদগণের বাতেন জগতে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে মুরিদ স্বীয় সন্তুষ্টি বিলীন করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উপর পরিপূর্ণভাবে আস্থা স্থাপন করে ও সুদৃঢ় থাকে।

তিনি আরও বলেন, মুরিদ সেই ব্যক্তি, যার দৃঢ় মনোবলের প্রভাবে তার প্রয়োজন মিটে যায়। তার কোনো আকাঙ্ক্ষাই বাকী থাকে না। কলবের দর্পনে স্বীয় পীরের সৌন্দর্য দেখে সকল দিক থেকে তার মনোনিবেশ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কেবলা হয় তার পীর মোর্শেদ। পীরের আনুগত্যে অন্য সকল আকাঙ্ক্ষা থেকে শূন্য হয়ে বিনয় ও নম্রতার শির পীরের আস্তানা ছাড়া অন্য কোথাও রাখে না। বরং অস্তিত্বহীনতার দাগ তার নিজ ললাটে মুদ্রিত করে। অন্যের অস্তিত্বের ধারণা থেকেও মুক্ত থাকে।

উচ্চসাহস ঃ সেই ব্যক্তি বুলন্দ হিম্মতওয়ালা (উচ্চসাহসী) যে স্বীয় শক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে ন্যস্ত করে। সুযোগ হাত ছাড়া করে না। যদি সে বুঝতে পারে যে, সেই শক্তি তার নেই তাহলে তার উচিত হবে, নিজেকে এমন কাজে জড়িয়ে রাখা, যা আল্লাহ্‌তায়ালার সাথে লিপ্ত থাকার কারণ হয়।

বাণী ঃ তিনি আরও বলেন, যখন কেউ আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সান্নিধ্যে আসে, তখন তার উচিত নিজেকে নিঃস্ব ও দীনরূপে উপস্থাপন করা, যাতে তার প্রতি তিনি দয়ার্দ্র হন। তিনি আরও বলেন, কোনো দরবেশের ছবি যদি কোনো প্রাচীরে অংকন করা হয়, তাহলে সেই দেওয়ালের পাশ দিয়ে আদবের সাথে অতিক্রম করা উচিত।

উত্তম আমল ঃ তিনি বলেন, কতিপয় বুজর্গ বলেন— আসরের পর এমন একটি মহত্ত্ব আছে যখন উত্তম আমল হলো এইমর্মে মোহাসাবা (আত্মসমীক্ষণ) করা যে, তার সারাদিন কি ইবাদতে অতিবাহিত হয়েছে, নাকি গুনাহের কাজে? ইবাদতে অতিবাহিত হলে শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আর গুনাহের কাজে অতিবাহিত হলে করতে হবে ইস্তেগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা)। আলেমদের একটি দলের অভিমত এরকম— উত্তম আমল হলো নিজেকে এমন ব্যক্তির সান্নিধ্যে পৌঁছে দিবে, যাতে করে তাঁর প্রভাবে গাইরুল্লাহ থেকে বের হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করতে পারো ও এতে সুদৃঢ় থাকতে সক্ষম হও। গবেষকগণ বলেন, উত্তম আমল হচ্ছে আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সোহবতে থেকে ধ্যানে মশগুল থাকা, অন্যদের থেকে দূরে থাকা এবং আল্লাহ্‌র দিকে পূর্ণ অভিনিবেশী হওয়া।

জড় পদার্থের প্রভাব ঃ তিনি বলেন, জড়পদার্থের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া মানুষের চরিত্র ও আমলের উপর পড়তে পারে। একথা জ্ঞানীদের কাছে স্বীকৃত। শায়েখ মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী এই ব্যাপারে গবেষণামূলক উত্তর দিয়েছেন। বলেছেন, জড়পদার্থের মধ্যেও এমন প্রতিক্রিয়া আছে যেমন, কোনো ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজ এমন স্থানে আদায় করলো, যে স্থানে কোনো গোষ্ঠীর মন্দ আমল ও অসৎ চরিত্রের প্রভাব ছিলো। সেই স্থানের নামাজের সৌন্দর্য ও প্রভাব এরূপ হবে না, যে স্থান পুণ্যবানদের বরকতে প্রভাবিত। এই জন্য হারাম শরীফে দুই রাকাত নামাজ অন্য স্থানের সত্তর রাকাত মতান্তরে একশ রাকাত নামাজের সমান।

ওয়াজদ ও হাল ঃ তিনি বলেন, শায়েখ আবু তালেব মক্কী বলেছেন, এমন চেষ্টা করো যেনো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য না থাকে। এমন হাল বা অবস্থা হলেই তোমার কাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তোমার থেকে কোনো বিশেষ হালত, মর্যাদা বা কারামত প্রকাশ না পেলেও চিন্তার কোনো কারণ থাকবে না।

শ্মশ্রুবিহীন বালক ঃ তিনি বলেন, বর্তমান যুগে তওহীদ এমন হয়ে গিয়েছে যে, লোকজন বাজারে গিয়ে দাড়িবিহীন বালকদের দিকে তাকায় ও বলতে থাকে, আমরা স্থায়ী সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করেছি। এমন দর্শন থেকে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ (আশ্রয়-সাহায্য) চাওয়া উচিত। একদল মুরিদ হজরত সাইয়্যেদ কাসেম তিবরিজি র. এর দাড়িবিহীন ছেলের দিকে তাকিয়ে বললো, আমরা মহান আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করেছি। সাইয়্যেদ কাসেম র. বললেন, আমাদের শুকরটা কোথায় গিয়েছে? তাঁর কথা দ্বারা বুঝা যায়, ওই সকল লোক হজরত সাইয়্যেদ কাসেম র. এর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে শুকরের আকৃতিতে দৃশ্যমান হতো।

সত্যবাদী মুরিদ ঃ তিনি বলেন, সাইয়্যেদুত্ তায়েফা র. বলেন, সত্যবাদী মুরিদ সেই ব্যক্তি, বিশ বছর যাবত যার বাম কাঁধের ফেরেশতা কোনো গুনাহ্ লিখতে পারেনি। এর অর্থ এই নয় যে, ওই মুরিদ নিষ্পাপ হয়ে গিয়েছে, তার দ্বারা কোনো গুনাহ্ সংঘটিত হয়নি। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, ফেরেশতা তার গুনাহ্ লেখার পূর্বেই সে তওবা-ইস্তেগফার করে সেই গুনাহের কালিমা তার আমলনামা থেকে দূর করে দিয়েছে।

নীরবতা ঃ তিনি বলেন, একদা আমি মাওলানা নিজামউদ্দিন খামোশ র. এর খেদমতে হাজির হলাম। মাওলানা তখন উলামাদের সাথে জ্ঞানালোচনায় লিপ্ত ছিলেন। আমি চুপচাপ বসে পড়লাম। আলোচনা শেষে তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, চুপ থাকা উত্তম, নাকি এই সব কথাবার্তা। এরপর তিনি বলেন, আমার রায় হলো যদি কেউ নিজের ব্যক্তিত্ববোধ ভুলে যায়, তাহলে যা কিছু সে করে তাতে গুনাহ হয় না। আর যদি স্বীয় ব্যক্তিত্ববোধ ও অহমিকায় লিপ্ত থাকে, তাহলে যা কিছু করবে তা হবে অযথা, নিরর্থক, বেকুবের কাজ। হজরত খাজা কুদ্দিসা সিররুহু বলেন, আমরা মাওলানা নিজামউদ্দিন খামোশ থেকে এর চেয়ে উত্তম কোনো কথা শুনিনি।

শরীয়ত, তরিকত ও হকিকত ঃ তিনি বলেন, হজরত মাওলানা নিজামউদ্দিন বলেন শরীয়ত, তরিকত ও হকিকত প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান। যেমন মিথ্যা বলা নিষেধ। যদি কোনো ব্যক্তি দৃঢ়তার সাথে চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে তার জবান থেকে মিথ্যা এমনভাবে দূর করে যে, ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় তার মুখ থেকে মিথ্যা প্রকাশ পায় না— এটা শরীয়ত। আর যদি এমন হয় যে, মুখে মিথ্যা প্রকাশ করে না, তবে হৃদয়ে মিথ্যার বাসনা রয়েছে তখন চেষ্টা সাধনা করে এটা দূর করতে পারে অর্থাৎ তার হৃদয়ে মিথ্যা বলার বাসনা বা ইচ্ছা জাগ্রত হয় না— তখন এটা তরিকত। আর যদি এমন হয় যে, ইচ্ছা ও অনিচ্ছায় হৃদয়ে ও জবানে মিথ্যার প্রকাশ ও লালসা একেবারেই না থাকে, তবে সেটা হবে হকিকত। হজরত খাজা সাহেব হজরত মাওলানা সাহেবের এই কথাগুলি উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসা করতেন। রাশহাত পৃষ্ঠা ২৫৬।

কাশফে কুবুর ঃ তিনি বলেন, কাশফে কুবুর হলো কবরস্থ ব্যক্তির আত্মা কোন্ বিশেষ আকৃতিতে আছে, তা দেখতে পাওয়া। কাশফের অধিকারী ব্যক্তি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখতে পায়। তবে শয়তান যেহেতু বিভিন্নরূপ ও আকার ধারণ করতে পারে, তাই খাজেগানগণের নিকট এই কাশফের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাঁদের নিকট কবর জিয়ারতের পদ্ধতি এরকম— কোনো ব্যক্তি যখন কোনো বুজর্গের কবরে যাবে, তখন নিজের সকল হাল, কাইফিয়াত ও নেসবত থেকে নিজেকে খালি করবে। এরপর কবরবাসীর নেসবত প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকবে। এরপর যে নেসবত প্রকাশ পাবে বা অনুভূত হবে, তা দ্বারাই কবরস্থ ব্যক্তির অবস্থা বুঝতে পারা যাবে। অপরিচিত ব্যক্তিগণের সোহবত বা সান্নিধ্যের ক্ষেত্রেও তাঁদের একই নীতি। কোনো ব্যক্তি তাঁদের সামনে এলে তাঁরা স্বীয় বাতেনের দিকে লক্ষ্য করেন। তাঁদের বাতেন জগতে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকেই তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জানেন। এই নতুন অবস্থার মধ্যে ওই সকল বুজর্গদের কোনো হস্তক্ষেপ বা ক্ষমতা নেই। আর এই কাইফিয়ত অনুযায়ী তার সাথে কোমলতা বা কঠোরতা প্রকাশ করে থাকেন। শায়েখ ইবনে আরাবী এই তাজাল্লিকে তাজাল্লিয়ে মোকাবেলা নাম দিয়েছেন। আরেফের বাতেনজগত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ থাকার ভিত্তিতে এর আবির্ভাব হয়ে থাকে। যে জ্যোতি বাতেনজগত থেকে সৃষ্টি হবে, তার আয়নায়ে হকিকতের মধ্যে তা এই ধরার চিত্র থেকে পবিত্র ও স্বচ্ছ হবে। পরিপূর্ণ গুণাবলীর কারণে

পরিমাণ ও অবস্থা ছাড়া মহান সত্তার সাথে সেই সম্পর্ক এবং তার মধ্যে মহান আল্লাহ্র তাজাল্লি ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। এমন নূরানী আয়নাকে যখন এই হালতে ছেড়ে দিবে, তখন কাইফ তথা বিশেষ অবস্থা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এরপর তার আয়নায় যা কিছু প্রতিফলিত হবে, তা তার ব্যক্তিগত নয়। তা হচ্ছে ওই ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়ার প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব।

মৃত্যুর পর উন্নতি ঃ তিনি বলেন, গবেষকদের মতে মৃত্যুর পরে উন্নতি সম্ভব। শায়েখ মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী বলেন, অগণিত তাজাল্লি থেকে একটি তাজাল্লির মধ্যে আমি এবং আবুল হাসান নূরী একত্রে ছিলাম। তিনি আমার হাত চুম্বন করে বললেন, তুমি আমার দিক থেকে পরিতৃপ্ত হয়েছো কি? আমি বললাম, না। তাওহিদের পিপাসা অন্যদের দিক থেকে পরিতৃপ্ত হয় না। আমার এমতো জবাব শুনে তিনি লজ্জিত হলেন। আমি পুনরায় বললাম, অধম উত্তম থেকে কিছু লাভ করে থাকে, এর ব্যতিক্রম হয় না। রাশহাত পৃষ্ঠা ২৬৩।

শায়েখ মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী তাঁর ফতুহাতের অন্য এক স্থানে বলেন, আল্লাহ্র ওলীদের মৃত্যুর পরও তাদের তরক্কি বা উন্নতি হয়। আর এই বিষয়টি অস্বীকারকারীদের মধ্যে একজন হলেন শায়েখ আবুল হাসান নূরী। মৃত্যুর পর শায়েখ আবুল হাসান নূরীর অবস্থা দুই হালত বা অবস্থা থেকে মুক্ত নয়— ১. তিনি নিশ্চিত জেনে নিয়েছেন যে, মৃত্যুর পর তরক্কী হয় বা হয় না। যদি তরক্কি হওয়া সম্পর্কে জেনে নেন, তাহলে তো আমাদের দাবির সাথে মিলে গেলো। ২. আর তরক্কি না হওয়া সম্পর্কে এলেম অর্জন না হলে এই এলেম তাঁর পরলোকগমনের পর অর্জিত হবে। সুতরাং বুঝতে হবে, মৃত্যুর পর তরিক্ক হয়। রাশহাত পৃষ্ঠা ২৬২।

আদব ও হালত ঃ তিনি বলেন, আদব ছাড়া সালেকের হালত অবশিষ্ট রাখা মহান আল্লাহ্তায়ালার গোপন প্রচেষ্টা। রাশহাত পৃষ্ঠা ২৬৫।

নেসবতে নক্শবন্দি ঃ তিনি বলেন, খাজেগানে নক্শবন্দি বুজর্গগণের নেসবতে প্রথমে গোপনে বিভেদ তৈরী হয়। এতে রহস্য হলো নেসবতে নক্শবন্দি প্রিয় হওয়ার নেসবত। প্রিয়জনকে নির্জনে ডাকলে তখন তাদের মধ্যে হেজাব বা প্রতিবন্ধকতা হয়ে যায়। রাশহাত পৃষ্ঠা ২৬৬।

সূক্ষ্মতা ও নেসবত ঃ তিনি বলেন, এই নেসবতের সূক্ষ্মতা এই স্তরের যে, তার দিকে মনোনিবেশ করাও তার প্রকাশের প্রতিবন্ধক। যখন কোনো সুন্দর চেহারার দিকে বিশেষ আগ্রহের সাথে তাকানো হয়, তখন সে তা লুকাতে থাকে।

প্রত্যেক বস্তু তার বিপরীত বস্তু দ্বারা চেনা যায় ঃ তিনি বলেন, প্রতিটি বস্তু তার বিপরীত বস্তু দ্বারা প্রকাশিত হয়। সৃষ্টজীবের দিকে মনোনিবেশ করা মহান আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশের বিপরীত। তাই এক পক্ষ অপর পক্ষের বিপরীত হয়ে থাকে। যদি জ্ঞানী হয়ে থাকো, তাহলে বিপরীত বস্তু দ্বারা প্রিয় বস্তুর দিকে মনোনিবেশ করো। এই কারণেই এই সিলসিলার বুজর্গগণ বাজার ও লোকসমাবেশে যেয়ে থাকেন ও সেখানে বসে সৃষ্টজীবের কাজের ব্যস্ততা ও বিভোরতা দেখে এর বিপরীত কাজ করেন, অর্থাৎ তাঁদের হৃদয়কে পার্থিবতা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আল্লাহ্‌র দিকে নিবদ্ধ করেন। রাশহাত পৃষ্ঠা ২৬৬।

মহান উদ্দেশ্য ঃ তিনি বলেন, মহান উদ্দেশ্য ওটাই যে, সূক্ষ্ম অনুভূতির আকর্ষণ অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি স্থায়ী আকর্ষণ। তোমার প্রচেষ্টাও তাই হওয়া চাই যে, এই তাওয়াজ্জোহ্ (মনোনিবেশ) তোমার মধ্যে অটুট থাকুক, যাতে তোমাকে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রিয় বান্দাদের মধ্যে গণ্য করা যায়। রাশহাত পৃষ্ঠা ২৬৮।

মহাপুরুষ ও পোক্ত এরাদা ঃ তিনি বলেন, সকল যুগে মহাপুরুষগণ যে সকল অউলিয়া কেরামের সোহবত এখতিয়ার করেছেন, তাঁরা আজিমতের উপর অটল ছিলেন। রুখসত থেকে দূরে থাকতেন। রুখসতের উপর আমলকারীদের থেকে পৃথক থাকতেন। দুর্বলেরাই রুখসতের উপর আমল করে থাকে। আমাদের খাজেগানগণের অভ্যাস ছিলো আজিমতের উপর আমল করা।

দরবেশী ও ফানায়ে মুতলক ঃ তিনি বলেন, ফানায়ে মুতলক বা সাধারণ ফানার অর্থ হলো, সালেক নিজেকে নিজের আফয়াল বা কার্যাবলী ও গুণাবলীর নেসবতকে নিজের থেকে দূর করবে। এগুলোকে প্রকৃত কর্তার দিকে নেসবত করবে। সূফীগণের বাণী— নফী ও এসবাত নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। এই কথার অর্থ হলো— দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আমার পরিহিত পোশাকটি অন্যের কাছ থেকে ধার নেওয়া। মূলত এটা আমার জামা নয়। কিন্তু নিজের মালিকানা মনে করে পরিধান করেছি। যখন জানতে পারলাম এটা ধার নেওয়া তখনই আমার মালিকানা শেষ হয়ে গেলো, অথচ ইতোপূর্বে এটার মালিক মনে করে পরিধান করতাম। সকল গুণাবলীকে এই জামার সাথে তুলনা করে মানুষ যদি নিজের গুণাবলী ও যোগ্যতাকে আল্লাহ্‌প্রদত্ত বলে মনে করে এবং অস্থায়ী পৃথিবীতে মাত্র কয়েকদিনের জন্য তাকে এটা ধার দেওয়া হয়েছে বলে বিশ্বাস করে, তাহলে দিল্ হতে দুনিয়া

ও আমিত্বের মোহ দূর করে একমাত্র আল্লাহ্‌র মালিকানা ও আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। এটাই দরবেশী। অথচ লোকজন এটাকে বিশাল কিছু মনে করে। রাশহাত পৃষ্ঠা ২৮২।

মিলন ঃ তিনি বলেন, প্রকৃত মিলন হলো— আগ্রহ সহকারে আল্লাহ্‌তায়ালার সাথে মিলিত হওয়া। এই অবস্থা সর্বদা কায়েম থাকলে তাকে স্থায়ী ওয়াসল বা মিলন বলা হয়। আর এটাই ইনতেহা বা শেষ সীমানা। খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ র. এর এই বাণী 'নেহায়েত' (শেষসীমা) আমরা 'বেদায়েত' (প্রারম্ভ) এর মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেই— একথার উদ্দেশ্য এটাই যে, হজরত খাজার বাণী— আমরা মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নই। এজন্য আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে প্রকৃত মালিকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। আর এটাই হলো ওয়াসল বা মিলন। রাশহাত পৃষ্ঠা ২৮৩।

আবরার এবং ওয়াসল ঃ তিনি বলেন, কেউ যদি জিকির করতে করতে এমন স্তরে পৌঁছে যে, সর্বদা তার দিলে জিকির উপস্থিত থাকে, আর সে ওই উপস্থিতির সাথে জড়িয়ে থাকে, তাহলে তাকে আবরারদের মধ্যে গণনা করা হয়। তাকে হাজের মায়া'আল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র সাথে উপস্থিত) বলতে পারবে। কিন্তু ওয়াসল মায়া'আল্লাহ্ বলতে পারবে না। আর ওয়াসল মায়া'আল্লাহ্ তখন হবে, যখন এই হুজুরীর সম্পর্ক তার থেকে দূর হয়ে যাবে এবং মহান আল্লাহ্‌র সত্তাকে উপস্থিত মনে করবে। রাশহাত পৃষ্ঠা ২৮৩।

তাজাল্লী ঃ তিনি বলেন, এখানে তাজাল্লী দ্বারা উদ্দেশ্য কাশ্‌ফ। এটা দু'ভাবে হতে পারে— ১. চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করা। এই ধরনের দর্শন পরকালে হবে। ২. এমন কাশ্‌ফ যা অদৃশ্য বস্তুকে অনুভূতির মধ্যে দৃশ্যমান করবে। আর মহব্বত বা ভালোবাসার বৈশিষ্ট্য হলো অদৃশ্য বস্তুকে অনুভূতির গণ্ডির মধ্যে নিয়ে আসা। এই তাজাল্লী দুনিয়াতে মহান ব্যক্তিদের শেষ সীমানা। এরপর আর তাঁদের সম্মুখগমন ঘটে না। রাশহাত পৃষ্ঠা ২৮৩।

হিম্মত বা সাহস ঃ তিনি বলেন, এখানে হিম্মত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হৃদয়ের প্রশান্তি। কোনো একটি বিষয়ে এমন দৃঢ়চেতা হওয়া যে, তার অন্তরে এর বিপরীত কোনো কিছুই অনুপ্রবেশ ঘটে না। এটাও বলা হয় যে, কোনো

কাফের যদি কোনো একটি বিষয়ে স্বীয় হিম্মতকে স্থির করে, তাহলে তার ওই কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। এমন কার্যসিদ্ধির জন্য ইমান বা নেক আমলের শর্ত করা হয়নি। মোর্শেদের উচিত কখনো কখনো মুরিদগণের হিম্মত পরীক্ষা করা। যাতে বুঝা যায় তাদের মর্তবা কোন্ স্তরে উপনীত হয়েছে এবং তাদের হিম্মতের তাছির (প্রভাব) কেমন?

হিম্মতের তাছির ঃ তিনি বলেন, প্রথম জীবনে আমি মাওলানা সা'দুদ্দিন কাশগড়ীর সাথে হেরাতে অবস্থান করছিলাম। একদা আমরা রাস্তায় বেড়াতে বের হলাম। কুস্তিগীরদের খেলার মাঠের পাশ দিয়েই যাচ্ছিলাম। সেখানে আমরা আমাদের তাওয়াজ্জোহ্‌র শক্তি পরীক্ষা করলাম। দুই জনের মধ্যে নির্দিষ্ট একজনের বিজয় হওয়ার জন্য আমাদের হিম্মতকে কাজে লাগালাম। যাকে নির্দিষ্ট করে নিলাম, সেই বিজয়ী হলো। এরপর অন্য জনের প্রতি মনোনিবেশ করলাম। সেও বিজয়ী হলো। এরপর পুনরায় প্রথম জনের প্রতি খেয়াল করলাম, তখন সে-ই বিজয় লাভ করলো। এভাবে কয়েকবার মনোনিবেশের পরীক্ষা করলাম। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিলো, আমাদের হিম্মতের তাছির কোন্ স্তরে উপনীত হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করা। রাশহাত পৃষ্ঠা ২১৭।

কারামত ১. শরীয়ত প্রচলন ঃ হজরত খাজা শরীয়ত প্রচলন, জাতীয় সংস্কার ও শাসকদের সাথে মিলে মিশে থাকার জন্য আদিষ্ট ছিলেন। এজন্য তিনি সমরকন্দে তশরীফ নেন, যাতে বাদশাহ্‌র সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ওই সময় মির্জা আবদুল্লাহ ইবনে মির্জা ইব্রাহীম ইবনে মির্জা শাহরুখ সমরকন্দের বাদশাহ্ ছিলেন। একবার মির্জা আবদুল্লাহ্‌র একজন সচিব হজরত খাজার দরবারে উপস্থিত হলেন। হজরত খাজা তাঁকে বললেন, আমার এই রাজ্যে আসার উদ্দেশ্য হলো তোমাদের বাদশাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করা। তুমি যদি সাক্ষাৎদানের মাধ্যম হয়ে থাকো, তাহলে বুজর্গদের কাজে অংশগ্রহণ করে অনেক পুণ্যের অধিকারী হতে পারবে। সেই সচিব বেয়াদবির সাথে উত্তর দিলো, আমাদের বাদশাহ্ বেপরোয়া লোক। তার সাথে সাক্ষাৎ করা অনেক কঠিন কাজ। তাছাড়া তার সাথে দরবেশগণের সাক্ষাতের কী প্রয়োজন? তার কথায় হজরত খাজার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগলো। তিনি বললেন, আমাকে বাদশাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের আদেশ করা হয়েছে। আমি নিজ ইচ্ছায় এখানে আসিনি। যদি তোমার বাদশাহ্ পরোয়া না করে, তাহলে এমন ব্যক্তিকে বাদশাহ্ বানানো হবে, যে

পরোয়া করবে। সেই আমীর চলে যাওয়ার পর হজরত খাজা তার নাম কালি দিয়ে প্রাচীরে লিখলেন। এরপর লালা দিয়ে তা মুছে ফেললেন। এরপর বললেন, আমাদের কাজ বাদশাহ্ এবং তার আমীর উমরা দিয়ে হবে না। এই বলে তিনি তাশকন্দের দিকে রওয়ানা করলেন। এক সপ্তাহ পর ওই আমীরের মৃত্যু হলো। এর একমাস পর তুর্কিস্তানে সুলতান আবু সাঈদ মির্জার আত্মপ্রকাশ ঘটলো। তিনি মির্জা আবদুল্লাহর উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেললেন। রাশহাত পৃষ্ঠা ২৮৮।

কারামত ২ ঃ কথিত আছে, একদা তিনি কাগজের কিছু টুকরায় অনেকের নাম লিখলেন। কাগজের যে টুকরায় সুলতান আবু সাঈদের নাম লেখা ছিলো, সেটা তিনি স্বীয় পাগড়ীর ভিতরে রাখলেন। বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলো, কার নাম আপনি পাগড়ীর ভিতরে রাখলেন। তিনি বললেন, ওই ব্যক্তির নাম, যার প্রজা হবো আমরা এবং তাসকন্দ, সমরকন্দ ও খোরাশানের অধিবাসীরা। সে যুগে সুলতান আবু সাঈদের নাম নিশানা ছিলো না। কিন্তু কিছুদিন পর সুলতান আবু সাঈদ মির্জা সারা তুর্কিস্তানে প্রসিদ্ধ হলেন। রাশহাত পৃষ্ঠা ২৮৯।

কারামত ৩ ঃ কথিত আছে, সুলতান আবু সাঈদ হজরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরারকে স্বপ্নযোগে দেখতে পান এবং হজরত খাজা আহমদ বাসাবীর বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর নামও জানতে পারেন। তিনি স্বপ্নে দেখা সেই হজরতের নাম ও আকৃতি-প্রকৃতি স্মরণ রাখেন। জাগ্রত হলে তিনি দরবারের লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন, এমন গঠনের ও এই নামের কোনো দরবেশ এই রাজ্যে আছে কি না, কেউ তাঁকে চিনেন কি না? লোকজন সংবাদ দিলো এমন আকৃতি প্রকৃতির একজন দরবেশ বর্তমানে তাসকন্দে অবস্থান করছেন। সুলতান তৎক্ষণাৎ সওয়ার হয়ে তাসকন্দের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে হজরত খাজা ফারকাতের দিকে রওয়ানা হলেন। বাদশাহ্ জানতে পারলেন, তিনি ফারকাতে অবস্থান করছেন। বাদশাহ্ সেখানে পৌঁছলেন। মহান দরবারে উপস্থিত হলেন। হজরতের পবিত্র চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বাদশাহ্ আল্লাহ্র কসম করে বললেন, এই মহান বুজর্গকেই আমি স্বপ্নে দেখেছি। বাদশাহ্ হজরতের কদমবুসি করলেন। বিনয় প্রকাশ করলেন। হজরত খাজা তাঁর অবস্থার উপর তাওয়াজ্জোহ্ প্রদান করলেন। বাদশাহ্ বিজয়ের জন্য হজরতের দোয়াপ্রার্থী হলেন। তিনি বললেন, বিজয়ের দোয়া একবার করা হয়েছে।

বিশাল বাহিনী সমবেত হলো। বাদশাহ্র মনে সমরকন্দ বিজয়ের বাসনা জাগ্রত হলো। তিনি হজরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে পুনরায় দোয়াপ্রার্থী হলেন। হজরত বললেন, তোমার উদ্দেশ্য কী? যদি তোমার নিয়ত হয় শরীয়ত শক্তিশালীকরণ, দ্বীনের প্রচার প্রসার ও প্রজাদের উত্তম ব্যবস্থাপনা, তাহলে তোমার এই সফর হবে বরকতময় ও তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে এবং বিজয় হবে সুনিশ্চিত। বাদশাহ্ বললেন, শরীয়তের উজ্জ্বলতা ও শক্তিবৃদ্ধির জন্য জান মাল দিয়ে চেষ্টা করবো। প্রজাদের সুখ-শান্তির চেষ্টা করবো। হজরত বললেন, উদ্দেশ্য যদি এমন হয়, তাহলে শরীয়তের আশ্রয় নাও। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। রাশহাত পৃষ্ঠা ২৮৯।

কারামত ৪ ঃ হজরত খাজা মির্জা সুলতান আবু সাঈদকে বললেন, তোমাদের সাথে শত্রুবাহিনীর সাক্ষাৎ হলে ও তারা আক্রমণ করলেও কু এলাকার লোক আত্মপ্রকাশ না করা পর্যন্ত তোমরা শত্রুদের উপর আক্রমণ করবে না। যখন উভয় বাহিনীর সাক্ষাৎ হলো, তখন মির্জা আবদুল্লাহর বাহিনী ঘোড়া হাঁকিয়ে দিলো। মির্জা আবু সাঈদের ডান বাহুর বাহিনীর পা উপড়ে ফেললো ও বাম বাহুর উপর আক্রমণ করতে মনস্থ করলো। তখন হঠাৎ কু এলাকার লোক মির্জা আবু সাঈদের বাহিনীর পিছনের দিক থেকে আত্মপ্রকাশ করলো। মির্জা সুলতান আবু সাঈদের বাহিনী যখন হজরত খাজার সুসংবাদ স্মরণ করলো তখন তাদের হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার হলো। তারা সকলে একসাথে আক্রমণ করলো। প্রথম আক্রমণেই মির্জা আবদুল্লাহর বাহিনী পরাস্ত হলো। মির্জা আবদুল্লাহর ঘোড়া জলাভূমিতে আটকে গেলো। তখনই তাকে আটক করে হত্যা করা হলো। রাশহাত পৃষ্ঠা ২৯০।

কারামত ৫. যুদ্ধের ময়দানে খাজা ঃ সুলতান আবু সাঈদের সাথীদের একজন মীর হাসান বাহাদুর বর্ণনা করেন, যখন আমাদের বাহিনী ও মির্জা আবদুল্লার বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমাদের মোট সংখ্যা আনুমানিক সাত হাজার। আর মির্জা আবদুল্লাহর সৈন্যসংখ্যা ছিল অসংখ্য। আর তারা ছিলো অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত। মির্জা আবদুল্লাহর বাহিনীর প্রাবল্য দেখে মির্জা আবু সাঈদ হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। তার উপর ভয়-ভীতি রেখাপাত করলো। হঠাৎ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলতে লাগলো, হে হাসান বাহাদুর! তুমি কী দেখছো? আমি বললাম, হে বাদশাহ্! আমি হজরত খাজাকে আমার সামনে সামনে দেখতে পাচ্ছি। বাদশাহ্ বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমিও তাই দেখছি।

আমি বললাম, হে সুলতান! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা অবশ্যই শত্রুবাহিনীর উপর বিজয় লাভ করবো। আমার মুখ থেকে এ কথা বের হওয়া মাত্রই শত্রুবাহিনী পিছু হটতে লাগলো। সৈন্যরা কথাটি পুনরাবৃত্তি করলো এবং শত্রুবাহিনীর উপর প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করলো। আধা ঘন্টার মধ্যে মির্জা আবদুল্লাহ্‌র বাহিনী পরাজিত হলো।

কারামত ৬ ঃ হজরত খাজা বলেন, মির্জা আবহুল্লাহ্‌ নিহত হওয়ার সময় আমি তাশকন্দের দিকে মনোনিবেশ করলাম। দেখলাম, একটি দল বাতাসে ভর করে জমিনে নামলো। তারা মির্জা আবদুল্লাহকে গ্রেফতার করে হত্যা করলো। আমি বুঝতে পারলাম, মির্জা আবদুল্লাহর কাজ শেষ। রাশহাত পৃষ্ঠা ২৯০।

কারামত ৭ ঃ একবার সম্রাট বাবর একলক্ষ সৈন্য নিয়ে সমরকন্দ আক্রমণ করার ইচ্ছায় যাত্রা করলো। মির্জা সুলতান আবু সাঈদ হজরত খাজার খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, বাবরের মোকাবেলা করার শক্তি আমার নেই। কী করবো? সাথীরা এইমর্মে পরামর্শ দিয়েছে যে, আমি যেনো সমরকন্দ থেকে তুর্কিস্তানে চলে যাই এবং সেখানে গিয়ে দুর্গের ভিতর থেকে যুদ্ধ করি। তারা সকল সামগ্রী উঠের পিঠে উঠিয়ে দিলো। হজরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার র. তাদের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত হয়ে বললেন, তোমাদের এই যুদ্ধের জিম্মাধারী আমার, আর বাবরের পরাজয় আমার দায়িত্বে। তোমরা নিশ্চিন্তে থাকো। মির্জা যাত্রা স্থগিত করলেন। সমরকন্দেই থেকে গেলেন। বাবর সমরকন্দের কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। বাবরের প্রধান সেনাপতি, যার চেয়ে বড় যোদ্ধা বাবরবাহিনীতে অন্য কেউ ছিলো না— সে বন্দী হলো। আর বাবরের লোকজন যারা খাবারের আয়োজনের জন্য সমরকন্দে চলে গিয়েছিলো, সমরকন্দের লোকজন তাদের নাক, কান কেটে বের করে দিলো। কয়েকদিনের মধ্যেই বাবরবাহিনীর ঘোড়াগুলো প্লেগে আক্রান্ত হলো এবং অসংখ্য ঘোড়া মারা গেলো। অবশেষে বাবর সন্ধি করতে বাধ্য হলো। হজরত খাজার বিশেষ খাদেম মাওলানা কাসেম বাইরে এসে উভয় দলের মধ্যে সন্ধি করে দিলেন। হজরত খাজা বললেন, বাবর একটি বাহিনী নিয়ে সমরকন্দ অবরোধ করার জন্য আসছিলো। নারী ও শিশুদের বন্দী করছিলো। সমরকন্দবাসীরা ছিলো অত্যন্ত সৎ ও দরিদ্র। এজন্য তাদের প্রতি আমার দয়া হলো। তাই তাদের বিপদ দূর করার জন্য দুই তিন দিন

সময় ব্যয় করলাম। কেনোনা বিপদ দূর করা ও শত্রুকে প্রতিহত করা নবী করিম স. এর সুন্নত। কিন্তু বাবর বলছিলো, আমরা সমরকন্দ জয় করতে না পারলেও একথা বুঝতে পারলাম যে, হজরত খাজা আরেফ নন। কেনোনা আরেফের কাজ এমন নয়। তিনি হিম্মত প্রদর্শন করে আমাদেরকে পরাজিত করলেন। হজরত খাজা বললেন, বাবর আরেফের অর্থ বুঝেননি। এর মর্মকথা হলো, আরেফ এমনভাবে ফানা হয় যে, আরেফ এবং তার সকল গুণাবলী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তার নাম নিশানা কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাদের থেকে যা কিছু প্রকাশ পায় তা তাদের কর্ম নয়। নিম্নের আয়াত এর প্রমাণ বহন করে—

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۖ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى -

(তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করো নাই, আল্লাহ্ই তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছেন, এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করিয়াছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করো নাই আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সূরা আনফাল আয়াত ১৭)।

যদি এমন না হতো, তাহলে নবীদের ব্যাপারে অনেক বিষয় কঠিন হয়ে দাঁড়াতো। কেনোনা তাঁরা একটি সম্প্রদায়কে তছনছ করে দিয়েছিলেন। যেমন হজরত নূহ আ. এবং হজরত হুদ আ.।

কারামত ৮ ঃ তিনি বলেন, আমরা যদি পীরি-মুরিদি করি, তাহলে এ যুগের কোনো পীর একজন মুরিদও খুঁজে পাবে না। কিন্তু আমাদেরকে অন্য কাজের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো, জালেমদের অনিষ্ট থেকে মুসলমানদেরকে হেফাজত করা এবং শরীয়তের প্রচার ও প্রসার করা। এজন্য আমাদেরকে বাদশাহ্র উপর প্রবল করা হয়েছে। তাদেরকে অনুগত করে দেওয়া হয়েছে। এ দ্বারা মুসলমানদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করা আবশ্যক।

কারামত ৯ ঃ তিনি বলেন, আল্লাহ্তায়ালা নিজ অনুকম্পায় কারামতের শক্তি দান করেছেন। যদি আমরা ইচ্ছা করি, তাহলে একটি চিঠির মাধ্যমে যে সকল বাদশাহ্ খোদায়ী দাবিদার, তাদেরকে এমন করতে পারি যে, তারা খালি পায়ে কন্টকাকীর্ণ পথে দৌড়ে আমাদের আস্তানায় চলে আসবে। এমন শক্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা সর্বদা মহান আল্লাহ্র নির্দেশের অপেক্ষায় থাকি। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা-ই আদেশ করেন এবং পূর্ণ করেন। এই মাকামে

আদব অত্যাবশ্যক। আর আদব এটাই যে, নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুগত করা। তাঁর ইচ্ছাকে নিজের অনুগত করার চেষ্টা না করা। তিনজন বাদশাহ্ যারা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আশংকা ছিলো, তিনি তাদের মধ্যে সন্ধি করে দেন। এটি একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। রাশহাত পৃষ্ঠা ২৯৫।

কারামত ১০ ঃ হজরত খাজার এক বুজর্গ বন্ধু বর্ণনা করেন, আমার এক দাস সমরকন্দে হারিয়ে যায়। আমি চার মাস পর্যন্ত সমরকন্দের অলিতে গলিতে তাকে তালাশ করতে লাগলাম। কিন্তু তার কোনো হদিস পেলাম না। একবার এক জঙ্গলে আমি সেই দাসকে খুঁজছিলাম। হজরত খাজা তাঁর সাথীবর্গকে নিয়ে সে পথেই কোথাও যাচ্ছিলেন। আমি হজরতের ঘোড়ার লাগাম ধরে বিনয়ের সাথে নিজের অবস্থা বর্ণনা করলাম। হজরত বললেন, আমরা গ্রাম্য মানুষ। এ সকল খবর আমরা কীভাবে জানবো? আমি অনেক কাকুতি-মিনতি ও কান্নাকাটি করলাম। আমার কান্না ও আহাজারি দেখে হজরতের দয়া হলো। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, ওই সামনের গ্রামে খুঁজে দেখছো কি? আমি বললাম, কয়েকবার অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছি। হজরত বললেন, আবার খুঁজে দেখো। এবার পেয়ে যাবে। তিনি এটা বলেই ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেলেন। আমি সেই গ্রামের দিকে যাত্রা করলাম। গ্রামের কাছে যেতেই আমার গোলামকে পানির পাত্র সামনে নিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলাম। আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম, এতোদিন কোথায় ছিলে? সে বললো, আমি আপনার বাড়ি থেকে বের হলে এক ব্যক্তি আমাকে ধোঁকা দিয়ে খাওয়ারিজম শহরে নিয়ে যায় এবং সেখানে গিয়ে আমাকে অন্য এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দেয়। আমি তার খেদমতে আছি। আজ তার বাড়িতে মেহমান এসেছে। তিনি আমাকে বললেন, কলসে পানি ভরে এনে খাবার তৈরী করো। আমি কলসে পানি ভরে নিয়ে যাচ্ছিলাম। এখন আমি আপনার সামনে দণ্ডায়মান। আমি এখন এই ভেবে হতবাক ও চিন্তিত যে, এই ঘটনা আমি জাগ্রত অবস্থায় দেখছি, নাকি স্বপ্নযোগে? রাশহাত পৃষ্ঠা ৩১৬।

কারামত ১০. আকৃতি পরিবর্তন ঃ হজরত মাওলানা আবদুর রহমান জামী র. বর্ণনা করেন, যখন হজরত খাজা আমাকে মাওলানা ইয়াকুব চরখীর আকৃতি-প্রকৃতি ও পোশাক পরিবর্তনের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন তখন হজরত খাজা অন্য এক বুজর্গের আকৃতি ধারণপূর্বক আমার সামনে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো।

দুনিয়া থেকে বিদায়ের কয়েক দিন পর তাঁর প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে হজরত খাজা নিজের আকৃতি পরিবর্তন করলেন। আমার ধারণা ছিলো তিনি শুধু আমার সামনেই আকৃতি পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু আমার সাথীরা বললেন, তাঁরা হজরত খাজাকে আকৃতি পরিবর্তন অবস্থায় অনেক বার দেখেছেন। মাওলানা হাজী মাজারী এবং হাফেজ ইসমাঈল, যিনি মাওলানা সা'দুদ্দিন এর মুরিদ ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেন, আমরা হজরত খাজাকে মাওলানা সা'দুদ্দিনের আকৃতিতে দেখেছি। রাশহাত পৃষ্ঠা ৩২০।

কারামত ১১. মধু ও মদ ঃ হজরত খাজার এক খাদেম সমরকন্দে যাচ্ছিলেন। হজরত তাঁকে বললেন, আমার জন্য সমরকন্দ থেকে কয়েক ডিব্বা মধু এনো। তিনি সমরকন্দ থেকে কয়েক ডিব্বা মধু নিয়ে ডিব্বার মুখে মজবুত করে সীল মোহর করে দিলেন। এমন সময় কোনো কাজের উদ্দেশ্যে বাজারে কাপড়ের দোকানে সামান্য সময় থামলেন। তিনি মধুর ডিব্বা সামনে রাখলেন। এমন সময় এক সুন্দরী রমণী সেই দোকানে এলো এবং এক পাশে বসে সেই দোকানদারের সাথে কথা বলতে লাগলো। সেই খাদেম হারাম দৃষ্টিতে সেই নারীর দিকে তাকালো। এরপর দৃষ্টি ফিরিয়ে ডিব্বা উঠিয়ে নিয়ে তাসকন্দের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। মধুর ডিব্বা হজরত খাজার সামনে পেশ করলো। হজরত খাজা ডিব্বা দেখেই রাগান্বিত হলেন। বললেন, ডিব্বা থেকে মদের গন্ধ আসছে। হে বদবখত! আমি তোমাকে মধু আনতে বলেছিলাম, মদ আনতে বলিনি। সে বললো, আমি মধু নিয়ে এসেছি। মদ আনিনি। তিনি ডিব্বা খোলার নির্দেশ দিলেন, খোলার পর দেখা গেলো, ডিব্বাটি মদ দ্বারা পূর্ণ। রাশহাত পৃষ্ঠা ৩২০।

কারামত ১২. সূর্য স্থির হওয়া ঃ একজন নির্ভরযোগ্য বুজর্গ বর্ণনা করেন, একদা হজরত খাজা তাঁর সাথীবর্গ নিয়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাচ্ছিলেন। সেটা ছিলো শীত মৌসুম। দিন ছিলো খুবই ছোট। পথিমধ্যে আমরা আসরের নামাজ আদায় করলাম। সূর্য হলুদ আকৃতি ধারণ করলো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিলো। গন্তব্যস্থল আরও দুই ক্রোশ দূরে ছিলো। রাস্তায় কোনো আশ্রয়কেন্দ্র ছিলো না। আমার ধারণা হচ্ছিলো যে, সন্ধ্যা সমাগত, রাস্তা বিপজ্জনক। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস। গন্তব্যস্থল বেশ দূর। এমতাবস্থায় সামনে কীভাবে অগ্রসর হবো। দ্বিতীয় বার আমার মনে এই খেয়াল জাগ্রত হলে হজরত খাজা আমার দিকে মুখ করে বললেন, ভয় পেয়ো না। চিন্তিতও হয়ো না। হতে পারে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে

পারবো। আমি বার বার সূর্যের দিকে তাকাচ্ছিলাম। সূর্য আকাশে স্থির হয়ে রইলো। মনে হচ্ছিলো, সূর্যকে পেরেক দ্বারা আটকিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা যখন গ্রামের আবাদিস্থলে পৌঁছে গেলাম, তখন সূর্য এমনভাবে অদৃশ্য হলো যে, তার কোনো নিশানা রইলো না। এমনকি সূর্য অস্ত যাওয়ার পর লাল রেখাও অবশিষ্ট ছিলো না। পৃথিবী হঠাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। উপস্থিত জনতার মধ্যে আতঙ্ক ও ত্রাস দেখা দিলো। সবাই ধারণা করছিলো এতে হজরত খাজার হস্তক্ষেপ রয়েছে। অবশেষে সবাই হজরত খাজাকে এর রহস্য জিজ্ঞেস করলেন। হজরত খাজা বললেন, তরিকতপন্থীদের জন্য এটা একটি কৌশল।

কারামত ১৩ ঃ হজরত খাজার বড় ছেলে হজরত খাজা মোহাম্মদ, যিনি আলেম, আরেফ এবং কারামতের অধিকারী ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, একদা আমার ফুফু ইচ্ছা পোষণ করলেন, তিনি তাঁর প্রিয় প্রতিবেশী এক অসুস্থ বৃদ্ধার সেবা করার জন্য যাবেন। আমার আব্বা তাঁকে নিষেধ করলেন। এরপর ফারকাত নামক স্থানে চলে গেলেন। ফুফু তাঁর সেবা করার জন্য বের হয়ে পড়েন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, আমার পিতা সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, তুমি ফিরে যাও। ফিরে না গেলে তুমিও অসুস্থ হয়ে পড়বে। তোমার পক্ষে কারো সেবা করা সমীচীন নয়। তিনি বাধ্য হয়ে ফিরে গেলেন। বাড়িতে পা রেখেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কম্পন রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আমার আব্বা যখন ফারকাত থেকে ফিরে এলেন, তখন তিনি ফুফুর সেবায় নিয়োজিত হলেন। বললেন, রোগী দেখতে যাওয়া এবং অসুস্থ হওয়ার কী প্রয়োজন ছিলো? রাশহাত পৃষ্ঠা ৩১৯।

কারামত ১৪. আকৃতি পরিবর্তন ঃ হজরত খাজা মোহাম্মদ কুদ্দিসা সিররুহু'র ফুফু বর্ণনা করেন, যখন হজরত খাজার উপর কবজের কাইফিয়াত জারী হতো, তখন তিনি বার বার ঘরে ঢুকতেন ও বের হতেন। তিনি যতোবার ঘরে প্রবেশ করতেন, ততোবার নতুন আকৃতি ধারণ করে প্রবেশ করতেন। যদি ধরা হয় তিনি দশবার ঘরে প্রবেশ করেছেন, তবে দশবারই আকৃতি পরিবর্তন করেছেন। বাড়ির বৃদ্ধা নারীরা অন্য মানুষের আকৃতি দেখে চিৎকার শুরু করতেন। তিনি সাথে সাথেই আসল রূপ ধারণ করে হাসতেন। এভাবে কবজের অবস্থা একসময় দূর হতো। রাশহাত পৃষ্ঠা ৩১৯।

কারামত ১৫. জুলুম থেকে মুক্তি ও শরীয়ত প্রচলন ঃ একবার দুইজন দরবেশ অনেক দূরদেশ থেকে খাজার সাক্ষাৎ লাভের জন্য তাঁর খানকায় উপস্থিত হলেন। তাঁরা খাদেমদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, হজরত খাজা কোথায়? খাদেমগণ বললেন, বাদশাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছেন। একথা শুনে তাঁরা সফরের কষ্ট ও সময় নষ্ট হওয়ার জন্য আক্ষেপ করতে লাগলেন। বললেন, আজব শায়েখ! তিনি বাদশাহ্‌র দরবারে যাতায়াত করেন। অথচ প্রবাদে আছে, কতোইনা নিকৃষ্ট ওই ফকির যিনি বাদশাহ্‌র দরবারে যাতায়াত করেন। ইতোমধ্যে শাহী দরবার থেকে দু'জন চোর পলায়ন করলো। সৈনিকরা চোরের সন্ধানে শহরের অলি গলি চষে বেড়াতে লাগলো। তারা দুই চোরের পরিবর্তে ওই দুই দরবেশকে ধরে নিয়ে বাদশাহ্‌র দরবারে হাজির করলো। বললো, এরাই সেই চোর, যারা জেলখানা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো। এখন এদের ব্যাপারে কী নির্দেশ। মহামান্য বাদশাহ্‌ নির্দেশ দিলেন, শরীয়তের বিধান অনুযায়ী এদের হাত কেটে দেওয়া হোক। হজরত খাজা তখন বাদশাহ্‌র দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মৃদু হেসে বললেন, এঁরা দরবেশ। অনেক দূর থেকে আমার সাক্ষাতের জন্য এসেছে। আমাকে না পেয়ে চিন্তিত ও ভগ্নহৃদয়ে ফিরে যাচ্ছিলো। এরপর হজরত খাজা এই দুই দরবেশকে সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। তাদেরকে বললেন, আমি এজন্যই শাহী দরবারে গিয়েছিলাম যাতে তোমাদের হাত কাটা না হয়। তারাই নিকৃষ্ট, যারা ধনের লোভে যায়। আর ওই দরবেশ নিকৃষ্ট নন, যিনি মুসলমানদের প্রয়োজন মিটানো, জালেমদের অনিষ্ট দূর করা এবং শরীয়তের প্রচার-প্রসারের জন্য শাহী দরবারে যান। আর ওই ফকির নিকৃষ্ট যে ধন দৌলতের লালশায় শাহী দরবারে যান। দরবেশদ্বয় নিজেদের মন্দ ধারণার জন্য অনুতপ্ত হলেন। তওবা করলেন এবং হজরত খাজার একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে গেলেন।

কারামত ১৬ ঃ এক আলেম হজরত খাজার প্রসিদ্ধি ও সুখ্যাতি শুনে তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সমরকন্দ রওয়ানা হলেন। শহরে প্রবেশ করেই শহরের রাস্তায় সারিবদ্ধ উটের পিঠে খাদ্যভর্তি বস্তা দেখতে পেলেন। লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এ সকল খাদ্য কার? লোকেরা বললো, হজরত খাজার। আলেম সাহেবের মনে এমতো ভাবনার উদ্রেক হলো যে, ফকিরের সাথে দুনিয়ার কী সম্পর্ক? এখান থেকেই ফিরে যাওয়া উচিত। এরপর সে চিন্তা করলো, এতোদূর সফর করে এলাম। কাছে গিয়েই দেখি

না কেনো, তিনি কোন্ প্রকৃতির দরবেশ। এরপর তিনি খানকায় এসে বসে পড়লেন। হজরত খাজা তখন অন্দরমহলে ছিলেন। ইতোমধ্যে আলেম সাহেবের তন্দ্রা এসে গেলো। তন্দ্রা অবস্থায় দেখতে পেলেন, কিয়ামত সংঘটিত হয়েছে। এক ঋণ প্রদানকারী তার কাছে এসে ঋণের পরিবর্তে তাকে তার সাথে দোযখে নিতে চাচ্ছে। ইতোমধ্যে হজরত খাজা এসে ঋণ প্রদানকারী ব্যক্তিকে বললেন, তার কাছে তোমার কী পরিমাণ পাওনা আছে? সে পরিমাণ বললো। হজরত খাজা তাকে বললেন, ওই পরিমাণ মাল আমার নিকট থেকে নিয়ে যাও। আর লোকটিকে ছেড়ে দাও। এরপর তিনি তার পাওনা পরিশোধ করে দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিলেন। আলেম সাহেবের তন্দ্রা কেটে গেলো। হজরত খাজা অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এলেন। মৃদু হেসে বললেন, এই পরিমাণ মাল এই জন্য জমা করে রেখেছি, যাতে করে তুমি এবং তোমাদের মতো লোকদের ঋণ পরিশোধ করা যায়।

মৃত্যুর তারিখ ঃ এই মহামানবের ইন্তেকালের তারিখ ২৩শে রবিউল আউয়াল ৮৯৫ হিজরী শনিবার রাত। তিনি খাজা কাশ্ফীর এলাকায় সমাধিস্থ হন।

কারামত ১৭ ঃ হজরত খাজার শ্বাস-প্রশ্বাস যখন বন্ধ হলো, তখন ছিলো মাগরিব ও ইশার মাঝামাঝি সময়। অনেক মোম জ্বালানো হয়েছিলো। সারা বাড়ি আলোকিত ছিলো। এমন সময় হজরত খাজার ভ্রূদ্বয়ের মাঝামাঝি স্থান থেকে একটি জ্যোতি বিদ্যুতের ঝলকের মতো বিকশিত হলো। মোমবাতিগুলো নিষ্প্রভ হয়ে গেলো। ওই আলো দেখে উপস্থিতজনেরা বিস্মিত ও বিমোহিত হয়ে গেলো।

হজরত মাওলানা মোহাম্মদ জাহেদ দখ্শী কুদ্দিসা সিররুহু

তাঁর শায়েখ হলেন খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার কাদ্দাসাল্লাহু তায়ালা। তিনি ছিলেন তাঁর মহান খলিফা। দখ্শ হাসার প্রদেশের একটি গ্রামের নাম। ওই গ্রামকে দখ্শওয়ারও বলা হয়। তিনি মাওলানা ইয়াকুব চরখী র. এর নিকটাত্মীয় ছিলেন। হজরত মাওলানা জাহেদ নক্শবন্দিয়া তরিকার তালিম-তরবিয়ত হজরত খাজা ইয়াকুব চরখীর কতিপয় সাথীর নিকট থেকে গ্রহণ করেন। তিনি নিভৃতে সময় অতিবাহিত করতেন। সাধনা ও মুজাহাদার মাধ্যমে সময় ব্যয় করতেন। শেষে হজরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার র. এর দরবারে উপস্থিত হন।

আকাবেরগণের মধ্যমণি হজরত খাজা খাওয়ান্দ মাহমুদ একবার এই ফকিরকে অর্থাৎ এই পুস্তকের লেখককে বললেন, মাওলানা জাহেদ খাজা মোহাম্মদ ইউসুফের মুরিদ ছিলেন। আর তিনি হজরত খাজা ইয়াকুব চরখীর মুরিদ ছিলেন। যদি মাওলানা জাহেদ হজরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরারের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তাহলে রাশহাত কিতাবের গ্রন্থকার মাওলানা ওয়ায়েজ কাশফী অবশ্যই তাঁর নাম কিতাবে উল্লেখ করতেন। ঘটনাক্রমে একবার হাজী জিয়াউদ্দিন সমরকন্দি যিনি খাজা খাওয়ান্দ মাহমুদের খলিফা ছিলেন এবং যিনি খেলাফত লাভের পর কাশ্মীরে অবস্থান করেন, তিনি ওই মজলিশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজের স্থান থেকে উঠে আমার কাছে এসে বসলেন এবং আমাকে বললেন, আমাদের খাজা হজরত খাওয়ান্দ মাহমুদ এই বিষয়ের হকিকত সম্পর্কে অবগত নন। আমি মাওলানা হজরত খাজা আমকাংগী র. এর মুরিদ। অনেক বছর যাবত তাঁর খেদমতে আছি। তাঁর ইন্তেকালের পর অর্থাৎ হজরত খাজা আমকাংগী র. থেকে হজরত খাজা মাহমুদের খেদমতে আছি। হজরত খাজা মোহাম্মদ বাকি আমার সামনেই মাওলানা খাজেগীর খেদমতে আসেন। আর মাওলানা জাহেদের খেলাফত হজরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার থেকে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।

ঘটনাটি ছিল এরূপ— হজরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার কুদ্দিসা সিররুহুর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা যখন মাওলানা জাহেদের কানে পৌঁছলো, তখন তিনি হামার থেকে সমরকন্দের দিকে রওয়ানা হলেন। সমরকন্দ পৌঁছে ওয়েসার এলাকায় অবতরণ করলেন। স্থানটি ছিলো মনোরম ও মনোমুগ্ধকর। তিনি হজরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার র. এর খেদমতে হাজির হওয়ার জন্য নতুন কাপড় পরিধান করলেন। ওয়েসার থেকে হজরত খাজার বসতবাটি কানসারের মধ্যে তিন ক্রোশের দূরত্ব ছিলো। এমন সময় হজরত খাজা উবায়দুল্লাহ র. এর নিকট উদ্ভাসিত হলো যে, মাওলানা জাহেদ আধ্যাত্মিক গুণাবলীতে পরিপূর্ণ। তিনি আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছেন। তাঁর মনে একথার উদয় হলো যে, মাওলানাকে স্বাগতম জানানো উচিত। তখন ছিলো গ্রীষ্মকাল। সময় দ্বিপ্রহর। এমতাবস্থায় তিনি উট প্রস্তুত করতে বললেন। উটে সওয়ার হলেন। কিছুসংখ্যক মুরিদ তাঁর সাথে রওয়ানা হলো। কেউ জানতো না তিনি কোথায় যাচ্ছেন। উটকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হলো। যে দিকে ইচ্ছা সে চলতে লাগলো। যখন

হজরত খাজা ওয়েসার এলাকায় পৌঁছলেন, তখন উট থেমে গেলো। হজরত খাজা উট থেকে নামলেন। হজরত খাজার আগমন উপলব্ধি করে মাওলানা জাহেদ অনিচ্ছাকৃতভাবে দৌড় দিলেন। হজরত খাজাকে স্বাগতম জানালেন। পায়ে চুম্বন করলেন। হজরত খাজা সেখানেই মাওলানার সাথে নিভৃতে আলাপ আলোচনা শুরু করলেন। হজরত মাওলানা নিজের ইলহাম, মাকাম ও মুয়ামালা হজরত খাজার সামনে পেশ করলেন এবং বায়াতের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হজরত খাজা মাওলানাকে বায়াত করে নিলেন এবং যা কিছু বলার ছিলো তা বলে দিলেন। নক্‌শবন্দিয়া আলিয়া তরিকার নেয়ামতসমূহ মাওলানাকে প্রদান করলেন। পূর্ণ তাওয়াজ্জোহ্‌ ও একাগ্রতার সাথে মাওলানার প্রতি মনোনিবেশ করে কামেল ও তাকমীলের উচ্চস্তরে পৌঁছিয়ে দিলেন। শেষে খেলাফত প্রদান করে বিদায় দিলেন। হজরত খাজার সাথীরা বিষয়টি পছন্দ করলেন না। ভাবলেন, হজরত খাজা সাহেব মাওলানা মোহাম্মদ জাহেদকে প্রথম সান্নিধ্যেই খেলাফত প্রদান করলেন। অথচ আমরা বছরের পর বছর হজরত খাজার খেদমতে নিয়োজিত আছি। হজরত খাজা বললেন, মাওলানা জাহেদ প্রদীপ, তৈল এবং সলতে প্রস্তুত করে আমার কাছে এসেছে। আমি তা জ্বালিয়ে দিলাম। এরপর জনাব হাজী সাহেব আমাকে বললেন, একথা প্রসিদ্ধ যে, রাশহাত গ্রন্থের প্রণেতা দু'টি বড় ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

প্রথম ঘটনা ঃ মাওলানা মোহাম্মদ জাহেদের সম্পর্ক হজরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরারের সাথে ছিলো। এ দ্বারা হজরত খাজার কারামত প্রকাশিত হয় এবং মাওলানা মোহাম্মদ জাহেদ সাহেবের উচ্চমর্যাদা প্রচারিত হয়।

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ একবার হজরত খাজা আহরার কোথাও যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় পথিমধ্যে তাঁর অবস্থার পরিবর্তন হলো। তাঁর উপর বেহুঁশী হাল প্রবল হলো। অন্য দিকে সূর্য অস্তমিত হওয়ার উপক্রম হলো। উপস্থিত সাথীদের কারো এমন সাহস ছিলো না যে, হজরতকে নামাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। সূর্য ডোবার পর হজরতের বেহুঁশী হাল কেটে গেলো। হজরত খাজা হুঁশ ফিরে পেয়ে দেখতে পেলেন সূর্য ডুবে গেছে, আসরের নামাজ কাজা হয়েছে। তিনি সূর্যকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে সূর্য! আমাদের জন্য বের হয়ে এসো। সাথে সাথেই সূর্য বেরিয়ে এলো। হজরত খাজা আসরের নামাজ আদায় করলেন। হজরত খাজার নামাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে এলো।

বলাবহুল্য, 'রাশহাত' রচয়িতা হজরত খাজা আহরারের মুরিদ ও খলিফাগণের নাম উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করেননি। তাঁর মুরিদগণের আলোচনা একটি পৃথক পরিচ্ছেদেও উল্লেখ করেননি। হজরত খাজা আহরার র.কে যাঁরা দেখেছেন, তাঁর বাণী বা কারামত যাঁরা বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁদের নাম রাশহাত কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এভাবে হজরত খাজার সমসাময়িক বুজর্গগণ, যাঁদের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, যাঁদের প্রশংসা করেছেন, তাঁদের আলোচনাও কিতাবে উল্লেখ করেছেন। 'রাশহাত' প্রণেতার মূল বিবরণ ছিলো হজরত খাজার অবস্থা ও বাণী সম্পর্কে। গ্রন্থকারের ইন্তেকালের পরও হজরত খাজা আহরার অনেকদিন পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। 'রাশহাত' রচনার কাজ হজরত খাজার জীবদ্দাশয়ে তাঁর সান্নিধ্যে থাকাকালে শুরু হয়েছিলো এবং দীর্ঘ ষোলো বছরে রচনার কাজ শেষ হয়। অনেক কথা স্মরণে না থাকার কারণে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। খাজা আহরারের দরবারে মাওলানা জাহেদের উপস্থিতি ছিলো স্বল্প সময়ের। আর 'রাশহাত' গ্রন্থপ্রণেতা ওই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এজন্য খাজা সাহেবের সাথে মাওলানা জাহেদের সম্পর্ক ও সংঘটিত কারামতসমূহ 'রাশহাত' প্রণেতার গোচরে আসেনি। মাওলানা জাহেদের সাথে খাজা সাহেবের সাক্ষাতের সংবাদও তাঁর নিকট পৌঁছেনি। তাই মাওলানা জাহেদের আলোচনা তাঁর কিতাবে উল্লেখ না করাতে তাঁকে দোষারোপ করা যায় না।

'রাশহাত' এর মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন, আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত বরকত ও কৃপায় ৮৮৯ হিজরীর জিলকদ মাসের শেষ দিকে এই অধমের হজরত খাজার ধ্যানালয় চুমু খাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিলো। এরপর ৮৯৩ হিজরীর রবিউল আখের মাসে পবিত্র ধ্যানালয়ের খাদেমগণের কদমবুসির সৌভাগ্য হলো। ফলে নক্‌শবন্দিয়া তরিকার বুজর্গগণের উৎকর্ষ, জীবনচরিত, মহত্ত্ব ও আলোচনা জানার সুযোগ হয়। অধিকাংশ আলোচনাই তরিকতের মূল্যবান বাণী দ্বারা সমৃদ্ধ ছিলো। ওই কথাগুলোই আমি আমার রচনায় গ্রন্থিত করতে শুরু করলাম। কিন্তু এরপর কালচক্রের প্রভাবে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূল অবস্থার কারণে ওই মহান কাজ ও সান্নিধ্যের পরশ থেকে বঞ্চিত হলাম। একটা দীর্ঘ সময়ের পর আমার মনে এমতো কথার উদয় হলো যে, ওই সকল বুজর্গের মুখনিঃসৃত বাণী ও তাঁদের সান্নিধ্যে যা লাভ করেছিলাম, তা লিপিবদ্ধ করি। কিন্তু সুযোগ হয়ে

উঠছিলো না। এভাবে ষোলোটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলো। ৯০৯ হিজরীতে নতুন করে এই ইচ্ছা প্রবল হলো। তাঁদের হাল-হকিকত সংকলন ও বিন্যস্ত করতে মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। কাজও শুরু হয়ে গেলো।

কারামত ঃ যখন হজরত খাজা র. জানতে পারলেন, মির্জা সুলতান মাহমুদ তাঁর সহোদর ভাই মির্জা সুলতান আহমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং সমরকন্দ অবরোধের পরিকল্পনা করছেন তখন তিনি মির্জা সুলতান মাহমুদের নিকট একটি পত্র লিখলেন এভাবে—

এই অধম ফকির মহামান্য সম্রাটতনয়ের নিকট অনুরোধ করছে যে, পূর্ববর্তী আওলিয়াগণ সমরকন্দ নগরীকে নিরাপদ নগরী নামে অভিহিত করেছেন। এজন্য ফকিরের নিকট মনে হচ্ছে, সমরকন্দ অভিযানের পরিকল্পনা আপনার জন্য সমীচীন নয়। আল্লাহ্তায়ালা এই বিষয়ে কোনো নির্দেশ দেননি। আর রসুল স. এর শরীয়তে এ ব্যাপারে কোনো নির্দেশ আসেনি। তাহলে আপনি কীভাবে আপনার সহোদর ভাইয়ের বিরুদ্ধে তলোয়ার উত্তোলন করবেন? এই ফকির আপনার শুভ কামনা করে। এ বিষয়ে কায়েকবার আপনাকে ইতোপূর্বে অনুরোধও করেছি। কিন্তু তা গৃহিত হয়নি। মানুষের প্ররোচনায় এই দেশবিজয়ের পরিকল্পনা ও ফকিরের অনুরোধ উপেক্ষা করা বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। আমি আপনার শুভানুধ্যায়ী, অন্যরা স্বার্থান্বেষী। আপনি জ্ঞাত আছেন যে, সমরকন্দে অসংখ্য বুজর্গানে দ্বীন, ফকীর, মিসকিন রয়েছেন। তাঁদের সংকটাপন্ন করা কিছুতেই সমীচীন নয়। এমন কোনো কাজ করা উচিত নয়, যাতে তাঁদের মন ব্যথিত হয়। আর ব্যথিত, আহত হৃদয়ের 'আহ্' শব্দ যে কীরূপ আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারে, তা আপনার জানা আছে। এটা আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা ও মুসলমানদের হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানবে। আপনি দয়া করে এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করুন ও আল্লাহ্কে ভয় করুন। ফকিরের এই আবেদন নিঃস্বার্থ ও শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্য। এটা মেনে নিন। উভয় সহোদর একমত হয়ে একে অপরকে সহযোগিতা করুন। উভয়ে একমত হয়ে অসম্পূর্ণ কাজগুলি পূর্ণ করুন। এতে আল্লাহ্তায়ালা সন্তুষ্ট থাকবেন। দুনিয়াতে আল্লাহ্র এমন বান্দা রয়েছেন, যাদের প্রতি তিনি তাঁর বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ রাখেন। তাঁদের বিরুদ্ধে জুলুম ও যুদ্ধের পরিকল্পনা মহান আল্লাহ্র সাথেই জুলুম ও যুদ্ধের পরিকল্পনা। সহীহ্ হাদিসে এর বিবরণ পাওয়া যায়।

কবি বলেন—

ব পেশে চশম চু খাকাস্তরম মিয়া গুস্তাখ
কে হাস্ত দরতগ আউ আতাস ওয়া দরইয়ায়ি।

অর্থঃ মানুষের দৃষ্টিতে যদিও আমি মাটির মতো। কিন্তু তুমি বেয়াদবির ইচ্ছা থেকে দূরে থাকো। কেনোনা এর মাঝেই আগুন পানির মহাসমুদ্র বিদ্যমান।

হজরত খাজা র. আমীর মজিদের নিকট একটি চিঠি পাঠালেন, যিনি সুলতান মাহমুদের দরবারে বড় আমীর ছিলেন (প্রধান সেনাপতি)। তাঁকে বললেন, তোমরা যুদ্ধ ও সংঘাতের পথ পরিহার করো। তিনি আরও বললেন, তোমার কি জানা নেই যে, হাজার হাজার সৈন্য খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানী র. এর একজন খাদেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার সাহস রাখে না। আর যদি নেমেই যেতো তাহলে পরাজয় ছাড়া আর কোনো উপায় থাকতো না। নক্শবন্দিয়া খান্দানের ফকিরগণ বড় তাসাররুফের (হস্তক্ষেপের) অধিকারী। মহান আল্লাহ্তায়ালা তাঁদের অন্তরের ইচ্ছার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন। আর তাঁরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো আনুগত্যের ধার ধারেন না।

মির্জা সুলতান মাহমুদ এই হুঁশিয়ারী সংবাদ জেনেও স্বীয় পরিকল্পনায় অটল রইলো। সমরকন্দ অবরোধের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করলো। অসংখ্য সৈন্যসামন্ত নিয়ে বের হয়ে পড়লো। তার সাথে চুগতাই সৈন্য ছাড়াও চার হাজার দুর্ধর্ষ তুর্কী সৈন্য মওজুদ ছিলো। বেচারা মির্জা সুলতান আহমদ যুদ্ধ প্রতিহত করতে না পেরে পরাজয়ের ভয়ে পলায়নের ইচ্ছা পোষণ করলো। হজরত খাজার দরবারে উপস্থিত হয়ে পলায়নের অনুমতি চাইলো। হজরত খাজা তখন শহরের মাদরাসায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, যদি তুমি পালিয়ে যাও, তাহলে শহরের সকল লোক বন্দী হবে। সুতরাং তুমি পলায়নের চিন্তা পরিহার করো, মনকে স্থির করো। আমি তোমার জন্য জিম্মাদার হলাম। এরপর তিনি মির্জা সুলতান আহমদকে মাদরাসার একটি কক্ষে বসিয়ে দিলেন। আর হজরত খাজা ওই কক্ষের বারান্দায় অবস্থান গ্রহণ করলেন। নির্দেশ দিলেন একটি উট প্রস্তুত করো। এতে হাওদা লাগানো থাকবে ও কয়েক দিনের রসদও থাকবে। নির্দেশ অনুযায়ী একটি উট প্রস্তুত করে সুলতান আহমদের কক্ষের সামনে উপস্থিত করা হলো।

হজরত খাজা তাঁকে বলে দিলেন, যদি সুলতান মাহমুদ সমরকন্দ বিজয় করেই ফেলে এবং যে ফটকে যুদ্ধ চলছে সে ফটকে প্রবেশ করে, তাহলে তুমি এই উটনীতে চেপে ঘনিষ্ঠ লোকজন নিয়ে অপর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেয়ো। তিনি এভাবেই মির্জা সুলতান আহমদকে সান্ত্বনা দিলেন।

এরপর তিনি মাওলানা সায়্যিদ হাসান, মাওলানা সায়্যিদ কাশেম, মীর আবদুল আউয়াল এবং মাওলানা জাফর র. কে ডেকে পাঠালেন, যারা তাঁর বিশেষ মুরিদ ছিলেন। তাঁদেরকে এইমর্মে নির্দেশ দিলেন যে, যে ফটকে সুলতান মাহমুদ যুদ্ধরত সেখানে অবস্থান গ্রহণ করো এবং আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ করো। যখন সে পলায়ন করবে, তখন তোমরা আমার কাছে আসবে। আর যদি একান্তই তার সৈন্য পরাস্ত না হয়, তাহলে আমার কাছে তোমাদের ফিরে আসার আর কোনো রাস্তা নেই। ওই বুজর্গ চতুষ্টয় ওই ফটকের চূড়ায় উঠলেন এবং মোরাকাবায় নিমগ্ন হলেন।

তাঁরা বলেন, মোরাকাবায় আমাদের অবস্থা এমন হলো যে, আমরা নিজেদেরকে খুঁজেই পাচ্ছিলাম না। চারিদিকে শুধু খাজার অবস্থান। এমন মনে হচ্ছিলো যে, গোটা জগতেই হজরত খাজার অস্তিত্ব পরিব্যাপ্ত। এর মাঝেই মাওলানা জাহেদ কুদ্দিসা সিররুহু অবগত হলেন যে, সুলতান মাহমুদ হজরত খাজার পত্রের গুরুত্ব না দিয়ে সমরকন্দে হামলা করেছে। স্বীয় সহোদর ভাই সুলতান আহমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এই সংবাদ তাঁর আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত হানলো। তার পরাজয়ের জন্য তিনিও রূহানী তাওয়াজ্জোহ্ দিলেন। এই অবস্থাতেই তাঁর কাছে দৃশ্যমান হলো, হজরত খাজার বাতেনী তরবারি সুলতান মাহমুদকে পরাজিত করেছে। একে একে এই সংবাদ হাকিম ওয়াখ্সের কাছে পৌঁছে গেলো, যিনি সুলতান মাহমুদের বন্ধু ছিলেন। এই কথা শুনে তিনি মাওলানার উপর চটে গেলেন ও তাকে ভর্ৎসনা করলেন। এক পত্রে মাওলানার বিরুদ্ধে নালিশ লিখে সুলতান মাহমুদের কাছে প্রেরণ করলেন। ঘটনাক্রমে পত্রবাহকের গন্তব্যে পৌঁছা আর সুলতান মাহমুদের পরাজয় একই সময়ে ঘটে যায়।

কথিত আছে যে, মির্জা সুলতান মাহমুদ ও মির্জা সুলতান আহমদের সৈন্যদের মধ্যে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তীব্র থেকে তীব্রতর যুদ্ধ চলেছিলো। সুলতান মাহমুদের সৈন্যরা প্রায় বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলো। অপর দিকে সুলতান আহমদের সেন্যরা ভীত ও শংকিত হয়ে পড়েছিলো। এমন

সময় কব্‌চাক মরুভূমির দিক থেকে অকস্মাৎ ভয়ংকর ঝড় উঠলো এবং সুলতান মাহমুদের সৈন্যব্যুহ ভেঙে ফেললো। এমন অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, কারো চোখ মেলে তাকানোর সুযোগ রইলো না। মরুঝড়টি যুদ্ধাশ্ব ও যোদ্ধাদেরকে তুলে আছাড় মারলো। পদাতিক ও আরোহী সৈন্যদেরকে মাটিতে ফেলে দিলো। তাঁবুগুলো উপড়ে ফেললো ও উড়িয়ে নিয়ে দূরে দূরে নিক্ষেপ করলো। সুলতান মাহমুদ ও তার আমীর উমরাহ্‌গণ এবং দুর্ধর্ষ তুর্কী বাহিনীর একটি বিরাট দল উঁচু দেয়ালের বিপরীতে একটি পুকুর পাড়ে দণ্ডায়মান ছিলো। হঠাৎ ভূকম্পন শুরু হলো। এতে দেয়ালে ও পুকুরের পাড়ে একটি বড় ফাটলের সৃষ্টি হলো। পুকুরের পাড় ভেঙে পড়লো। ভয়ংকর আওয়াজ উত্থিত হলো এবং মুহূর্তেই চারশ' অশ্বারোহী ও অশ্ব যারা পশ্চাদভাগে দণ্ডায়মান ছিলো, তারা ধসে পড়লো। বিকট আওয়াজ শুনে তুর্কীদের ঘোড়াগুলো ভয়ে পালাতে লাগলো। একটি সুসজ্জিত বাহিনী হঠাৎ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করতে লাগলো। সুলতান মাহমুদ এবং তার সৈন্যসামন্ত, উজির-নাজিরদের মনে আতংকের সৃষ্টি হলো। তিনি ও তাঁর সকল আমীর উমরাহ্‌ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা মাথায় নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দ্রুত শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলো। আর মির্জা আহমদের সৈন্য ও শহরবাসী তাদেরকে ধাওয়া করলো। প্রায় পাঁচ ক্রোশ পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেলো। কিছু লোক বন্দী হলো। কিছু ঘোড়া, অনেক আসবাবপত্র ও অস্ত্র-শস্ত্র গনিমত হিশাবে পাওয়া গেলো। এই পর্যায়ে হজরত খাজার কথার প্রভাব ও হজরত খাজার মুরিদ চতুষ্টয়ের ধ্যানশক্তি এবং মাওলানা জাহেদের কাশফের সত্যতা পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশ পেলো।

হজরত মাওলানা জাহেদ র. রবিউল আউয়াল মাসের শুরুর দিকে ৯৩৬ হিজরীতে দখ্‌শ নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। সেখানেই তাঁর পুণ্যসমাধি অবস্থিত। লোকজন তাঁর জিয়ারত করে বরকত হাসিল করেন।

উল্লেখ্য যে, হজরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার কুদ্দিসা সিররুহুর সন্তানাদি ও তাঁর সাথীবর্গ অনেক। তাঁদের সংখ্যা হিশাব করে তাঁদের নাম ও আলোচনা করা এই কিতাবে সম্ভব হয়নি। রাশহাত নামক গ্রন্থের ৭ম অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তাকারে তাঁদের হালত (অবস্থা) বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে হজরত খাজার সন্তানাদি, আসহাবে কামেলীন, তাঁদের কারামত, মাকামাত ও মোশাহাদার আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য কিতাবেও তাঁদের আলোচনা এসেছে।

হজরত মাওলানা দরবেশ মোহাম্মদ কুদ্দিসা সিররুহু

তিনি তাঁর মামা মাওলানা জাহেদ কুদ্দিসা সিররুহু থেকে খেলাফত লাভ করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি অত্যন্ত পরহেজগার ছিলেন। আজিমত ও ইহ্তিয়াতের উপর আমল করতেন। তাঁর আধ্যাত্মিক নেসবত ও পরম্পরা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সুসংরক্ষিত ছিলো। সেই যুগের আল্লাহ্অন্বেষীদের আশ্রয়স্থল ছিলেন তিনি। ছিলেন কারামত ও তাসাররুফের অধিকারী। নিজের পরিচয় গোপন রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। স্বীয় পরিচয় গোপন রাখার জন্য শিশুদেরকে কোরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন। এই উচ্চস্তরের বুজর্গ এলমে জাহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার মাধ্যমে ইলমে বাতেনকে গোপন রাখতেন। তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন। কারো কাছে তাঁর পরিচয় তথা তাঁর হালত ও কামালত প্রকাশ করতেন না।

একদা এক তুর্কী দরবেশ তাঁর শহর অতিক্রম করছিলেন। তিনি এই শহর অতিক্রম কালে বললেন, এই শহর থেকে এক মরদে খোদার সুগন্ধ আসছে। তাঁর এই বাণী মাওলানা দরবেশ মোহাম্মদের ইঙ্গিত বহন করে।

মাওলানা দরবেশ মোহাম্মদতনয় মাওলানা খাজেগী আমকাংগী র. বর্ণনা করেন, আমার পিতার প্রসিদ্ধি লাভের কারণ এই যে, একদিন শায়েখ নুরুদ্দিন খানী, যিনি হাজী শায়েখ মায়তোশানী র. এর সুযোগ্য খলিফা ছিলেন, তিনি আমার পিতার কামালত সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন। আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বৎস! এই শায়েখকে অনেক বড় বুজর্গ মনে হচ্ছে। এই অঞ্চল তাঁর পদধূলিধন্য হলে আমি তাঁর সাক্ষাতে যাবো। তাঁর এই কথার কিছুদিন পরই শায়েখ নুরুদ্দিন আমকাংগীতে তশরিফ আনেন। আমার পিতা যখন শায়েখ নুরুদ্দিনের আগমনবার্তা শুনলেন, তখন বললেন, আজ বেশী করে দই, মালাই তৈরী করো। আগামি দিন ইনশাআল্লাহ্ শায়েখের সাক্ষাতে যাবো। সেরকমই করা হলো। তিনি সকাল বেলা ওই পোশাকসহ, যা তাঁর গায়ে জড়ানো ছিলো তা নিয়ে এবং তাঁর জন্য প্রস্তুতকৃত হাদিয়া সাথে নিয়ে শায়েখের সাক্ষাতের জন্য রওয়ানা হলেন। ওই সময় আমি তাঁর সাথেই ছিলাম। যখন আমরা তাঁর কাছে গেলাম, তখন তিনি টুপি ও জামা পরিহিত অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে বসে ছিলেন। আমার আব্বাজানকে দেখা মাত্র তিনি দাঁড়ালেন ও আলিঙ্গন করলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত জড়িয়ে ধরে থাকলেন। এরপর নিজের জুব্বা,

পাগড়ি আনিয়ে পরিধান করালেন। অতি আদবের সাথে দু'জানু বিছিয়ে মোরাকাবায় বসে গেলেন। আমার আব্বাজানও তাঁর সাথে মোরাকাবার শেষ পর্যন্ত বসে থাকলেন। এরপর আব্বাজন বিদায়ের অনুমতি চাইলেন। শায়েখ র. পায়ে হেঁটে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে আব্বাজানকে বিদায় জানালেন। এরপর শায়েখ পুনরায় মোরাকাবায় নিমগ্ন হলেন। মোরাকাবা শেষে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তরিকতপন্থীরা এই বুজর্গের কাছে আনাগোনা করছে তাই না? লোকেরা বললো, তিনি তো কোনো শায়েখ নন, একজন সাধারণ আলেম। তিনি শিশুদেরকে কোরআন শিক্ষা দেন মাত্র। এটা শুনে শায়েখ নুরুদ্দিন র. বললেন, সুবহানাল্লাহ! এখানকার লোকেরা অন্ধ ও মুর্দা দিলবিশিষ্ট। এমন একজন কামেল ও মোকাম্মেল দরবেশ পেয়েও তারা ফায়দা ও ফয়েজ হাসিল করতে পারলো না।

শায়েখের এই কথা যখন ছড়িয়ে পড়লো, তখন চারদিক থেকে আল্লাহ্ওয়ালা তরিকতপন্থীগণ হজরতের দরবারে ছুটে আসতে লাগলেন ও তৃষ্ণা নিবারণ করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি তখনও আত্মগোপনের স্বাদ ভুলতে পারলেন না। মানুষের বেশি আনাগোনাতে সংকোচবোধ করতে লাগলেন।

কারামত ঃ নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে, শায়েখ হোসেন খাওয়ারিজমী র. তাঁর জামানার আলোকবর্তিকা ছিলেন। তিনি যেখানেই যেতেন, তাঁর তাসাররুফের (রূহানী হস্তক্ষেপের) সামনে সেখানকার মাশায়েখগণের নেসবতের কোনো মূল্যই থাকতো না। যে দরবেশই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তিনি তাঁর নেসবত ছিনিয়ে নিতেন। যখন মাওলানা দরবেশ মোহাম্মদের এলাকায় তাঁর শুভাগমন ঘটলো, তখন সেখানকার দরবেশগণ তাঁর সাথে মোলাকাত করতে এলেন। মাওলানা দরবেশ মোহাম্মদ বললেন, আমারও শায়েখ হোসেনের সাক্ষাতে যাওয়া উচিত। একথা বলে তিনি শায়েখ হোসেনের নেসবত স্বীয় আধ্যাত্মিকতায় টেনে নিলেন। এদিকে শায়েখ হোসেন কুদ্দিসা সিররহু নিজেকে নেসবতহীন পেয়ে হয়রান ও পেরেশান হয়ে পড়লেন। অস্থিরচিত্ত ও উদ্যমহীন হয়ে গেলেন। যখন মাওলানা দরবেশ মোহাম্মদ শায়েখের সাক্ষাৎ লাভের জন্য ঘোড়ায় চেপে বসলেন, তখন হজরত শায়েখ হোসেন আপন নেসবতের ঘ্রাণ পেতে শুরু করলেন। যেমন হজরত ইয়াকুব আ. তখন থেকেই হজরত ইউসুফ আ. এর জামার ঘ্রাণ পেতে শুরু করেছিলেন, যখন হজরত ইউসুফ আ. এর

জামা মিশর থেকে নিয়ে যাত্রা শুরু করা হয়েছিলো। শায়েখ হোসেনও উটে আরোহণ করে আপন নেসবতের ঘ্রাণের দিকে রওয়ানা হলেন। শায়েখ যতোটা দরবেশ মোহাম্মদের কাছাকাছি যেতে লাগলেন, আপন নেসবতের ঘ্রাণ ততোটাই বেশী অনুভব করতে লাগলেন। যখন পথিমধ্যে পরস্পরের সাক্ষাৎ ঘটলো, তখন সে ঘ্রাণ বন্ধ হয়ে গেলো। শায়েখ হোসেন মনে মনে ভাবলেন, মাওলানা দরবেশ মোহাম্মদই স্বীয় তাসাররুফে (হস্তক্ষেপে) আমার নেসবত ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এরপর শায়েখ অত্যন্ত বিনয়, নম্রতা, অপারগতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করে বললেন, আমার জানা ছিলো না যে, এই অঞ্চলে আপনি অবস্থান করেন। আমি এখনই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। শায়েখের এমন অসহায়ত্ব ও কান্নাকাটিতে তিনি দয়ার্দ্র হয়ে তাঁর নেসবত ফিরিয়ে দিলেন। তিনি স্বীয় নেসবত ফিরে পেয়ে এবং এটাকে মহাসুযোগ মনে করে ওই বাহনেই স্বদেশে ফিরে চললেন।

৯৭০ হিজরীর ১৯শে মহররম বৃহস্পতিবার হজরত মাওলানা দরবেশ মোহাম্মদ পরলোকগমন করেন। শহরের প্রসিদ্ধ স্থান ইসতিফরার নামক পল্লীতে তাঁর মাজার শরীফ অবস্থিত। তাঁর মাজার শরীফ জিয়ারত করে লোকেরা বরকত হাসিল করেন।

হজরত মাওলানা খাজেগী আমকাংগী কুদ্দিসা সিররুহু

তরিকতের নেসবত স্বীয় বুজর্গ পিতা দরবেশ মোহাম্মদ থেকে লাভ করেন। তাঁর মাধ্যমেই এ পথের সন্ধান লাভ করেন এবং তাকমীল ও ইরশাদ এর স্তরে উন্নীত হন। তিরিশ বছর পর্যন্ত পিতার বুজর্গীময় মসনদে সমাসীন ছিলেন। তিনি নিজ হাতে মেহমানদের খেদমত করতেন। বার্ধক্যের কারণে তাঁর হস্ত মোবারক কাঁপতে থাকতো। তৎসত্ত্বেও তিনি স্বহস্তে মেহমানদের দস্তরখানা বিছিয়ে দিতেন। মেহমানদের সওয়ারী, ঘোড়া, আসবাবপত্র এমনকি চাকর বাকরদের খোঁজও তিনি রাখতেন। তিনি হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দের আসল তরিকার অনুসরণ করতেন। তরিকার মধ্যে নতুন সৃষ্ট বিষয়সমূহকে এড়িয়ে চলতেন। প্রশ্রয় দিতেন না। যেমন সেহরীর সময় উচ্চস্বরে ইস্তিগফার পাঠ করা, তাহাজ্জুদের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি এই সকল বিষয় থেকে বিরত থাকতেন। তাঁর সময়ের তরিকত অন্বেষীগণের আকর্ষণ তাঁর দিকেই

ছিলো। আলেম উলামা আমীর উমরাহ্ ফকির-দরবেশগণ ফয়েজ বরকত হাসিল করার জন্য তাঁর দরবারেই ছুটে আসতেন। তাঁর কারামত বা অলৌকিক শক্তি ছিলো দিবাকরের মতো সমুজ্জ্বল। সত্য অন্বেষীগণ দলে দলে তাঁর দরবারে উপস্থিত হতেন। অন্তরের কদর্যতা সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সতর্ক থাকতেন। এলমে ফেরাসাত বা অন্তর্দৃষ্টিতে দক্ষ ছিলেন। সালেকবৃন্দের বাতেনে হস্তক্ষেপে ছিলেন পারদর্শী। শান শওকত ও সম্পদের প্রাচুর্য লাভ হয়েছিলো তাঁর। রাজ-রাজড়ারা তাঁর ধ্যানালয়ের মৃত্তিকাকে সুরমারূপে গ্রহণ করতো এবং তাঁর নির্দেশের অনুসরণ করতো।

কারামত ১ ঃ তুরানের বাদশাহ্ আবদুল্লাহ খান একবার স্বপ্নে দেখলেন, একটি বিরাট তাঁবু টাংগানো হয়েছে এবং তাঁবুতে রসুল স. আগমন করেছেন। একজন বুজর্গ তাঁবুর দরজায় লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি লোকজনের আবেদন রসুল স. এর কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন এবং এর উত্তর লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন।

এরপর রসূল স. তাঁর হাতে একটি তলোয়ার দিলেন। আর তিনি ওই তলোয়ার এনে আমার কোমরে বেঁধে দিলেন। আমার প্রতি তিনি বেশ দয়া ও মেহেরবানী প্রদর্শন করলেন। এরপর বাদশাহ্র ঘুম ভেঙে গেলো। তিনি ওই বুজর্গের আকার-আকৃতি-প্রকৃতি স্মৃতিতে ধারণ করে রাখলেন এবং ওই বুজর্গের অনুসন্ধান করতে থাকলেন। বাদশাহ্ তাঁর নিকটজন ও দরবারী লোকদের সাথে ওই বুজর্গের আকৃতি-প্রকৃতি বর্ণনা করে তাঁর সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিলো না। একদিন বাদশাহ্র দরবারী একজন আলেম হজরত মাওলানা খাজেগী আমকাংগী র. এর দরবারে গেলেন। তিনি ফিরে গিয়ে বাদশাহকে বললেন, আপনি যে আকৃতি-প্রকৃতির বুজর্গের অনুসন্ধান করছেন, তিনি হজরত মাওলানা খাজেগী আমকাংগী ছাড়া আর কেউ নন। বাদশাহ্ এই সংবাদ শুনে খুবই খুশি হলেন। তাঁর নাম-আকৃতি-প্রকৃতি ও ধরন-ধারণ তন্ন তন্ন করে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি সকল কথার পুরোপুরি উত্তর দিলেন। এরপর বাদশাহ্ হজরতের দেশের দিকে রওয়ানা হলেন। এভাবে ওই রহস্য ভাণ্ডারের দীদার পেয়ে ফয়েজের নূরে আলোকিত হলেন। তিনি স্বপ্নে যা দেখেছিলেন, হুবহু তাই দেখতে পেলেন। বাদশাহ্ অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে নজরানা পেশ করলেন। হজরত মাওলানা নজরানা কবুল করলেন না। বললেন, দারিদ্রের স্বাদ কামনাহীনতা ও অল্পে তুষ্টিতেই নিহিত। বাদশাহ্

বললেন, পবিত্র আয়াতের দাবি অনুসারে— তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তাহাদের, যাহারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। সূরা নিসা আয়াত ৫৯। এই কথা শুনে তিনি হাদিয়া নজরানা কবুল করলেন। এরপর থেকে প্রত্যহ সকালে খান সাহেব বিনয় ও নম্রতার সাথে হজরতের খেদমতে উপস্থিত হতে থাকেন।

তাসার্‌রুফ (রূহানী হস্তক্ষেপ) ঃ শোনা যায়, পীর মোহাম্মদ খান পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বাকী মোহাম্মদ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করলো। বাকী মোহাম্মদের মাত্র চার হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য ছিলো। তিনি হজরত মাওলানা খাজেগী আমকাংগী র. এর সাহায্যপ্রার্থনা করলেন। হজরত মাওলানা সশরীরে পীর মোহাম্মদ খানের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে উপদেশ দিলেন। বললেন, তুমি এই ইচ্ছা থেকে ফিরে এসো। মুসলমানদের জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জায়েয নয়। অসংখ্য সৈন্যসামন্ত ও ধনসম্পদের অহমিকা তাকে তাড়িত করছিলো, তাই সে হজরত মাওলানার কথার গুরুত্ব দিলো না। তিনি রাগান্বিত অবস্থায় ফিরে এলেন এবং বাকী মোহাম্মদ খানকে বললেন, হে বৎস! সৈন্যস্বল্পতা নিয়ে চিন্তা কোরো না। বীর সিংহের মতো বিক্রম নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো। আশা করি মাওয়রাউন্নাহারের রাজত্ব তোমার পদচুম্বন করবে। এই কথা বলে তিনি তাঁর স্নেহময় হাত তাঁর পিঠে বুলিয়ে দিলেন এবং তাঁর ছিন্ন রুটি কোমরে বেঁধে দিলেন। বাকি মোহাম্মদ খান তাঁর দোয়া নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এদিকে হজরত মাওলানা তাঁকে বিদায় দেওয়ার পর দরবেশগণের একটি দল নিয়ে শহরের কিনারে একটি পুরাতন মসজিদে কেবলা দিক হয়ে মোরাকারায় বসে গেলেন। কিছুক্ষণ পর পরই মাথা উঁচু করে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, খবর কী? এর মধ্যেই খবর এলো, বাকী মোহাম্মদ খান বিজয়ী হয়েছেন এবং পীর মোহাম্মদ খান নিহত হয়েছেন। এই সংবাদ শুনে হজরত মাওলানা মোরাকাবা থেকে উঠে নিজের আস্তানায় ফিরে এলেন।

কারামত ২ ঃ জনৈক দরবেশ হজরত মাওলানা র. এর মুরিদগণের নিকট বর্ণনা করেন, একরাতে হজরত মাওলানা কোথাও যাচ্ছিলেন আর আমিও কয়েকজন খাদেমসহ তাঁর অনুসরণ করছিলাম। খালি পায়ে পথ চলছিলাম। হঠাৎ আমার পায়ে কাঁটা ফুটলো। যন্ত্রণায় আমি অস্থির হয়ে গেলাম। আমার খেয়াল হলো, যদি হজরত মাওলানা আমাকে জুতো দু'টো

দিতেন, তাহলে আমার কষ্ট কম হতো। তিনি আমার মনের কথা বুঝে ফেললেন। বললেন, হে বন্ধু! কাঁটার আঘাত না খেলে ফুল তোলা যায় না।

কারামত ৩ ঃ হজরত মাওলানার বিশিষ্ট মুরিদগণের নিকট থেকে জানা যায়, একবার তিনজন তালেবে এলেম তিন ধরনের মনোবাসনা নিয়ে হজরত মাওলানার দরবারে এলো। একজনের ধারণা হলো— যদি অমুক খাদ্য দিয়ে আপ্যায়ন করেন, তাহলে বুঝবো, নিঃসন্দেহে তিনি কারামতওয়ালা। দ্বিতীয় জন মনে মনে ভাবলো, যদি আমাকে অমুক ফল খেতে দেন, তাহলে বুঝবো, তিনি সাহেবে আজিমত মহানুভব। তৃতীয়জন ধারণা করলো, যদি অমুক সুন্দরীকে দরবারে হাজির করেন, তাহলে বুঝবো, তিনি কারামতওয়ালা বুজর্গ। হজরত মাওলানা প্রথম দু'জন তালেবে এলেমকে তাদের ধারণা অনুপাতে খাদ্য ও ফল প্রদান করলেন। আর তৃতীয়জনকে বললেন, দরবেশগণ যে উৎকর্ষ, কারামত, কামালত লাভ করেন, তা শরীয়তপ্রণেতা রসূল স. এর অনুসরণের মাধ্যমেই পেয়ে থাকেন। তাই দরবেশগণের খানকায় শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ প্রকাশ পেতে পারে না। এরপর ওই তালেবে এলেমগণের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, বৈধ জিনিসের নিয়তেও ফকির-দরবেশগণের নিকটে আসা উচিত নয়। অনেক সময় দরবেশগণ এ সকল কাজের প্রতি মনোনিবেশ করেন না। এতে আগন্তুক ব্যক্তিগণ অশুভ বিশ্বাসের শিকার হন। ফকিরদের সান্নিধ্যের বরকত হতে বঞ্চিত হন। ফকিরগণের নিকট কারামতের কোনো মূল্য নেই। তাঁদের কাছে একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই আসা উচিত, যাতে করে তাদের নিকট থেকে বাতেনী ফয়েজের কিছু অংশ পাওয়া যায়।

কারামত ৪ ঃ জনাব মাওলানা কুদ্দিসা সিররুহু তাঁর ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে আমাদের খাজা মোহাম্মদ বাকী র. এর নিকট একটি পত্র লিখেন। তিনিই তাঁর প্রধান খলিফা ছিলেন। ওই পত্রে তিনি অনেক ভালোবাসা-মমতা প্রকাশের পর এই কবিতাটি লিপিবদ্ধ করেন—

যমাঁ তা যমাঁ মুরগ ইয়াদ আয়াদম
নাদানম কনুঁ তাচে পেশ আয়াদম।
জুদাই মবাদা মরা আজ খোদা!
ওগর হর চে পেশ আয়াদম শায়াদম।

অর্থঃ স্মরণে সদা আজ মৃত্যু মম
কী কথা রেখে যাবো সেটাই তো বেমালুম।
অটুট থাকুক শুধু খোদার মিলন
যা আসার এসে যাক সেই তো কারণ

এই পত্র হাতে আসার কিছুদিন পরই হজরত খাজা মোহাম্মদ বাকী র. এর নিকট হজরত মাওলানা খাজেগী আমকাংগী র. এর ইন্তেকালের সংবাদ পৌঁছে। তাঁর বয়স হয়েছিলো প্রায় নব্বই বছর। ১০০৮ হিজরীতে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর জন্ম ও সমাধি আমকিনা পল্লীতে।

হজরত খাজা মোহাম্মদ বাকী কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজ

তরিকতের পথে তাঁর নেসবত (সম্বন্ধ) হজরত মাওলানা খাজেগী আমকাংগী র. এর সাথে। তিনি ছিলেন ওয়াইসী নেসবতসম্ভূত। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা ছিলো হজরত খাজা বাহাউল হক ওয়াদদ্বীন খাজা নক্শবন্দ কাদ্দাসাল্লাহু সিররুহুল আজিজের রূহানী ধারায়।

বাণী ঃ তিনি বলেন, একবার আমি এক বুজর্গের একটি কিতাব পাঠ করছিলাম। এক পর্যায়ে আমার উপর একটি তাজাল্লি পতিত হলো। আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। হজরত খাজা বাহাউল হক ওয়া মিল্লাতু ওয়াদ্দ্বীন র. রূহানি আকর্ষণ, জিকিরের চর্চা ও জযবার মাধ্যমে আমাকে ধন্য করলেন। আমি সাহসিকতার সাথে অন্য সকল দিক পরিহার করে আল্লাহ্ওয়ালা বুজর্গদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম।

তাঁর তালিম-তরবিয়ত হজরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরারের রূহানী ধারায়ও পরিপ্লাবিত হয়েছে।

তিনি বলেছেন, হজরত খাজা আহরার র. আমাকে দুগ্ধ পান করানো থেকে বঞ্চিত করেননি।

আমাদের হজরত ইমামে রব্বানী কাদ্দাসাল্লাহু সিররুহুল আজিজ লিখেছেন—

এই জামানার ওলীগণ পূর্ববর্তী ওলীগণের স্থলাভিষিক্ত এবং নক্শবন্দিয়া বুজর্গগণ মারেফাতের উচ্চস্তরে উন্নীত। বেলায়েতের সর্বশীর্ষ স্তরে উপনীত। দারুল খালায়েকের বৃত্তের কুতুব। রহস্য-রহস্যান্তরের যবনিকা উন্মোচনকারী।

মহব্বতে যাতিয়া তথা স্বভাবজাত আল্লাহ্প্রেমে অনন্য। কামালতে মোহাম্মদীয়ার বিদগ্ধ গবেষক। উপদেশদাতা ও হেদায়েতকারীদের প্রাণকেন্দ্র। এই তরিকার মোরর্শেদগণের শুরু শেষ মাকামের মানদণ্ডে উন্নীত হয়। আল্লাহ্প্রেমীদের সারবত্তা ও বিশ্লেষকগণের মধ্যমণি ছিলেন তিনি।

শরহে উ হিফাসত্ ব আহলে জাহাঁ
হামচ রাযে ইশক বায়াদ দর নেহাঁ
লেকে গুফতম ওয়াসফে উ তারাহ বুরান্দ
পেশো আঁ কায ফওতে উ হাসরত খুরান্দ।

অর্থঃ আফসোস যদিও করে দুনিয়ার লোক
তবুও গোপন থাক প্রেমের আলোক
আমি কিন্তু করিলাম ইহার বয়ান
ব্যথিত না হয় যেনো কাহারো পরান।

আমাদের শায়েখ, আমাদের ইমাম, আমাদের আশ্রয়স্থল, আমাদের কেবলা তিনিই সঠিক আরেফ ও কামেল— আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন ও সালামতে রাখুন।

প্রাথমিক অবস্থা ঃ প্রাথমিক জীবনে তিনি শিক্ষা লাভের জন্য জাহেরী কোনো শিক্ষক ব্যতীত প্রথমেই হজরত খাজেগী আমকাংগীর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন এবং তাঁর নিকটেই জয্বার মাকামে উন্নীত হন এবং পূর্ণ ফানা হাসিল করেন। তাঁর মধ্যে এক প্রকারের বাকা, শুহুদ ও কাছরতে ওয়াহদাতের সৃষ্টি হয়। তাঁর বাতেনী নূর চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়, যা কুতুবিয়াতের স্তরের সাথে সম্পর্কিত, উজ্জ্বল নূরে নূরান্বিত। অর্থাৎ তিনি আধ্যাত্মিকতায় চরম উৎকর্ষ লাভ করেন। শায়েখের এজাজতে ওই উৎকর্ষের মাধ্যমে তিনি মানুষকে দীক্ষা ও হেদায়েত প্রদান করেন। ওই মাকামে ইরশাদ এবং তাকমীল তথা পূর্ণতার মধ্যে তাঁর মহান এক মর্যাদা হাসিল হয়। তাঁর এক মুহূর্তের সান্নিধ্যে আল্লাহ্অন্বেষীদের এমন উপকার সাধিত হতো যা বহু বছরের সাধনা ও রেয়াজতে সম্ভব হতো না। এ ছাড়াও তিনি বারো কুতুবের মাকাম থেকে পূর্ণতা হাসিল করেন।

এরপর এই মহান পুরুষ বিশেষ পদ্ধতিতে হজরত উমর রা. এর উচ্চ মাকামে মনোনিবেশ করে সুলুকে ফাউকানী হাসিল করেন। আর তিনি এই

পথ ধরে ইসমে ইলাহির দিকে মনোনিবেশ করেন এবং ইসমে ইলাহীর স্তরে পৌঁছে তাকওয়া, শাহাদাত ও সিদ্দিকিয়াতের পথ অতিক্রম করেন। সে পথ ধরেই গায়েব যাত অর্থাৎ অদৃশ্য সত্তার সাথে মিলিত হন এবং শেষ বিন্দুতে উপনীত হয়ে অস্তিত্বহীন হয়ে যান এবং মহাসৌভাগ্যের পরশে ধন্য ও সমৃদ্ধশালী হন।

জন্ম ও পরিচয় ঃ হজরতের বুজর্গ পিতার নাম কাজী আবদুস সালাম খলজী সমরকন্দী কুরাইশী। তিনি আমলদার আলেম ও খাঁটি দরবেশ ছিলেন। কাবুলে এসে বিবাহ করেছিলেন। হজরত খাজা বাকী কাবুলেই জন্মগ্রহণ করেন। মায়ের দিক থেকে তিনি ছিলেন শায়েখ ওমর ইয়াগিস্তানীর বংশসংযুক্ত। তিনি ছিলেন হজরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরারের নানা। আর হজরত খাজার নানী ছিলেন সাইয়্যেদ বংশের মেয়ে। হজরত খাজার মধ্যে ছেলেবেলা থেকেই নির্জনতা, একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও ধ্যানমগ্নতার প্রভাব পরিলক্ষিত হতো। নক্‌শবন্দিয়া তরিকা মতে তিনি সর্বদা মাগলুবুল হালে ছিলেন। অধিকাংশ সময় নির্জন ধ্যানে রত থাকতেন। সারাক্ষণ আল্লাহ্‌র ধ্যানে কাটিয়ে দিতেন। এই মগ্নতা-মত্ততার মধ্যেই তাঁর সময় অতিবাহিত হতো।

শিক্ষা ঃ যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন এলেম অর্জনের প্রতি মনোযোগী হলেন ও মাওলানা সাদেক হালওয়াইর নিকট পড়াশুনা শুরু করলেন। তিনি ছিলেন আকাবেরে উলামাদের একজন। তাঁর সাথেই তিনি কাবুল থেকে মাওয়ারাউন্নাহারে চলে আসেন। মেধাবী হওয়ার কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর সমবয়সীদের পিছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে যান। এলমি উৎকর্ষতায় সকল স্তরে সুনামের সাথে উত্তীর্ণ হন।

এলমি সফলতা ঃ হজরত খাজার এলমি সফলতা সম্পর্কে কী আর বলবো। তাঁর সহপাঠিরা জটিল ও কঠিন কিতাবাদি এবং যে কোনো কিতাবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পাঠ বুঝতে তাঁর কাছে আসতো। তিনি জটিলতা নিরসন করে দিতেন। এলমি স্তরগুলো উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি সুলুকের পথে পা রাখেন।

আল্লাহ্‌র সন্ধানে ঃ হজরত খাজা ছাত্র জীবনেও সে যুগের ওলীগণের মজলিশে উপস্থিত হয়ে তাঁদের কাছ থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান হাসিল করেন। ওই সময় একবার ভারতবর্ষে আগমন করেন। সত্যানুসন্ধানে সালেক ও মজযুবদের এমনভাবে অনুসন্ধান করেন যে, কোনো মানুষের পক্ষে এর চেয়ে বেশী করা সম্ভব ছিলো না।

লাহোরে বর্ষাকালে কর্দমাক্ত রাস্তায় পথ চলা অত্যন্ত মুশকিল ছিলো। কিন্তু তিনি শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ ও আল্লাহ্ওয়ালাদের অন্বেষণে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতেন। ধুসর প্রান্তর, কবরস্থান, বিরানভূমি ও অরণ্যাঞ্চলে আল্লাহ্ওয়ালাদের খোঁজে বেড়াতেন। তিনি অনেক পুণ্যবান লোকের সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য লাভ করেন। মাওয়ারাউন্নাহার, বলখ, বদখশান সফরে নক্‌শবন্দিয়া সিলসিলার অসংখ্য বুজর্গ ও অন্যান্য সিলসিলার ওলীগণের সাথে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁদের সান্নিধ্যে থেকে সমৃদ্ধি লাভ করেন।

মায়ের দোয়া ঃ তিনি বলেন, আমি ততোটা রেয়াজত ও অনুশীলন করতে পারিনি, যতোটা অন্যান্য বুজর্গানে দ্বীন করেছেন। তবে এমন আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনিশ্চয়তা, অস্থিরচিত্ততা ও ব্যাকুলতা সহ্য করেছি, যা ছিলো অনেক সাধনা ও অধ্যবসায়ের সমষ্টি। আমার আম্মাজান আমার এমন অস্থিরতা, রাত্রিজাগরণ, দুর্বলতা, শক্তিহীনতা প্রত্যক্ষ করে খুবই চিন্তিত ও মর্মাহত হতেন। অনেক কাকুতি মিনতি করে দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌র নিকট এইমর্মে দোয়া করতেন— হে আল্লাহ্! আমার পুত্রের মনোবাসনা পূর্ণ করো, সে তোমার সন্ধানে সকল কিছুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। যৌবনের স্বাদ গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে। আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়েছে। হে আল্লাহ্! তার জন্য আমার এই মিনতি কবুল করো নয়তো আমার মৃত্যু দাও। কারণ আমি তার ব্যর্থতা-কষ্ট-অশান্তি সহ্য করতে পারছি না।

প্রায় সময়ই মধ্যরাতে তিনি আমার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া ও কান্নাকাটি করতেন। তাঁর দোয়ার বিনিময়েই মহান আল্লাহ্তায়ালা আমাকে এই মর্তবা মর্যাদা নসিব করেছেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। আমিন।

সুসংবাদ ঃ হজরত খাজা র. ওই সুসংবাদেরই প্রতিফল, যা হজরত আমিরুল মু'মিনীন হজরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু হজরত হোসেন রা. এর জন্য করেছিলেন। তিনি হজরত হোসেন রা. সম্পর্কে বলেছেন, আমার এই সন্তান সরদার হবে। আর ওই কেন্দ্রের (বিন্দুর) এক প্রকার হলো বাকা, যা আসল কুতুবে মাদারের কেন্দ্রবিন্দু। অর্থাৎ এক প্রকার স্থিতি, যাকে অস্তিত্বের অমরত্ব বলা হয়। আর হজরত খাজা নক্‌শবন্দ ওই স্থিতিশীলতার একটি স্তর। এই স্থিতি-অমরত্বসহই তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

যে পথ ধরে হজরত খাজা গায়েব যাত তথা চিরন্তন সত্তা পর্যন্ত পৌঁছেছেন, ওই পথে খুব কমসংখ্যক ওলী আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছেছেন। ওই মকসুদে আলিয়ায় (সুউচ্চ স্তরে) পৌঁছা আকাবিরুল আকাবিরগণের জন্যই বিশিষ্ট। বিশেষত যে পর্যন্ত খাঁটি মাহবুব না হবে, সে পর্যন্ত এই পথে গায়েব পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। অথবা কামেল মোকাম্মেল ওলীগণের হস্তক্ষেপে (সহযোগিতায়) উক্ত মাকামে পৌঁছতে সক্ষম হবে। এছাড়া এই পথে চলার অন্য কোনো উপায় নেই। তবে হ্যাঁ, নির্বাসনের কঠোর সাধনাসহযোগে এই উচ্চ মাকামে পৌঁছা যায়। তেমনি গায়েবের পথ ধরেও সেখানে পৌঁছা যায়। কিন্তু সুলুকের পথে উক্ত স্তরে পৌঁছা খুবই কষ্টসাধ্য। তবে মহল (স্থান) অবগত হওয়া যায় মাত্র। কিন্তু মাহবুবুল মুরাদগণের জন্য পৌঁছা সম্ভব। কেনোনা জয্‌বা (প্রেমাকর্ষণ) তাঁকে উক্ত মাকামে পৌঁছে দেয়।

নেয়ামতপ্রাপ্তগণের জন্য নেয়ামত পাওয়াই শোভনীয়।

খাজা আমকাংগীর খেদমতেঃ যে সফরে তিনি মাওলানা শেরগানী র. এর সাথে সাক্ষাৎ করেন, সেই সফরেই সমরকন্দের দিকে রওয়ানা হন। তিনি হজরত খাজা আহরার র. কে স্বপ্নে বলতে শুনলেন, তুমি মাওলানা খাজেগী আমকাংগীর দরবারে যাও। অন্য এক স্বপ্নে দেখতে পেলেন, হজরত খাজা আমকাংগী স্বয়ং তাঁকে বলছেন, হে বৎস! আমার দু'চোখ তোমাকে দেখার অপেক্ষা করছে। হজরত খাজা তখন নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করছিলেন—

মান গুযাশ্‌তাম্ যেগম আসুদা কে নাগা যাকামি
আলমে আশ্‌তব নেগাহী সারাহাম বগিরফত।

অর্থঃ আমি চিন্তায় চিন্তায় শেষ হতে চলেছি আর প্রিয়তম আমার পানে একান্তে চোখ রেখেছেন। আমি কী আর কালক্ষেপণ করতে পারি— হৃদয়ের টানেই তাঁর পানে ছুটে চলেছি।

এই অধম ফকির (লেখক) হজরত খাজা মোহাম্মদ সিদ্দিক বদখশী র. এর কাছে শুনেছে, হজরত খাজা র. এর সমীপে তরিকতের পথের দু'টি জটিল মাসয়ালা এসেছিলো, যা কোনোভাবেই সমাধান হচ্ছিলো না। হজরত খাজা আরও জানতেন যে, যিনি এ দু'টি বিষয়ের সমাধান করে দিবেন, তিনিই হবেন তাঁর জাহেরী পীর। এই কথার ভিত্তিতেই তিনি যখন যে বুজর্গের নাম শুনেছেন, তাঁর কাছেই ছুটে গিয়েছেন। ভারত উপমহাদেশের

অধিকাংশ মাশায়েখের সাথে তিনি এ উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করেছেন। কিন্তু কারো কাছেই এ প্রশ্নের উত্তর পাননি। এরপর তিনি বলখ ও বোখারার পথে পা বাড়ান। সেখানকার অনেক বুজর্গের সাথে সাক্ষাৎ করেন। যখন তিনি মাওলানা শেরগানী র. এর সাথে সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি তাঁর নিকট এই দু'টি প্রশ্নের সমাধান প্রার্থনা করেন। মাওলানা বলেন, এ দু'টি জিনিস বাতেন জগতের অনন্য উচ্চতায় লাভ হয়ে থাকে। এই উত্তরের তিনি কোনো প্রান্ত বা সুরাহা খুঁজে পাননি। অবশেষে যখন তিনি মাওলানা খাজেগী আমকাংগী র. এর দরবারে পৌঁছেন, তখন তিনি তাঁকে দেখামাত্রই বললেন, বায়াত হয়ে যাও। তিনি বায়াত হলেন। তারপর কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা ছাড়াই তাঁর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেয়ে গেলেন।

আল্লাহ্র সন্ধানে সিয়াহাত (ভ্রমণ) ঃ হজরত খাজা র. আল্লাহ্র সন্ধানে স্বীয় সিয়াহাতের (ভ্রমণের) বর্ণনা তুলে ধরেন এভাবে— প্রথমে হজরত খাজা উবায়দুল্লাহ র. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে গুনাহ্ থেকে তওবার বায়াত করেন। কিন্তু এই বায়াত তরকের চিন্তা তাঁর মনে গোপন ছিলো। হজরত খাজার প্রথম সবক যিনি দেন, তিনি হজরত মাওলানা লুৎফুল্লাহর খলিফা ছিলেন। আর তিনি ছিলেন হজরত মাওলানা ওয়াহেদীর খলিফা। যেহেতু তখন তাঁর মনের স্থিরতা জন্ম নেয়নি, তাই পুনরায় বন্দেগানে ইখতেখার র. এর হাতে তওবা করেন। এরপর তিনি সমরকন্দে চলে যান। সেখানে হজরত খাজা আহমদ বসরী উচ্চপর্যায়ের বুজর্গ ছিলেন। হজরত খাজা র. বলেন, তিনি আমার তওবাকে বৈধ মনে করলেন না। তিনি বললেন, তুমি এখনও যুবক। কিন্তু প্রবল ইচ্ছা থাকাতে তিনি আমাকে ফাতেহা পাঠ করালেন এবং বললেন, আল্লাহ্তায়ালা দৃঢ়তা দান করুন। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি প্রতিফলিত হলো। আমার সংকল্প আবারো এলোমেলো হয়ে গেলো। প্রকাশিত হলো অসংলগ্নতা। তৃতীয় বার হজরত আমীর আবদুল্লাহ বলখীর খেদমতে তওবার জন্য উপস্থিত হলাম। এবারের তওবাকালে মুসাফাহার সময়েই অনেক দৌলত লাভ হলো। আশা করা যায় যে, এই দৌলত বরকত কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কিছুকাল এই তওবার তত্ত্বাবধানে থাকার পর আবার মুদিল্ল (অন্যমনষ্কতা) এর প্রভাব পরিলক্ষিত হলো। পরিশেষে আল্লাহ্র ইশারায় হজরত খাজা বুজর্গ খাজা বাহাউল হক ওয়াদ্ দ্বীন এর খেদমতে তওবার বিষয় চূড়ান্ত হলো এবং আল্লাহ্ওয়ালাদের তরিকার প্রতি পূর্ণ আকর্ষণ সৃষ্টি হলো। প্রবাদ আছে— ডুবন্ত ব্যক্তি

খড়কুটার আশ্রয়ও সন্ধান করে। এই প্রবাদবাক্যের মতোই তিনি আশ্রয়ের সন্ধানে ব্যাকুলচিত্ত ছিলেন। ওই সময় এক আল্লাহ্‌সন্ধানী বললেন, জিকির ও রসূলুল্লাহ স. এর অনুসরণ অত্যন্ত উপকারী। আমি চাচ্ছিলাম ওই বুজর্গের কাছেই জিকির ও মোরাকাবার পদ্ধতি শিক্ষা করবো। প্রায় দুই বছরকাল ওই বুজুর্গের শিখানো পদ্ধতিতে জিকির, মোরাকাবা ও ওজিফা অনুশীলন করলাম।

এরপর শুনলাম, সালেক যে পর্যন্ত চল্লিশ বছর ধরে 'লা ইলাহার' ময়দান পাড়ি না দিবে, সে পর্যন্ত ইল্লাল্লাহ্ এর মনজিলে পৌঁছতে পারবে না। আমার অনভিজ্ঞতা এই ব্যাপারে উৎসাহিত করলো যে, চল্লিশ বছর জিকির আজকারে কাটিয়ে দেই এবং এই অবস্থায় ইবাদত ও কৃচ্ছতা সাধনকেই আঁকড়ে ধরি। যদিও তখন অন্য তরিকার সুলুক পাড়ি দেওয়ার জন্য গায়েবী (অদৃশ্য) ইঙ্গিত প্রকাশ পেতো। কিন্তু আমি আমার দৃঢ়তা থেকে বিচ্যুত হতাম না। নক্শবন্দিয়া তরিকার বুজর্গগণের অনুগ্রহ ভূমিতে

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ -

(সেথায় রহিয়াছে সমস্ত কিছু যাহা অন্তর চাহে। সূরা যুখরুখ আয়াত ৭১) এমন একটি বীজ বপন করেছিলাম। আর আশা করতাম যে, ইনশাআল্লাহ্ কোনো বুজর্গের হাতে এই বীজটি যা কোনো চক্ষু দেখেনি, যা কোনো কর্ণ শুনেনি এর প্রস্রবণে সিক্ত হবে।

অবশেষে আমি কাশ্মিরে চলে এলাম এবং হজরত শায়েখ মালালী র. এর মজলিশে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হলো। তাঁর বদান্যদৃষ্টিতে ফয়েজ ও বরকতে ধন্য হলাম। আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা যে, ওই শুভদৃষ্টির বরকতেই উদ্দিষ্ট পথের দরজা খুলে গেলো। হজরত শায়েখ মালালী র. নক্শবন্দিয়া তরিকার উচ্চপর্যায় থেকে এজাজত ও খেলাফত লাভ করেছিলেন। সেজন্য তিনি ওই সকল বুজর্গের খানকার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এই ঘরানার বাতায়ন দিয়েই তাওয়াজ্জোহ্ দিলেন। যখন হজরত খাজা মালালী র. দুনিয়া থেকে জান্নাতের দিকে পাড়ি জমালেন, তখন আমার উপর নক্শবন্দিয়া খাজাগণের প্রতিশ্রুত স্মৃতিগুলো ভেসে উঠতে লাগলো এবং তাঁদের পবিত্র আত্মাসমূহ সুসংবাদ ও হেদায়েত প্রদান করতে লাগলেন। ওই সকল বুজর্গের সুদৃষ্টিতে নেসবত ও শক্তিতে দৃঢ়তা জন্ম হলো। প্রজ্ঞার গণ্ডি দৃঢ়বদ্ধ হলো। রাস্তা উজ্জ্বল হলো এবং এক ধরনের স্থিরচিত্ততা অর্জিত হলো।

এভাবে হজরত খাজাগণের অনুগ্রহেই আশ্রয়ের জন্য হজরত মাওলানা খাজেগী আমকাংগী র. এর দরবারে পৌঁছলাম এবং অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তাঁর হাতে বায়াত হলাম। তিনি আমার হাত তাঁর হাতে নিয়ে মোসাফাহা করলেন। আমি হজরত খাজাগণের তরিকা লাভ করলাম। হজরত মাওলানা খাজেগী আমকাংগী র. এর খেদমত ও খাজা নক্শবন্দ এবং তাঁর খলিফাগণের পবিত্র আত্মার ওসিলায় এই পথে অগ্রগামী ও দরগাহের পিয়াসীগণের বরকত লাভ হলো। তিনি দোয়া পাঠ করলেন— হে আল্লাহ্! আমাকে মিসকিন অবস্থায় রেখো এবং মিসকিন অবস্থায় মৃত্যু দান কোরো এবং মিসকিনদের সাথে আমার হাশর কোরো আর তাঁদের প্রতি সালাম, যাঁরা হেদায়াতের অনুসরণ করে। এ পর্যন্ত বলে তাঁর সফর বা ভ্রমণকাহিনী শেষ করলেন।

খেলাফত লাভ ঃ হজরত খাজার মুরিদগণের কাছ থেকে জানা গেছে যখন হজরত খাজা মাওলানা খাজেগী আমকাংগী র. এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য সফর শুরু করলেন এবং আবকিনা নামক স্থানের এক মাইল পথ অতিক্রম করলেন, তখনই হজরত খাজা মাওলানা আমকাংগী র. বুঝতে পারলেন, হজরত খাজা মোহাম্মদ বাকী আমার কাছে আসছেন। হজরত খাজা মাওলানা র. তাঁকে সংবর্ধনা দিতে এগিয়ে গেলেন। পথিমধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটলো। হজরত খাজা তাঁর প্রতি অনেক স্নেহ-ভালোবাসা দেখালেন। তাঁকে তাঁর বাসস্থানে নিয়ে গেলেন এবং মুরিদদেরকে বললেন, খাজা বাকীর জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করো। তিনি বিনয়ের সাথে বললেন, আমার নিজের কাছেই আরামের ব্যবস্থা আছে। হজরত খাজা মাওলানা বললেন, আমরা আগে থেকেই একথা জানি যে, আপনার কাছে সব কিছুর ব্যবস্থা রয়েছে। আপনি প্রদীপ, তৈল, বাতি প্রস্তুত করে প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় এসেছেন। হজরত খাজা আমকাংগী র. তাঁকে তিন দিন তিন রাত কাছে রাখলেন। এই সময় তিনি সম্পূর্ণ একাকী ও ধ্যানমগ্ন ছিলেন। হজরত খাজা বাকীর হাল-হকিকত শুনে তাঁর খুব ভালো মনে হলো এবং তিনি তাঁকে আরও কিছু উপকারী বিষয় শিক্ষা দিলেন। এরপর খেলাফত প্রদানে ধন্য করলেন এবং হিন্দুস্তান তথা ভারত উপমহাদেশে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলেন। হজরত খাজা বাকী বিনয়ের সাথে অপারগতা প্রকাশ করলে হজরত খাজা আমকাংগী তাঁকে ইস্তেখারা করতে বললেন। নির্দেশানুসারে খাজা বাকী বিল্লাহ ইস্তেখারা করলেন। ইস্তেখারার মধ্যে তিনি ভারত উপমহাদেশে হেদায়াত ও এরশাদের সুসংবাদপ্রাপ্ত হলেন।

বর্ণিত আছে— হজরত মাওলানা খাজেগী র. এর কতিপয় পুরাতন মুরিদ এ কথা জেনে ঈর্ষার অনলে জ্বলতে লাগলেন। ভাবলেন, হজরত খাজা বাকীকে মাত্র তিন দিনে খেলাফত প্রদান করে ভারতবর্ষে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলেন। হজরত মাওলানা খাজেগী তাঁদের অবস্থা দেখে বললেন, বন্ধুগণ! আপনারা হয়তো জানেন না যে, এই যুবক কাজ সম্পন্ন করেই আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি শুধু আমার কাছে এসেছিলেন তাঁর অবস্থার সম্পাদনা করাতে। সুতরাং যে ব্যক্তি এরূপ তৈরী হয়ে আসবেন, তাঁকে তাড়াতাড়ি বিদায় করাই সমীচীন। তাঁর পরশে ভারতবর্ষ উজ্জ্বল হবে এবং তাঁর দীক্ষায় উন্নত হৃদয়ের মানুষগুলো পূর্ণতার স্তরে পৌঁছে যাবে।

শাকার শেকান শাওয়ন্দি হামা তোতিয়ানে হিন্দ
যী কানদে পারেসী কেহ ববাঙ্গলা মী রাওয়াদ

অর্থ ঃ পারস্যের এই মিষ্টির পরশ নিয়ে যিনি বঙ্গের পথে চলেছেন, ভারতবর্ষের সকল তোতাপাখি তাঁর পরশে বাতাসায় পরিণত হবে।

অঙ্গীকার ঃ যখন হজরত খাজা বাকী র. জনাব খাজেগী আমকাংগী র. এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এক মনজিল পথ পাড়ি দিলেন, তখন খাজেগী আমকাংগী র. খাজার খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। এক মনজিল দূরত্বে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, আমার কাছে এইমর্মে ওয়াদা করো যে, যদি কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্তায়ালা তোমাকে নৈকট্যের মর্যাদা দান করেন, তাহলে তুমি আমার জন্য সুপারিশ করবে। হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ বিনয়ের সাথে বললেন, এই অধমেরও তো একই কামনা। এরপর হজরত মাওলানা বললেন, আচ্ছা, উভয়ের পক্ষ থেকেই তো এই অঙ্গীকার হতে পারে? বরং তাই হোক। এরপর উভয় পক্ষ থেকেই এই অঙ্গীকার সম্পন্ন হলো। এরপর হজরত খাজা আমকাংগী খাজাকে বিদায় দিলেন।

লাহোর ও দিল্লীতে অবস্থান ঃ হজরত খাজা বাকী র. ভারতবর্ষে আগমনের পর এক বছর পর্যন্ত লাহোরে অবস্থান করলেন। আলেম উলামা শ্রেণীর লোকেরা যাঁরা তাঁর অনুচর-শিষ্য ছিলেন, তাঁরাই তাঁর দ্বারা বেশী উপকৃত হতে লাগলেন। এরপর নক্শবন্দিয়া তরিকার বুজর্গগণের সুসংবাদ অনুযায়ী তিনি দিল্লী আগমন করলেন। আল্লাহ্তায়ালা এই শহরকে বিপদমুক্ত রাখুন। কেনোনা এ স্থানটি আল্লাহ্র ওলীদের কেন্দ্রস্থল। আজও

সেখানে অসংখ্য ওলীর মাজার অবস্থিত। তিনি ফিরোজী কেল্লায় অবস্থান গ্রহণ করলেন। তিনি পাঁচওয়াক্ত নামাজের জন্য মসজিদে ফিরোজীতে তশরিফ নিতেন। ইশার নামাজের পর মোরাকাবায় বসতেন এবং একই মোরাকাবায় সারা রাত কাটিয়ে দিতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সম্পন্ন করার পর যখন তিনি নিজ বাসভবনে যেতেন, তখন বাসভবনের দরজায় কিছুক্ষণ বসতেন, আর তাঁর সকল সঙ্গী-সাথীরা অবনত মস্তকে বৃত্তাকারে অত্যন্ত বিনয় ও শিষ্টাচারের সাথে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাঁর প্রতি সরাসরি দৃষ্টিপাত করতে কারো সাহস হতো না। আর তিনিও কারো প্রতি সরাসরি দৃষ্টিপাত করতেন না। বরং মোরাকাবার ভঙ্গিতে নিচের দিকে দৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যদি হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি কারো প্রতি বা কারো দৃষ্টি তাঁর প্রতি পড়তো, তাহলে সাথে সাথেই সে বেহুঁশ ও অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে যেতো। জবাই করা মোরগের মতো মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকতো। ফলে শহরে একটা শোরগোল সৃষ্টি হতো। দিল্লীর হাট-বাজারের লোকজন এমতো শোরগোল শুনে সেখানে জড়ো হয়ে যেতো।

দেশময় তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। যেখানে যেখানে প্রকৃত আল্লাহ্‌অন্বেষীগণ ছিলেন, তাঁরা ওই সূর্যের মতো আলোদানকারীর দিকে ধাবিত হতে লাগলেন। তখনকার দিল্লী ও আশপাশের মাশায়েখগণ খেলাফত, মাশায়েখিয়াত ও সাজ্জাদানশীনসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও সকল পদ-পদবী ছেড়ে অভাবী লোকের মতো তাঁর দরবারে উপস্থিত হতে লাগলো এবং তাঁর পবিত্র দরবারের মাটিকে নিজেদের চোখের সুরমা করে নিলো।

টিকা ঃ *'জুবদাতুল মাকামাতের' ১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, লাহোর থেকে তিনি মাওয়ারাউন্নাহারে তাশরিফ রাখেন। হাজ্‌রাতুল কুদুসের প্রথম খণ্ডের ২৭৫ পৃষ্ঠায়ও মাওয়ারাউন্নাহার সফরের কথা উল্লেখ আছে। পৃষ্ঠা ১২তে উল্লেখ রয়েছে, তিনি পুনরায় দিল্লীতে তাশরিফ আনেন। ওই পৃষ্ঠায় আরও উল্লেখ রয়েছে, মোহাম্মদ হাশেম কাশমী এই কিতাবের লেখক। এই কিতাবে হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্‌র পূর্বের নকশবন্দি বুজর্গগণের হালত বর্ণনা করা হয়েছে। এই কিতাবের হাতে লেখা একটি অনুলিপি মদিনা তায়্যেবায় আরেফ হুকমাত লাইব্রেরীতে আছে। তাশকন্দের কিতাবখানায়ও এর একটি অনুলিপি আছে। সেটা লিখেছিলেন ডা. গোলাম মোস্তফা সাহেব মা. আ.।*

তাঁর তরিকা ঃ হজরত খাজার তরিকা ছিলো প্রচারবিমুখতা, ধ্যানমগ্নতা, পরিচয় গোপন করা, বিনয় ও নিজেকে ছোট মনে করা ইত্যাদি। প্রয়োজন ছাড়া তিনি কথা বলতেন না। এতদসত্ত্বেও তাঁর নিকট গমনাগমনকারীদের সাথে অত্যন্ত নম্র-ভদ্রভাবে সাক্ষাৎ করতেন। মুসলমানদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য সদাসচেষ্ট থাকতেন। নেতৃস্থানীয় লোক, সমাজপতি ও উলামায়ে কেরামকে সম্মান করতেন। যখন কোনো তালেবে মাওলা সত্যের সন্ধানে হজরতের দরবারে আসতেন, তখন তিনি বিনয়ের সাথে অপারগতা প্রকাশ করতেন। নিজেকে এ কাজের জন্য অনুপযুক্ত ভাবতেন। সত্যানুসন্ধানীগণ তাঁর এমতোআচরণকে বিনয় ও তাঁর উচ্চমর্যাদার প্রমাণ মনে করতেন। যখন তিনি খাঁটি অনুসারীদের দৃঢ়তা লক্ষ্য করতেন তখন তাঁদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দীক্ষার ছায়ায় বরণ করে নিতেন। আর যাঁকে তিনি গ্রহণ করতেন, তাকে প্রথমে তওবা করতে বলতেন। তাঁর ইশক-মহব্বতের উন্নতি দেখতে পেলে তাকে সার্বক্ষণিক তত্ত্বধানে-সোহবতে থাকার নির্দেশ দিতেন এবং তরিকতের পথের অনেক শাখা-প্রশাখাগত বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। অধিকাংশ মুরিদকে কলবি জিকির করার নির্দেশ দিতেন। কাউকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এর জিকির শিক্ষা দিতেন, আর কাউকে দিতেন শুধু ইসমে যাতের ('আল্লাহ্' নাম) জিকিরের নির্দেশ। অনেক মুরিদ শুধু সাক্ষাতের মাধ্যমই তাঁর নেসবত হাসিল করতেন। যাঁকে তিনি তালিম তরবিয়ত করতেন এবং যাঁর প্রতি মনোযোগ দিতেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তরে আল্লাহ্র স্মরণ জারী হয়ে যেতো। কারো কারো নিকট আলমে মেছাল (উপমার জগত), আলমে আরওয়াহ (রূহের জগত), আলমে মা'আনী (আত্মিক অর্থের জগত) এর তাৎপর্য খুলে যেতো। এই হাল কারো প্রতি দীর্ঘস্থায়ী হতো। আবার কেউ কেউ তাঁর তাওয়াজ্জোহ্ প্রদান কালে জবাই করা মুরগির মতো ছটফট করতে থাকতো। আবার কেউ হতো বেহুঁশ, অপ্রকৃস্থিত। আবার তাঁর তাওয়াজ্জোহের ফলে তাঁদের হুঁশ ফিরে আসতো। প্রসিদ্ধ কথা হলো— শায়েখ জীবিত করেন ও মৃত করেন। এই সকল ঘটনা তাঁর জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো।

সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া ঃ জনসাধারণের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ ছিলো। একবার লাহোরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। তিনি তখন সেখানেই অবস্থান করছিলেন। কয়েকদিন থেকে ছিলেন অনাহারী। যখন তাঁর সামনে খানা নিয়ে আসা হলো, তখন তিনি বললেন, এটা কোনো ইনসাফের কাজ

নয়। শহরের অলিতে-গলিতে মানুষ না খেয়ে মারা যাবে, আর আমরা উদরপূর্তি করবো— একথা বলে তিনি তাঁর নিকট উপস্থিতকৃত খাবার ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। আর নিজে রূহানী খাদ্যের উপর নির্ভর করে রইলেন। যেমন হাদিসে বলা হয়েছে 'আমি আমার প্রভুর কাছে থাকি ও পানাহার করি'।

যখন তিনি লাহোর থেকে দিল্লী রওয়ানা হলেন, তখন পথিমধ্যে এক অচল অসহায় লোককে দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ঘোড়া থেকে নেমে অচল লোকটিকে ঘোড়ায় চড়তে অনুরোধ করলেন। নিজে পায়ে হেঁটে পথ চললেন। গোটা পথই তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে চললেন, যাতে তাঁর এই কাজটি অন্যরা না জানে। যখন গন্তব্যের কাছাকাছি চলে এলেন, তখন আবার ঘোড়ায় চড়লেন যাতে এই পুণ্যময় কাজটি আড়ালে থেকে যায়।

অন্যান্য জীবের প্রতিও তাঁর দয়া ছিলো অপরিসীম। একবার শীতকালে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার জন্য ওঠলেন। এমন সময় একটি বিড়াল এসে তাঁর বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লো। তিনি ভোর পর্যন্ত শীতের তীব্রতা সহ্য করলেন। কিন্তু বিড়ালকে বিরক্ত করলেন না।

তরিকার প্রচার-প্রসার ঃ কাউকে শরীয়তের খেলাফ কোনো কাজ করতে দেখলে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের কঠোরতা প্রদর্শন করতেন না। ইশারা-ইঙ্গিত ও উপমার মাধ্যমে এরশাদ করতেন। বলতেন, যারা আমাদের সোহবতে আসবে, তারা নিজে থেকেই নাজায়েয কাজ ছেড়ে দিয়ে নেক কাজের দিকে চলে আসবে। তাঁর মজলিশ ছিলো বেহেশতী মজলিশের নমুনা। যেখানে কাউকে আদেশ-নিষেধ, পরনিন্দা বা আপত্তিকর কোনো কিছুর মুখোমুখি হতে হতো না। কেউ কোনো মুসলমানের গীবত শুরু করলে তিনি তা বন্ধ করে সাথে সাথে ওই লোকের কিছু প্রশংসা শুরু করতেন।

তরবিয়ত বা দীক্ষা প্রদানের পদ্ধতি ঃ অনেক সময় এমন হতো যে, বহু নিষ্ঠাবান ধনীলোক তাঁর কাছে নগদ অর্থ প্রেরণ করতেন, যাতে তিনি তা তাঁর ইচ্ছামতো গরীব-মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করতে পারেন। নির্জনতা, জনবিচ্ছিন্নতা ও স্বাধীনচেতা মনোভাব থাকা সত্ত্বেও সৃষ্টজীবের প্রতি ভালোবাসার কারণে মুত্তাকী ও নিষ্ঠাবান লোক খুঁজে খুঁজে দান করতেন। ওই অর্থ হকদারদের জন্য যথেষ্ট না হলে অবশিষ্ট হকদারকে নিজের থেকে দান করতেন। মুরিদগণকে সর্বদা নিঃস্বতা, সহনশীলতা, নিজেকে অপরাধী

ভাবা ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন এবং এ সকল গুণাবলীকে আল্লাহ্ওয়ালাদের আমানত মনে করতেন। তাঁর মুরিদগণের মধ্যে এ সবের পরিপন্থী কোনো কাজ করতে দেখলে তিনি তাদেরকে কঠোর ভাষায় শাসন করতেন।

সংসারবিরাগী ও স্বাবলম্বিতা ঃ পার্থিবতার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ বিরাগ ছিলেন। তাঁর জান্নাতুল মহফিলে দুনিয়াবী বিষয়ে কোনো আলোচনাই হতো না। এই সকল কাজে তিনি নিজে বা তাঁর সাথীবর্গের কেউই চেষ্টা করতেন না। দরবেশগণ ও আপন লোকেরা দারিদ্র, ক্ষুধা ও অল্পেতুষ্টি ছাড়া আর কিছুই কামনা করতেন না। কতিপয় সম্পদশালী লোক নিবেদন করতেন, আপনি চাইলে খানকার ফকিরদের জন্য ভাতা বরাদ্দ করে দেই। কিন্তু যারা হজরতের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন, আধ্যাত্মিকতায় সফলতা লাভ করেছেন, তাদের পক্ষে এ বিষয়ে রাজি হওয়া সম্ভব ছিলো না। তিনি বলতেন, তাদের উচিত আমার মতো ব্যক্তিজীবনে তাওয়াক্কুল, অল্পেতুষ্টি, সংসারবিরাগ ও রেয়াজতমগ্ন থাকা। তবে নিম্ননেসবতধারীদের জন্য অবশ্য বেতন ভাতা বৈধ মনে করতেন। আবার তিনি একথাও বলতেন যে, আমার মাধ্যমে যাদের আর্থিক উপকার সাধিত হয়, বুঝতে হবে, তাদের সাথে আমার দ্বীনি মহব্বতের ঘাটতি আছে।

লক্ষ টাকা ফিরিয়ে দিলেন ঃ একবার তিনি হেজাজ সফরের দৃঢ় ইচ্ছা করলেন। খাঁনে খাঁনা (যিনি তৎকালীন সময়ে সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন) এই সংবাদ শুনে তৎকালীন এক লক্ষ টাকা হজরত ও তাঁর দরবেশ দলের খরচের জন্য প্রেরণ করলেন এবং এমতো নিবেদন উপস্থাপন করলেন যে, এই সামান্য অর্থটুকু কবুল করে আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। তিনি এই অর্থ গ্রহণ না করে ফেরত দিলেন। বললেন যে, আমার জন্য হজ করা এমন জরুরী কাজ নয় যে, মুসলমানদের এই বিরাট অর্থ আমি নিজের জন্য খরচ করবো।

খাদ্য ও পোশাক ঃ তাঁর পোশাক আশাক, খানাপিনা ও জীবনযাপন ছিলো খুবই সাধাসিধা। যদি তাঁকে একই খাবার দীর্ঘ দিন ধরে দেওয়া হতো, তবুও তিনি একবারও একথা বলতেন না যে, এছাড়া অন্য কিছু আছে কি না। একই জামা দীর্ঘদিন পর্যন্ত পরিধান করতেন, ময়লা হয়ে যেতো, তবুও অন্য জামা আনতে বলতেন না। তাঁর বাসস্থান সংকীর্ণ, অন্ধকারাচ্ছন্ন, খড়কুটায় আচ্ছন্ন অথবা জরাজীর্ণ হয়ে বিধ্বস্ত হওয়ার

উপক্রম হলেও সম্প্রসারণ, সংস্কার ও পরিছন্ন করার আদেশ দিতেন না। কেনোনা তিনি সারাক্ষণ আল্লাহ্র সমীপে আত্মনিবেদিত ও তাঁর সন্তুষ্টির দরিয়ায় নিমজ্জিত থাকতেন। এইরূপ নিঃস্বতা ও শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও (যা তার নিত্যসঙ্গী ছিলো) তিনি সর্বদা ওজুসহ ইবাদতমগ্ন থাকতেন। ইশার নামাজের পর নিজ কক্ষে প্রবেশ করে মোরাকারা করতেন। শরীরিক দুর্বলত ও তন্দ্রা অনুভব করলে, নতুন করে ওজু করে দু'রাকাত নামাজ পড়ে নিয়ে পুনরায় মোরাকাবায় নিমগ্ন হতেন। যখন শরীরে ব্যথা বা জড়তা অনুভব করতেন, তখন পুনরায় ওজু করতেন, দু'রাকাত নামাজ আদায় করতেন ও মোরাকাবায় মগ্ন হতেন। সারারাত এভাবে শেষ করে ফজর আদায় করতেন।

আহারে সতর্কতা ঃ আহারে তাঁর এরূপ সাবধানতা ছিলো যে, কোনো পবিত্র মাধ্যম হতে কর্জে হাসানা গ্রহণ করতেন এবং সেই অর্থে কেনা দ্রব্য-সামগ্রী দ্বারা তাঁর ও তাঁর সাথী-দরবেশগণের খানা পাকানো হতো। 'আমরা হাদিয়া ফেরত দেই না' হাদিসের দাবি অনুযায়ী ব্যতিক্রম ছাড়া হাদিয়া ফেরত দিতেন না। ওই হাদিয়া দ্বারাই ঋণ পরিশোধ হতো। তিনি বাবুর্চিকে ওজুসহ থাকার তাকিদ দিতেন। রান্নার সময় আল্লাহ্র স্মরণরত থাকার ও দুনিয়াবী আলোচনা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিতেন। বলতেন, যে খাদ্য অসাবধানতা ও আল্লাহ্র স্মরণ ব্যতীত পাকানো হয়, তা থেকে এমন এক ধোঁয়া বের হয়, যা ফয়েজের রাস্তা ও বদান্যতার পথ রুদ্ধ করে দেয়। পবিত্র রূহ ফয়েজের ওসীলা মাত্র। সালেকীন ও আল্লাহ্ওয়ালাদের সাথী এমন দিলওয়ালা হয় না, যে জিকির বা রেয়াজত ব্যতীত সময় অতিবাহিত করে। তিনি তাঁর মুরিদদেরকে এ সকল বিষয়ে সতর্ক থাকার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন। হজরতের আম্মাজান নিজেই রান্না করতেন। তিনি অত্যন্ত পুতঃপবিত্রা আল্লাহ্ভীরু ছিলেন। যেহেতু তিনি হজরত খাজার এহেন সতর্কতা সম্পর্কে জানতেন, তাই অন্যান্য সেবিকা থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজ হাতে চুলায় রুটি ভাজতেন এবং নিজ হাতে তা পাত্রে তুলে রাখতেন এবং নিজ হাতে তরকারি রান্না করতেন।

আজিমত ঃ হজরত খাজা র. দ্বীনের সকল কাজে আজিমতের উপর আমল করতেন। ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ যেহেতু সহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, আর ইমাম শাফেয়ীর মতে এ ছাড়া নামাজই হয় না, তাই

তিনি কখনো কখনো ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ করতেন। এমতাবস্থায় তিনি হজরত ইমাম আবু হানিফা র. কে স্বপ্নে দেখেন। দেখেন, তিনি নিজের সম্পর্কে একটি কবিতা আবৃত্তি করছেন। কবিতাটির মর্মার্থ এরকম— হাজার হাজার আউলিয়া আমার মাজহাবে গত হয়ে গেছেন .....। এই স্বপ্ন দেখার পর থেকে তিনি ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ ত্যাগ করেন।

এরূপ কামেল হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে তুচ্ছ ও হেয় মনে করতেন। মহামিলনের সমুদ্রে নিমজ্জমান থেকে সর্বদা শুষ্ক ঠোঁট থাকতেন। যেমন নিজেই বলেন—

দর রাহে খোদা জুমলা আদব বায়াদ বুওয়াদ
তা জাঁ বাকী আস্‌ত দর তলব বায়াদ বুওয়াদ।
দরয়া দরয়া আগার বকামাত রিযান্দ
কম বায়াদ খুরদ খুশক লব বায়াদ বুওয়াদ।

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র পথে শিষ্টাচার অবলম্বন করা উচিত। যতোক্ষণ পর্যন্ত নিঃশ্বাস জারী আছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সন্ধানে লেগে থাকো। সাগর সাগর পানিতেও যদি তৃষ্ণা নিবারণ করো, তাকেও কম মনে করবে এবং আল্লাহ্‌র সন্ধানে ঠোঁট শুষ্ক রাখবে।

হজরত খাজা র. এর অনেক মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ চিত্রপত্র রয়েছে। সেগুলো থেকে কিছুসংখ্যক চিঠি উদ্ধৃত করা হলো।

মকতুব ১. সদাসতর্কতা (হুঁশ হরদম) ঃ নক্‌শবন্দিয়া তরিকার আকাবিরগণ বলেন, আমাদের তরিকা হলো সততসতর্ক থাকার তরিকা। আর এতে আজিমত (কঠোরতা) এবং উদারতা বা শিথিলতা বলতে কিছু নেই— চাই তা জিকিরের লেবাসে বা সুরতে হোক অথবা হোক তাওয়াজ্জোহের সুরতে কিংবা রাবেতা (নিরবচ্ছিন্ন যোগসূত্রে) সূত্রে। মোটকথা যেভাবেই হোক তা যেনো হয় আল্লাহ্‌র স্মরণ-সান্নিধ্যের উদ্দেশ্যে। উক্ত স্মরণে যখন এ অবস্থার জন্ম নিবে, গায়রুল্লাহর উপস্থিতি এই স্মরণের প্রতিবন্ধক হবে না। তখন এই স্মরণকে সুফিগণের ভাষায় ওজুদে আদম বলা হবে। আর যখন এই অবস্থাটি সালেকের যোগ্যতায় পরিণত হবে, তখন তাকে বলা হবে মুশাহাদা। আর যখন এই অবস্থা সালেক নিজের মধ্যে দেখতে না পাবে, তখন তার ফানায়ে হাকীকীর মর্যাদা

হাসিল হবে। আর তখনই 'আল্লাহ্কে আল্লাহ্ই চিনেন' এর বাস্তবতা প্রমাণিত হবে। আর ওই অবস্থা না আত্মিক, না অবয়বময়। শুহুদ হয়ে যায় মোশাহাদা। অর্থাৎ সকল কিছু বাস্তবরূপে প্রকাশিত হবে। আর যখন ওজুদে হক্কানীর লেবাস বাকায় পরিণত হয়ে গোপানীয়তা প্রকাশিত হয়ে যাবে, আর নিজের গুণাবলীকে উপস্থিতির মতো নিজেকে নিজের মধ্যে অনুভব করতে না পারবে, তখন আল্লাহ্র অনুগ্রহের সাহায্যে শরীরের জোড়া বন্ধন এবং সকলকিছুকে আদি-অন্ত থেকে পৃথক দেখতে পাবে এবং এই পৃথক দেখা প্রতিবন্ধকতার দ্বিতীয় যুক্তিগ্রাহ্য বস্তু বলে জানবে। কথায় আছে— ওজুদ তথা বাস্তবতার ঘ্রাণও পায় না— এর ভেদ বা গোপন রহস্য সেখানে প্রকাশ পেয়ে যায় এবং সালেকের জবানে এই সঙ্গীত ধ্বনিত হতে থাকে—

তা হক বদো চশমে ছার না বীনাম হরদম
আজ পায়ে তলব মী না নাশীনম হরদম।
গো ইয়ান্দ কে হক বেপশম সার না তাওঁয়াদিদ
আঁ ইশাঁ আন্দ ও মান চানিনম হরদম।।

অর্থ ঃ যে পর্যন্ত তোমার মাথায় অবস্থিত দুচোখ দ্বারা আল্লাহ্কে সর্বদা না দেখতে পাবে, সে পর্যন্ত তাঁর অন্বেষণ করতে থাকো। লোকেরা বলে থাকে চর্মচোখে খোদাকে দেখা যায় না। তাদের কথা তাদের কাছেই থাক। আর আমি আমার কথা বলতে থাকি।

মকতুব ২. তাজাল্লির প্রকারভেদ ঃ কতিপয় আকাবের সুলুকের পথে তাজাল্লিয়াতে ইলাহীকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম প্রকার হলো তাজাল্লিয়ে সূরী (আকৃতিগত তাজাল্লি) যাকে প্রাথমিক স্তর বলা হয়। দ্বিতীয় স্তর হলো তাজাল্লিয়ে মা'নবী (অর্থগত তাজাল্লি) যা মধ্যবর্তী স্তর। তৃতীয়তঃ তাজাল্লিয়ে যাতি (সত্তাগত তাজাল্লি) যা চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থানকারীদের জন্য স্থিরীকৃত। আবার কেউ কেউ তাজাল্লির চারটি স্তর বর্ণনা করেছেন। তাদের মতে প্রথম প্রকারের দুটি স্তর, যথা— ১. তাজাল্লিয়ে সূরী। ২. তাজাল্লিয়ে নূরী। আমাদের আকাবেরগণের তরিকায় এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়নি।

সারকথা হলো— ওজুদে আদমের বহিঃপ্রকাশে রয়েছে অনেক গোপন রহস্য। সুলুকের শেষ পর্যায়ে পৌঁছার পর এর থেকে কতিপয় ভেদ-রহস্য প্রকাশ পায়। আর সালেকগণ তাজাল্লিয়ে সূরী, নূরী ও মা'নবীকে এই

মাকামে শুহুদ তথা প্রত্যক্ষ দর্শনের মধ্যে অন্তর্নিহিত বা বিলীন পেয়ে থাকে। তাই তরিকার আকাবেরগণ স্বীয় গ্রন্থাদিতে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেননি। সেজন্য আমিও তাঁদের অনুসরণে কলমকে এখানেই থামিয়ে দিচ্ছি।

মকতুব ৩. আত্মিকশক্তি ঃ প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর মর্তবা অনুযায়ী ঊর্ধ্বজগত থেকে অবতরণ করে আত্মার পরিচ্ছদে ও আরশিতে জ্যোতির্ময় হয়ে আত্মাকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এই শক্তি প্রদান করেন। আত্মা যে বস্তুর দিকে আকর্ষণবোধ করে, তারই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে এবং তার রঙে রঞ্জিত হয়। তার সাথে একাকার হয়ে যায়। নিজেকে তার থেকে আলাদা সত্তা বা পরিচয়ে চিনতে পারে না। যেরূপ সর্বসাধারণ নিজের স্থূল দেহ বা শরীরের বাইরে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে না। অনুরূপ আল্লাহ্তায়ালা সকল সৃষ্টজীবকে সকল সৃষ্টির মধ্যে অনুচক্রাবৃত করেছেন। যখন এই প্রারম্ভিকা জানা হয়ে গেলো, তখন একথাও স্পষ্ট বুঝা গেলো যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত আত্মা তার অধীনে বন্দী থাকে, ততোক্ষণ সে চায় না যে, বন্দীত্ব ও বন্ধনের পোশাক খুলে ফেলে সে স্থায়ী ঠিকানায় চলে যাবে।

উজুদে আদম ঃ কিছু স্বাধীনতা এমন, যা আলমে বরজখের হুকুম রাখে অর্থাৎ কবর জগতের ন্যায় আবদ্ধ। গঠনগতভাবে তা ধ্বনি ও ধারণার দৃষ্টিকোণ থেকেও আবদ্ধতা বা বন্ধনাবদ্ধতার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। আত্মা স্বীয় যোগ্যতানুসারে দ্রুত বা ধীরগতিতে তার দিকেই ঝুঁকে পড়ে। কেনোনা বিভিন্ন উপকরণে গঠিত এই শরীরের সাথে আত্মার সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ় ও মজবুত। তাই মোর্শেদগণ প্রথমে দেহের অভ্যন্তরে কলবের প্রতি তাওয়াজ্জোহ্ প্রদান করেন বা মনোযোগী হন, যাতে সেটা এই পথে চলে আসে। যদ্দ্বারা বাইরের ইতস্ততা দূর হয়, ইন্দ্রিয়ানুভূতি লোপ পায় ও স্পর্শশক্তি কমে যায়, যা আকৃতিবিশিষ্ট দেহের মধ্যে পরিভ্রমণ করে। দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত। এজন্য দেহের প্রকৃত অস্তিত্ব রূহের বা আত্মার উপর তাজাল্লি তথা আলো বিকিরণ করে। আর যেহেতু আল্লাহ্র প্রকৃতির সাথে বাহ্যিক অস্তিত্ব পূর্ণতা পাওয়া অস্তিত্ব একাধিক বা ভিন্নতা হওয়ার কারণ নয়, এজন্য বাস্তবতা উন্মোচিত হয়ে যায় এবং ফানা ও আত্মবিস্মৃতি ঘটে যায়। কেনোনা এই সংযোগ বা সঙ্গতাই হলো তাজাল্লীয়ে মা'নবী এবং বাকা বা স্থায়িত্ব এর উপরই ভিত্তিশীল, তা হলো— 'আমার মাধ্যমেই দেখেন আমার মাধ্যমে শোনেন'। নিম্নের কবিতায় সে কথাই বলা হয়েছে—

ইশক আদম ও চশম চু খুনম আন্দর রগ ও পুশত
তা করদ মেরা তেহী ও পর করদ আয্ দোস্ত
আজযা উজুদ উজুদম হামগী দোস্ত গরফত
নামেস্ত যামান বরমান ও বাকী হামা উস্ত।

অর্থ ঃ আল্লাহ্তায়ালার প্রেম-ভালোবাসা আমার শিরা উপশিরায় অনুপ্রবেশ করেছে। আমাকে আমা থেকে মুক্ত করে বন্ধুর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। আমার অস্তিত্বের প্রতিটি কণা বন্ধুর মধ্যে বিলিন হয়ে আছে। এখন শুধু আমার নামটি অবশিষ্ট রয়েছে। বাকী সবই তিনি।

সমষ্টি সমষ্টিতেই অনুপ্রবেশ করে একিভূত হয়ে যায়। এজন্য এই মাকামে অবস্থানকারী ব্যক্তি সচেতন অবস্থায় স্বেচ্ছায় তাজাল্লীয়ে নূরীর সাথে একিভূত হয়, যার কোনো রঙ নেই, অবয়ব বা আকৃতি নেই। এই তাজাল্লি দ্বারা সেই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেনোনা এটা অবতরণের নিম্নের স্তর। আর এটাই হলো উজুদে আদম স্তরের ভেদ— ভেদান্ত।

ফানায়ে আতাম ঃ কিন্তু ফানাফিল্লাহ্র অস্তিত্ব 'আল্লাহ্তায়ালাই শুধু আল্লাহ্তায়ালাকে চিনেন' এই কথার মধ্যেই নিহিত। এই ফানাফিল্লাহ্ই ফানায়ে আতাম এবং ফানায়ে আকমাল অর্থাৎ চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ ফানা। আমাদের শায়েখ মাওলানা খাজেগী কুদ্দিসা সিররুহু ফানায়ে আতাম সম্পর্কে এই পঙ্ক্তি পাঠ করতেন—

মাদাহ ও যিম্মাত গর তাফাউত্ মী কুনাদ্
বুতগরী বাশীকে উবুত মী কুনাদ।

অর্থ ঃ প্রশংসা ও নিন্দার মধ্যে যদি কেউ পার্থক্য বুঝতে পারে, তবে বুঝবে মূর্তি নির্মাতা নিজেই সেই মূর্তির পূজা করছে।

তিনি আরও বলতেন, যখন প্রশংসা ও নিন্দাবাদের প্রতিক্রিয়ায় মনোযোগ ও একাগ্রতায় বিঘ্নতা সৃষ্টি না হবে, তখনই ফানায়ে আতাম (পরিপূর্ণ ফানা) অর্জন হবে, যা আল্লাহ্তায়ালার দরবারে সালেকের জন্য হয়ে থাকে। এই কথা দ্বারা হজরত খাজা র. এর ওই কথার গুরুত্ব বুঝা যায় যেমন তিনি বলেছেন, উজুদে আদম উজুদে বাশারিয়াতের দিকে ফিরে আসে। কিন্তু উজুদে ফানা বা উজুদে আতাম কখনো ফিরে আসে না।

মকতুব ৪. নক্‌শবন্দিয়া তরিকার পরিভাষাসমূহ

ইয়াদ্ করদ্ ঃ জবান বা জিহ্বা দ্বারা আল্লাহ্‌র জিকির করা।

বাজে গাশ্‌ত ঃ এই কথা বলা যে, ইয়া ইলাহী তুমিই আমার মকসুদ বা উদ্দেশ্যে।

নিগাহ্ দাশ্‌ত ঃ দিল্ বা অন্তরকে ওয়াসওয়াসা অর্থাৎ কুমন্ত্রণা হতে রক্ষা করা।

ইয়াদ্ দাশ্‌ত ঃ সর্বদা হুব্বে যাতি তথা আল্লাহ্‌প্রেমে মশগুল ও অন্তরে আল্লাহ্‌র হুজুর বা উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকা।

মকতুব ৫ ঃ তিনি আরও লিখেছেন, ইয়াদ্ করদ্ হলো সর্বদা হুজুরী কলবে অর্থাৎ জাগ্রত দিলে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা। বাজে গাশ্‌ত হলো একাগ্রতা বা নির্জনতা অবলম্বন করা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়া। আর নিগাহ্ দাশ্‌ত হলো, যে কোনো মূল্যে নেসবত রক্ষা করা। ইয়াদ্ দাশ্‌ত হলো বাকা বিল্লাহ হওয়া, তথা উন্মাদ বা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা থেকে হালতে সোহুতে আসা বা প্রকৃতিস্থ হওয়া।

মকতুব ৬ ঃ তিনি আরও লিখেছেন, ইয়াদ্ করদ্ হলো স্বীয় হালত বা অবস্থা সংরক্ষণের যথাসাধ্য চেষ্টা করা। ইয়াদ্ দাশ্‌ত- সদাজাগরণ সংরক্ষিত হওয়া, যাকে হুজুরে বেগাইবত্ বলে। চেষ্টা ব্যতীতই এই জাগরণে স্থির থাকা। নিগাহ্ দাশ্‌ত- সতর্কতা হাসিল করা। আর যখন সতর্ক অবস্থা এরূপ হয়ে যায়, তখন সালেক গাইরুল্লাহর আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত হয়ে যায়। এজন্য একে হুজুরে বেগাইবতও বলে। নিগাহ্ দাশ্‌ত এর সম্পর্ক হলো— ইয়াদ্ দাশ্‌তের সংরক্ষণ করা। যথাসম্ভব প্রবৃত্তির তাড়না ও পার্থিব আকর্ষণ থেকে সুরক্ষিত থাকা, যা এই পথে বড় অন্তরায়।

'বাজে গাশ্‌ত' অর্থ চেষ্টা-প্রচেষ্টার দিকে ধাবিত হওয়া যখন ইয়াদ্ দাশ্‌তের নূর কমে যায়, বা নিভে যায় যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেন

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ (যদি ভুলিয়া যাও তবে তোমার প্রভুপালককে স্মরণ করিও। সূরা কাহাফ আয়াত ২৪)।

মকতুব ৭ ঃ তিনি আরও লিখেছেন, ইয়াদ্ করদ্ হলো চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান আর বাজে গাশ্‌ত হলো স্বীয় আদমে আসলীর দিকে ফিরে যাওয়া। নূরে হুজুরী দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার স্মরণে সিফাতে হুজুরী প্রত্যক্ষ করা যায়।

আর নিগাহ্ দাশ্ত অর্থ এই মাকামকে হেফাজত করা এবং এর দ্বারা স্বীয় দিল তাজা রাখা। আর ইয়াদ্ দাশ্ত— সালেকের উচিত এই মাকামে স্থায়ী বা দৃঢ় থাকা এবং এই দোয়া করা যে, হে আল্লাহ্! আমাকে এই দৌলত নসিব করো।

মকতুব ৮. তওবা ঃ গুনাহ্ থেকে ফিরে আসা। প্রতিটি গুনাহ্ এক একটি অন্তরায়। সৃষ্টিকুলের সাথে আন্তরিক সম্পর্কচ্ছিন্নতাই হলো পূর্ণ তওবা। আর এর মাধ্যমে আল্লাহ্র মিলন অবশ্যম্ভাবী হয়।

জোহদ ঃ মানবীয় প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে ফিরে আসা। কেনোনা প্রবৃত্তির প্রবল বাসনা কেবল পার্থিব উপকরণের সাথেই সংশ্লিষ্ট নয়। এজন্য পরিপূর্ণ জোহদ অকৃতকার্য বা বিফলতার মধ্যে নিহিত। কেনোনা পার্থিব এই বিফলতাই প্রকৃত সফলতার মুখ দেখায়। দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারলেই আল্লাহ্র মিলন লাভে ধন্য হবে।

তাওয়াক্কুল ঃ বস্তুবাদ তথা সকল বস্তুর মোহ থেকে বেরিয়ে যাওয়াই তাওয়াক্কুল। এর মধ্যেই পূর্ণ তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্ভরসা নিহিত। বস্তুর অস্তিত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেই আল্লাহ্র প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। এটা শুহুদে হক সুবহানাহু তায়ালার একটি শাখা।

অল্পে তুষ্টি (কানায়াত) ঃ সংযম অবলম্বন করা, তথা বাড়তি বা অতিরিক্ত বস্তু থেকে বেঁচে থাকা। জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের উপর নির্ভর করা। খানাপিনা ও বসবাসের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় থেকে বেঁচে থাকাকে অল্পে তুষ্টি বলে। এর পূর্ণতা এরকম— আল্লাহ্তায়ালার সত্তার প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া ও তাঁর নিরেট নিখাঁদ প্রেমে স্বস্তিলাভ করা।

নির্জনতা (উয্লত) ঃ একাকিত্ব বরণ করা, সংসার ত্যাগ করা ও সৃষ্টজীবের মেলামেশা থেকে দূরে থাকাকে নির্জনতা বলে। এর কামালত হলো সৃষ্টিকুলের দর্শন থেকে দূরে থাকা। দিল্কে সকল বস্তুর চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত রাখাকে কামালে উয্লত বা পূর্ণ নির্জনতা বলে।

জিকির ঃ আল্লাহ্তায়ালার স্মরণ ব্যতীত অন্য সকল কিছুর স্মরণ থেকে অন্তরকে শূন্য রাখা। আল্লাহ্ ব্যতীত সকল কিছু ভুলে যাওয়াকে জিকির বলে। জিকিরের পূর্ণতা হলো নিজের স্মরণও অবশিষ্ট না থাকা। এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং মাজকুর তথা জেকেরকারীর ইয়াদ্ বা স্মরণ করতে থাকেন।

তাওয়াজ্জোহ্ ঃ প্রবৃত্তির সকল বাসনা থেকে বেরিয়ে যাওয়া এবং পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হওয়াকে তাওয়াজ্জোহ্ বলে।

সবর বা ধৈর্য ঃ প্রবৃত্তির আস্বাদ ত্যাগ করা ও প্রিয় বস্তু থেকে দূরে থাকা বা বিরত থাকা।

মোরাকাবা ঃ স্বীয় কাজ, দক্ষতা, গুণাবলী, অবস্থাসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফয়েজে ইলাহি তথা আল্লাহ্র করুণার অপেক্ষায় থাকা। আল্লাহ্র স্মরণ ও আল্লাহ্র প্রেমে ডুবে থাকা।

রেজা (সন্তুষ্টি) ঃ নিজের সন্তুষ্টি থেকে ফিরে এসে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির প্রতি আন্তরিক হওয়া ও চিরন্তন ফয়সালাকে মেনে নেওয়া এবং চিরন্তন সত্তার সামনে মস্তক অবনত রাখা।

সালেকে নাকেস ঃ যে ব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত, দুনিয়ার মোহে ও লালসায় আক্রান্ত, স্বীয় কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখে অথবা নির্ধারিত জীবিকায় সন্তুষ্ট নয় এবং লোকজনের সাথে (সৎ-অসৎ পার্থক্য না করে) মিলেমিশে চলে সে তরিকতের পথে নাকেস বা অপূর্ণ।

প্রকাশ থাকে যে, অনেক দরবেশ স্বীয় প্রবৃত্তি থেকে বিরত নয় ও অল্পে তুষ্ট নয় এবং মানুষের তথা সৃষ্টিকুলের সঙ্গে অযথা মেলামেশা থেকে বিরত থাকে না এবং মোজাহাদা তথা চেষ্টা সাধনাও করে না। এর অভ্যন্তরে কী কারণ ও নিয়ত আছে সেটা তিনিই ভালো জানেন। এরশাদ হয়েছে—

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا

(প্রত্যেকের একটি দিক রয়েছে, যেদিকে সে মুখ করে। সূরা বাকারা আয়াত ১৪৮)।

নক্শবন্দিয়া খান্দানের আকাবেরগণ বলেন, এ রাস্তায় যাদের দরদ বা ভালোবাসা ও উচ্চাশা আছে তাদের উচিত, সে যেনো তাওবাতুন্ নসূহা তথা খাঁটি তওবার পর যথাসাধ্য জোহদ, তাওয়াক্কুল, অল্পেতুষ্টি, নির্জনতা ও ধৈর্যের মাধ্যমে উক্ত পর্যায়গুলো সম্পন্ন করে, আল্লাহ্র জিকিরে নিজেকে সুনিবদ্ধ রাখে। তরিকতের পরিভাষায় একে সফর দর ওয়াতন বলে। আর বেশী বেশী জিকির ও আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ করাকে 'বাজে গাশ্ত' বলে।

আকাবেরে তরিকত কাদ্দাসাল্লাহ আসরারাহুমগণ বলেন, আমাদের তরিকার জিকির জয্বার দিকে টানে। আর জয্বার সাহায্যে সকল মাকাম

সহজ ও দৃঢ়তার সাথে হাসিল হয়ে যায়। হকিকতে তাওয়াজ্জোহ্ ও মোরাকাবা ইয়াদ্ দাশ্ত এর একটি প্রকার। প্রকৃত সালেকের মধ্যে সন্তুষ্টির গুণাবলী, জয্বার নেসবতের শক্তিমত্তা ও পূর্ণতা সহজভাবেই প্রকাশ পায়।

রেসালা ১ ঃ হজরত খাজার একটি রেসালা রয়েছে। এরশাদ হয়েছে—

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ

(তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সাথে আছেন। সূরা হাদীদ আয়াত ৪)। আল্লাহ্তায়ালা আরও ঘোষণা করেন—

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ

(যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহ্র দিক। সূরা বাকারা আয়াত ১১৫)। উক্ত আয়াত দু'টোর ব্যাখ্যায় অতি সংক্ষেপে তিনি সুলুকের জরুরী বিষয়াবলী তুলে ধরেছেন।

রেসালা ২ ঃ মহাপবিত্র ওই সত্তা, যিনি স্বীয় অনুগ্রহে সকল বস্তুকে অবয়ব প্রদান করেছেন। স্বীয় মহত্ত্ব ও গুণাবলীতে এই অবয়বের পর্দা ও উদরের অন্ধকার হতে বের কর স্ব স্ব স্থানে সমাসীন করেছেন। তাঁর নিরঙ্কুশ একত্ববাদে দ্বিত্বতার লেশমাত্র নেই। তিনি চিরন্তন কিন্তু চিরন্তনতার গণ্ডির বাইরে। তারপরও 'আমি' এবং 'তুমি' এর সংযোজন-ব্যবহার কী করে করতে পারি—

বাস বে রঙ্গাস্ত ইয়ারে দিল খা আয়ে দিল্
কানে নাশবী বেরঙ্গ নাগাহ আয়ে দিল্।
আসলে হামা রঙ্গাহা আঁযা বে রঙ্গ আস্ত
মান আহসানু সিবগাতাম মিনাল্লাহ্ আয়ে দিল্।

অর্থঃ সম্পূর্ণ রঙহীন আমার প্রিয় দিল্! কোনো রঙে তুমি সন্তুষ্ট হয়ো না। সকল রঙের মূল ওই রঙহীনতাই। আল্লাহর রঙের চেয়ে উত্তম আর কোনো রঙ আছে কি?

তিনি এমন শক্তিমান যে, 'কুন' এর একটি 'কাফ' দ্বারাই ঘুমে বিভোর লোকদের জাগিয়ে তুলেছেন, আর তারা সানন্দে ছুটে এসেছে। আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় সত্তার আয়না তাদের সামনে রেখেছেন। তারা নিজের প্রতিবিম্বকে স্পষ্টভাবে তাতে দেখতে পাচ্ছে এবং বেকারার হয়ে অস্তিত্বে এসে গেছে। ফলে নির্বিঘ্নে তারা তাঁর সাথে অবস্থান করছে। যেমন আল্লাহ্র

বাণী— 'তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সাথে আছেন'। সূরা হাদীদ আয়াত ৪। এই বাণী কানে পৌঁছেছে। এবার বুঝা গেলো, দু'জন ব্যতীত সঙ্গীত্ব হয় না। আর এখানে হায়রত তথা বিস্ময়ের সম্মুখবর্তী হতে হয়। প্রতিবিম্বিত সৌন্দর্য সত্যের সুসংবাদ বহন করছে এবং সোহবত, সান্নিধ্য বা সঙ্গীত্বের নেয়ামতের ইঙ্গিত বহন করছে। সুতরাং আদম ও ওজুদ (অনস্তিত্ব ও অস্তিত্ব) একত্রে মিলে গেলো এবং নিজেকে হারিয়ে ফেললো বা ভুলে গেলো ও উদ্দেশ্যের সন্ধানের দরজা নিজের জন্য বন্ধ করে ফেললো। বাণী চিরন্তন— 'যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাওনা কেনো সেদিকই আল্লাহ্‌র দিক'। সূরা বাকারা আয়াত ১১৫ — ওই সুসংবাদের দিকে ধাবিত করে।

وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۭ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ

(এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না। সূরা যারিয়াত আয়াত ২১)। এবার ভেবে দেখুন, আমরা নিজেরাই নিজেদের অন্তরায়। এই জন্য আমাদের আমিত্বকে নিজ থেকে দূর করা উচিত। এই হস্ত স্পর্শকালে সংকল্পের অঙ্গুলি লক্ষ্যের আঁচল ধরে ফেললো। শিরা উপশিরায় বসন্ত-সমীরণ ছড়িয়ে গেলো এবং বন্ধুর ঘ্রাণ হৃদয় স্পর্শ করলো। অপর বেচারা অপারগ হয়ে গেলো। সুতরাং প্রেমাস্পদের হৃদয় চাঞ্চল্যময় হলো এবং মাঝ থেকে নেকাবের অন্তরায় উঠে গেলো। আর

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

(আজ কর্তৃত্ব কার? সূরা মু'মিন আয়াত ১৬) — এই ধ্বনি উচ্চকিত হলো। মাঝে কোনো অন্তরায় বা মধ্যস্থতা রইলো না। তাই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আড়াল হয়ে গেলো। আল্লাহ্‌র বাণী—

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ

(সুতরাং তুমি যেভাবে আদিষ্ট হইয়াছ তাহাতে স্থির থাকো। সূরা হূদ আয়াত ১১২) — এই ধ্বনি তার হৃদয় কন্দরে পৌঁছে গেলো। নিদ্রামগ্ন ও ভাবাপ্লুত ব্যক্তি মাথা তুললো। অর্থাৎ

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهٗ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهٗ -

(যে ব্যক্তি নিজেকে চিনলো, সে তার প্রভুপালককে চিনলো)।

তাঁর অনবহিতি মাঝ পথে রয়ে গেলো। আল্লাহ্‌র বাণী—

وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ

(এবং আল্লাহ্‌ উহাদের অলক্ষ্যে উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। সুরা বুরুজ আয়াত ২০)

এই ভাবনা তার প্রাণে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। একদিক থেকে আহ্বান হচ্ছে— স্বীয় প্রবৃত্তি ছেড়ে ফিরে এসো)। অপর দিকে আহ্বান হচ্ছে—

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

(অতঃপর তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। সূরা বাকারা আয়াত ১৪৪)— এই আহ্বান কাজে উৎসাহ সৃষ্টি করলো। এরপর ঘোষিত হলো—

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ

(বরং তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁহাকে ডাকে। সূরা নমল আয়াত ৬২)। এই উৎসাহ-উদ্দীপনা, অনুগ্রহ, সহায়তা পর্দার অন্তরায়কে যা উজুদের জন্য আবশ্যিক ব্যাপার ছিলো, তা চশমা বানিয়ে দিলো। আর তাকে চোখের সামনে রাখলো এবং

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

(তাহাদের মাঝে দুই ধনুকের ব্যবধান রহিল। সূরা নাজম আয়াত ৯) — প্রকাশিত হলো। এই কথার কোনো সীমা বা প্রান্তিকতা হতে পারে না। এই কথার উপসংহার টানা কারো বা কোনো ভাষার আওতাধীন নয়। এজন্য আমি আমার মূল আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি- সল্লাল্লাহু আলা খইরি খলকিহী মোহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন। মহান আল্লাহ্‌তায়ালা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ স., তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবা কেরামের উপর রহমত বর্ষণ করুন। আমিন।

হামদ ও সালাতের পর স্পষ্ট হলো যে, আয়াতে করীমা

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ -

(তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো, তিনি তোমাদের সাথে আছেন। সূরা হাদীদ আয়াত ৪) এবং

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ -

(যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাওনা কেনো, সেদিকই আল্লাহ্‌র দিক। সূরা বাকারা আয়াত ১১৫) আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা কতিপয় পবিত্র আত্মার ইঙ্গিতে লেখা হয়েছে। কিন্তু ওই সকল পবিত্র আত্মার নাম উল্লেখ করতে পুস্তক প্রণেতা লজ্জিত ও অপারগতা প্রকাশ করছেন। কবির ভাষায়—

খুরশীদ নাদীদা চশমে খুফাশ
পেশে আজমান ওয়া তুস্তই সুখুন ফাশ।

অর্থাৎ চামচিকা সূর্যের আলো দেখতে পায় না, অথচ আপনার ও আমার কাছে তা প্রকাশ্য।

অন্য এক কবি বলেন, কিছুই অসাধ্য নয় বুজর্গের তরে।

কবি আরও বলেন,

আগার বাদশাহ্ হরদরে পীরা যান
বয়ায়াদ চো আয়ে খাজা সুবলত মাকান।

অর্থঃ যদি বাদশাহ্ কোনো বৃদ্ধার ঘরে আগমন করে, তাহলে কোনো সরদারের রাগান্বিত হওয়ার কী অধিকার আছে!

মহান আল্লাহ্‌তায়ালার তথা অদৃশ্য সত্তার সঙ্গতা লাভের রহস্য অত্যন্ত খফি ও বাতেন আর তাঁর পরিচিতি লাভের প্রকৃতি বা স্বরূপ স্থায়ী শুদ্ধি ও চিরায়ত অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। আর তাঁর অবতরণ, সংযোজন, সন্ধান লাভ, আকৃতি-প্রকৃতির ভিতরে আদম (নাস্তি) ও অজুদের (অস্তিত্বের) অন্তরায় বিদ্যমান। এজন্য এই মাকাম শুধুমাত্র এলেম বা জ্ঞানের জন্যই খাস বা বিশিষ্ট।

আয তু আয়ে বেরঙ্গই চান্দী সওয়ার
হাম মুশাব্বাহ হাম মুনায্‌যাহ খায়ের ওশার

অর্থঃ হে চিরন্তন সত্তা! আকৃতি-প্রকৃতি, নেকী-বদী, ভালো-মন্দ— সকল কিছু তোমার দিক থেকেই অস্তিত্ব লাভ করে।

এভাবে এই বিষয়টিও এলেম বা অভিজ্ঞানের উপর স্থগিত— ইলমি আকৃতি-প্রকৃতি বাহ্যিক উপস্থিতির সাথে একটি মজহুল বা অজ্ঞাত সম্পর্ক বা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যে কারণে ওই পবিত্র সত্তা এই সকল আকৃতিতে দৃশ্যমান বা প্রকাশ্য। আর এই সকল আকৃতি তাঁর নাম-গুণাবলীর আয়না

হয়েছে। আর ওই নাম গুণাবলী ও সত্তাসহই তিনি তোমাদের সাথে প্রজ্ঞা ও মৌলিকতার সাথে বিদ্যমান। আত্মিক জগৎ বা সাদৃশ্য জগৎ বা ইন্দ্রিয় জগৎ যেটাই হোক না কেনো এলেমের সংযোগ তেমনই, যেমনটি আমলের সংযোগ ভালো মন্দের সাথে চিরন্তন। গবেষকদের মতে ভালো-মন্দের অবস্থান আমলের সাথে একিভূত। যেভাবে আমল এক স্থানে উদ্দেশ্য, অভিলাষ, ঋণাত্মক আর অন্যস্থানে ধনাত্বক। অথচ আল্লাহ্‌র সত্তা এই সকল থেকে পবিত্র। আর আল্লাহ্‌র সত্তা নির্ধারণ, পৃথকীকরণ, ইশারা, রচনা ও প্রবচন থেকে পবিত্র। আবার দ্বিতীয় পর্যায়ে এই সকল বিষয়ের উপযুক্ত। অর্থাৎ কোনো কোনো দিক দিয়ে সত্তাটি সকল গুণের সাথে গুণান্বিত। বাড়ির সঙ্গতা স্থানের সাথে বা মূলের সাথে, যেমন ঘুর্ণীয়মান বিন্দুর সঙ্গতা তার কাল্পনিক গোলাকার রেখার সাথে। অতএব বিন্দুর সাথে রেখার যেরূপ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যদ্দ্বারা রেখাটি অস্তিত্বে এসেছে, আর বিন্দুটি রেখার আকৃতির কারণস্বরূপ গণ্য হয়েছে, তেমনিভাবে মহান আল্লাহ্‌র সত্তা, তাঁর অস্তিত্ব ও শক্তির সাথে জ্ঞানের সীমা-পরিসীমার একটি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা ওই সকল তানায্‌যুলাত বা অবতরণ থেকে পৃথক হওয়া, প্রকাশ হওয়া নাম ও গুণাবলীর স্তর বলে গণ্য হবে। আসমা ও সেফাত তথা নাম ও গুণাবলীর স্তরে অবতরণই আল্লাহ্‌পাকের সত্তার বিকাশের কারণ বা মাধ্যম হবে।

ওই কথার অনুরূপ আরেকটি মেছাল বা উপমা তুলে ধরছি। আলমে মেছালে (উদাহরণিক বা সাদৃশ্য জগতে) এলেমের আকৃতি দুধের আকৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে। এমতাবস্থায় কাশ্‌ফধারী ব্যক্তি যদি তার দিব্যদৃষ্টিকালে দুধের আকৃতির সাথে কোনো বিশেষ সংযোগ সৃষ্টি করে, আর তখন যদি তার দৃষ্টি দুধের বৈশিষ্ট্যাবলী যথা— মিষ্টতা বা স্বাদ, তৈলাক্ততা, পুষ্টিগুণ ইত্যাদির উপর পড়ে তখন দুধকে তার এলমী গুণাবলীর সাথে একই মনে হবে। তার দুধের এই রূপক আকৃতি আত্মার উপমা জগতে প্রকাশ পাবে। আর আত্মা ও এলেম নিজ নিজ গুণাবলীসহ দুধের মধ্যে বিকাশ লাভ করবে, আর ওই সকল গুণাবলী যা আত্মার জগতে প্রকাশ পেয়েছে, তা দুধের এলমি গুণাবলী বিকাশের দর্পন হয়ে যাবে। কেননা এখানে কাল্পনিক দৃষ্টি ও অন্তরের দৃষ্টি এক হয়ে গিয়েছে।

কবি বলেন—

আয সিফাতে মায় ও লাত্বাফাতে আঁ
দর হাম আ-মীখত্ রঙ্গ জাম মুদাম
হামা জামাস্ত নিস্ত গুয়ি মায়ে
ইয়ামদা মাস্ত নিস্ত গুয়ি জাম।

অর্থঃ পানীয়ের রঙ ও স্বাদের অভিন্নতার কারণে পাত্র ও পানীয় একই রঙে রঙিন। পুরোটাই পেয়ালা মনে হচ্ছে বা পুরোটাই পানীয়।

সুবহানাল্লাহ! যে পরিমাণ প্রকাশমান সেই পরিমাণ গোপনীয়তা রয়েছে। এই উদাহরণটি পূর্বের উদাহরণের চেয়ে বেশী স্পষ্ট ও উজ্জ্বল।

যেমন প্রবাদে আছে— যে বুঝার সে বুঝেছে, আর যে স্বাদ নিতে পারেনি সে বুঝেনি।

মূলকথা, আল্লাহ্পাকের অনুপ্রবেশ ও ভিন্নতা যাবতীয় ধারণা ও সাদৃশ্য থেকে পবিত্র এবং স্বীয় মর্তবা অনুযায়ী সর্বত্র বিরাজমান। সাকীয়ে কাওসার আমিরুল মুমিনীন হজরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেন, আল্লাহ্তায়ালা সকল কিছুর সাথে আছেন— না মিশে, না ভিন্ন হয়ে। যদি ভিন্ন হতেন, তাহলে মিশে থাকা আবশ্যক হতো। আর যদি মিশে একাকার হয়ে যেতেন তাহলে ভিন্নতা সাব্যস্ত হতো না। আর যদি খেয়ালী বা কাল্পনিক হতো (যেমন হিব্বানী দার্শনিকের উক্তি) তাহলে সঙ্গতা সাব্যস্ত হতো না, ভিন্নতাও সম্ভব হতো না। প্রবাদ— অনুভূতিপ্রাপ্তির অক্ষমতাই অনুভূতিপ্রাপ্তি ও তথ্য উদঘাটনের অপারগতাই তথ্য উদঘাটন— এটা এই মাকামেরই কথা।

আল্লাহ্অনুসন্ধানীগণ বলেন, যা কিছু দেখা যায় ও জানা যায়— সবই গাইরুল্লাহ্। এজন্যই কলেমার ‘লা’ অর্থাৎ ‘না’ দ্বারা এর অস্বীকৃতি জানাতে হবে। একদা কোনো এক ব্যক্তি আরেফবিল্লাহ মাওলানা রুমী র. কে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কী? বিবেক কী? তিনি বললেন, যাকে কোনোভাবে অনুভূতিতে আনা যায় না, তিনিই আল্লাহ্। আর বিবেক হলো যা (আল্লাহ্) ব্যতীত অন্য কিছুতে শান্তি পায় না। চরম অস্থিরতা, বিরহ যাতনা ও নিরাময়হীন ব্যথা ধারণ করে কালাতিপাত করতে হয়। কবি বলেন—

দূর বিনানে বারে গাহে আলাস্ত
পেশ আঁবি পায় নাবুরদা আন্দ কে হাস্ত।

আল্লাহ্অন্বেষী সাধকগণ শুধু এটুকু বলেন যে,

তিনি মহিয়ান সর্বত্র বিরাজমান
এর চেয়ে বেশী কিছু বলিবার নয়।

বাস্তবে ওই দরবারের প্রাপ্তি হয় না, বরং একটি স্বাদ অর্জন হয় মাত্র। নিশ্চয়ই তিনি সবার সাথে আছেন। সকল বস্তু তাঁর অস্তিত্বেই অস্তিত্ববান হয়। তিনি ব্যতীত সবই বেকার। যেমন আল্লাহর বাণী—

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ -

(যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাওনা কেনো, সেদিকই আল্লাহর দিক। সূরা বাকারা আয়াত ১১৫)। এই আয়াতে করীমার হকিকত যদি তুমি তোমার উপর প্রকাশ হতে দেখতে চাও, তাহলে এই উদাহরণটি মনে করো যে, আয়না একটি বস্তু। আয়নার যতো গুণাবলী বিদ্যমান, যেমন স্বচ্ছতা-অসচ্ছতা, পরিধি ইত্যাদি সবই ওই বস্তুর অন্তর্ভুক্ত বটে। বস্তুত আয়নাটির অতিরিক্ত চমক ব্যতীতই তার দর্শনের কারণ হয়ে থাকে। তাই তার বস্তুসত্তা ও গুণাবলী মূলতঃ একই। মনে করো, আয়নার বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো প্রত্যেকটিরই ধ্যানে বা কল্পনায় একটি সাদৃশ্য আছে। যেমন দুধের জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। এরপর মনে করো, তোমার এই কল্পনা বা ধ্যানের আকৃতি যে বস্তুসত্তায় প্রতিবিম্বিত হলো অর্থাৎ ওই আকৃতি যা বস্তুসত্তার সাথে এক ধরনের অস্পষ্ট অবস্থার সম্পর্ক তৈরী করলো, তা সেই আকৃতির দর্শনের কারণ বলে বিবেচিত বা পরিগণিত হলো। এখন তুমি সেই আকৃতিগুলোর যে কোনোটির দিকেই মনোনিবেশ করবে, সেখানেই দেখবে সে বস্তুসত্তা বিরাজমান। তোমার মনে হবে, বাস্তবেই তুমি সেই সত্তার দিকেই মনোনিবেশ করেছো। বস্তুসত্তা সেই আকৃতিগুলোর সাথেই বিরাজমান। যেখানে সেই আকৃতি আছে, সেখানে তিনিও বিদ্যমান। কিন্তু সেই বস্তুসত্তা আকৃতি থেকে পবিত্র, আর বাহ্যিকভাবে তার বিরাজমানতার লেশমাত্রও সেই আকৃতিতে নেই। এটা দ্বারা এর চেয়ে বেশী আর কিছু প্রতীয়মান হয় না যে, সেই আকৃতির পরিমাণ মতোই সে বস্তুর অবলোকন সাধিত হয়। আর যে দিকে তুমি তাকাও, তা তার গুণাবলীর দিকেই বরং গুণাবলীর অধিকারীর দিকেই তাকানো হচ্ছে। অতএব, তুমি যদি হাজার বছর সাধনা করতে থাকো, হাজার চিল্লায়ও বসো— যতোক্ষণ না আল্লাহ্প্রদত্ত জয্বা বা আকর্ষণ তোমাকে পরিবেষ্টিত না করবে, জাগতিক ও আত্মিক জগতের

আকৃতি তোমার চক্ষু থেকে দূর না হবে, আর মহব্বতে যাতি— যা এক গোপন ভেদ, তোমার কাছে স্পষ্ট না হবে, আর অস্পষ্ট অবস্থার সম্পর্ক যা মহব্বতে যাতিকে শাক্তিশালী করে, যা সূক্ষ্ম অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি বা বর্ণনা করা হয়, তা বান্দার মধ্যে তথা তোমার ভিতরে যতোক্ষণ সৃষ্টি না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহ্সন্ধানীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। আল্লাহ্ দর্শন তো বহু দূরের কথা। অর্থাৎ এসকল গুণাবলী ছাড়া আল্লাহ্র সাক্ষাৎলাভ অসম্ভব?

খেদমত ও জিয়ারত ঃ এরূপ দরবেশের সাহচর্য গ্রহণ করো, যিনি আল্লাহ্র মহব্বতে স্থায়ী হয়েছেন। যাঁর অস্তিত্বে প্রেমাস্পদ, প্রেম ও প্রেমাস্পদের দর্শন ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই এবং যিনি প্রকৃত ফানাফিল্লাহর স্তরে পৌঁছে গিয়েছেন। হাদিসের ভাষ্যমতে তাঁর দীদার, দর্শন বা সান্নিধ্যে আল্লাহ্র স্মরণ হয় ও উপকারিতা লাভ হয়। হাদিসের ভাষ্যমতে— তাঁরা আল্লাহ্র সভাসদ বা পারিষদ। তাঁদের সাহচর্য যেনো আল্লাহ্র সাহচর্যের প্রতিফলন। এমন দরবেশগণকে হাকীম বলা হয়ে থাকে। তাঁরা যা বলেন, তা হেকমতশূন্য নয়। যদিও এর রহস্য তোমাদের কাছে প্রকাশ না পায়। তথাপিও তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী চেষ্টা করো। হতে পারে তাঁর মাধ্যমেই তোমার গ্রহণযোগ্যতা (কবুলিয়াত) প্রকাশ পেতে পারে। তুমি চিরসৌভাগ্যশালী হতে পারো। যদি ওই মহিমান্বিত দয়াল আল্লাহ্র নামই চিরন্তনতার ভূমিকা হয়, আর বাদশাহ্ (শায়েখ) তোমার কাজে সহায়তা করে এবং তোমার অন্তরে আল্লাহ্ অনুসন্ধানের চেতনা-প্রেরণা ঢেলে দেন, তাহলে তুমি অদৃশ্য হেদায়াতের আলোয় উদ্ভাসিত হতে পারবে। সম্ভবত ওই আয়াতের নির্দেশ মোতাবেক

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

(আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি। সূরা নূর আয়াত ৩৫)। এই অদৃশ্য ইশারাই তোমার দিব্যদৃষ্টি খুলে দিবে।

দক্ষতার ঘাটতির প্রতিষেধক ঃ যদি ঘটনাক্রমে তোমার দক্ষতার কমতি থাকে, তাহলে কামেল মোর্শেদের কাছে এর ক্ষতিপূরণের পদ্ধতি জেনে নিবে এবং ওই নূরানী হেদায়েতের আলোকে নিজেকে প্রজ্জ্বলিত করবে। শরীয়তের অনুসরণ, তরিকার আদব প্রতিপালন, হালাল জীবিকা অন্বেষণ, সত্যকথা বলা ও অযোগ্যদের সান্নিধ্য ত্যাগ করে নিজের ভিত্তি মজবুত

করবে। এই অবস্থাকে মজবুত করে আঁকড়ে ধরবে অর্থাৎ অদৃশ্যশক্তি তাজাল্লিয়ে যাতির গুণাবলীর সাথে এমনভাবে গুণান্বিত জানবে যেনো তুমি সূর্যের সাথে মিলিত হয়েছো। আর সূর্যের কিরণে তোমার দিব্যদৃষ্টি কমে গেলো ও নিস্প্রভ হয়ে গেলো। মূলকথা তোমার বাতেন জগতে এই অবস্থার পুনঃপুনঃ প্রকাশ পাওয়াতে এক প্রকারের শক্তি সৃষ্টি হবে। এর দ্বারা বাহ্যিকভাবেও দৃষ্টিশক্তির সৃষ্টি হবে ও অন্তর্দৃষ্টি বহাল থাকবে। ওই সময় বুঝে নিতে হবে যে, দৃষ্টিশক্তির এই প্রাবল্য নূরে খুরশিদ থেকে অর্থাৎ সূর্যের আলো থেকে। আর এটাও জেনে রাখো যে, এই নূর বা আলো কোন্ দিক থেকে আসছে, তোমার সাথে এর সম্বন্ধ নিকটবর্তী না দূরবর্তী। আর যখন এর উপাদানগত আর্দ্রতা শুষ্ক হয়ে যাবে ও শরীর ও মনের নড়াচড়া চঞ্চলতা বন্ধ হয়ে যাবে, তখন ওই শক্তি সৃষ্টি করে মানুষের দেহে দিব্যদৃষ্টির বিস্তার লাভ বা প্রভাব ফেলতে পারবে এবং সূর্যের কিরণ থেকেও নৈকট্য লাভ করতে পারবে। আর ওই নূরের জলসায় নিজেই নিজেকে উন্মাতাল করে ফেলবে। যদি তুমি এই মাকামে থেকে যাও, তাহলে তুমি হবে 'মুহিব' আর যদি তুমি নিজেকে আরেফ বা মুওয়াহ্হিদ বানাতে চাও, তাহলে যখন তুমি ওই নূরের প্রাবল্যে উন্মাতাল হয়ে যাবে তখন একটি আলোকবর্তিকা তোমার দিব্যদৃষ্টি থেকে প্রকাশ পেয়ে তোমার উপর প্রভাব ফেলবে। যখন এই অবস্থা বুঝত পারবে, তখন ওই খুরশিদ তথা সূর্যকে চিনতে পারবে, যা আকাশে উদয় হয় না। তখন তুমি কিনারে বা মাঝে থাকতে পারবে না। অর্থাৎ মিশে যাবে বা বিলীন হয়ে যাবে। যেমন এরশাদ হচ্ছে—

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ

(ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন, আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল। সূরা হাদীদ আয়াত ২১)। আর যদি তুমি সূক্ষ্ম দক্ষতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যথাসময়ে বা ঐশী অন্তরায়ের কারণে প্রথম অদৃশ্য পর্বে তোমার নিকট রাস্তা উজ্জ্বল না হয়, তাহলে আবশ্যক হলো এমন তাওয়াজ্জোহ্ লাভ করা, যা অনায়াসে অদৃশ্য সত্তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং যতদূর সম্ভব ওই তাওয়াওজ্জোহ্কে রক্ষা করবে। দৃঢ় মনোবল, পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা সহকারে রাত দিন ওই তাওয়াজ্জোহ্কে শক্তিশালী করবে ও প্রতিপালন করবে। তরিকার আকাবেরগণ নিজেদের রচনাবলীতে যে সকল কথা লিখে থাকেন, তা যথাযথ অনুসরণ করবে। যদি ওই দরবেশগণের

সাথে তোমার এমন ভালোবাসার সৃষ্টি হয় যে, তাঁর অনুপস্থিতিতেও তাঁর অবয়ব তোমার হৃদয়ে জাগ্রত হয় বা গেঁথে থাকে, তাহলে বুঝবে তরিকার সাথে তোমার নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপন হয়ে গেলো। একেই বলে 'নূরুন আ'লা নূর' (জ্যোতির উপর জ্যোতি। সূরা নূর আয়াত ৩৫) —— এই বিষয়ে রেয়াজত বা অনুশীলন করতে থাকবে। কিন্তু জেনে রাখো, তোমার পক্ষ থেকে যেনো এমন কিছু প্রকাশ না পায়, যা তোমার ও তাঁর হৃদয়ের মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি করে।

সিদ্দিকী তরিকা ঃ তোমার জন্য উচিত, আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত আর কোনো আকাঙ্ক্ষা যেনো অন্তরে না থাকে। তুমি যেনো মকসুদে ইন্তেহা তথা চূড়ান্ত মকসুদে পৌঁছতে পারো। মূলকথা, এই তরিকার সুলুকের উৎস হলো উভয় দিকের সংযোগ। হৃদয় প্রকৃতির অবয়বকে গ্রহণ করে। যেমন আয়না কিরণময় সূর্যের বিপরীতে রাখলে তাপ আকর্ষণ করে এবং চিত্রের রেখা ভস্ম করে দেয়। আর বরযখিয়্যাতের পথে তোমার দৃষ্টি তাকে ঊর্ধ্ব জগতে আঁকড়ে ধরে। প্রেমাগ্নি ঝাপটা মারতে থাকে। শস্যাগার বা গোলা জ্বলতে থাকে। এখন তোমার এবং ওই দরবেশগণের উদাহরণ সূর্য কিরণ ও আয়নার সংবাদতুল্য হয়ে গেলো। প্রকৃতপক্ষে এই তরিকা সিদ্দিকে আকবর রা. এর তরিকা। কেনোনা তাঁর 'নেসবতে হুব্বী'র পূর্ণতা রসূলে মকবুল স. এর পরম্পরায় প্রমাণিত। তিনি এই পথেই উৎকর্ষ লাভ করেছেন। গবেষকদের নিকট এটা স্বীকৃত। এছাড়াও 'রাশহাত' প্রণেতা হজরত খাজা নাসীরুদ্দিন উবায়দুল্লাহ আহরার র.ও এই বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলতেন, খাজেগানের তরিকা যা হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. এর সাথে সম্বন্ধিত, তা এই নেসবতে হুব্বীর আলোকেই। তাঁদের তরিকা এই নেসবতে হুব্বিরই সংরক্ষক।

তাজাল্লিয়ে যাতি ঃ যাতের বহিঃপ্রকাশের সাথে সম্বন্ধযুক্ত, যা তাজাল্লি ধারকের মাবদায়ে তায়াইয়্যুন এর ইসিমের অনুরূপ। মোশাহাদা ও জামালের দর্শন ফানাফিল্লাহর মাকামেই হয়ে থাকে। কেউ কেউ এর অন্য অর্থ প্রকাশ করেছেন, আর তা হচ্ছে ওই ইবারত বা সম্বন্ধের বর্ণনা, যা রূহের আকর্ষণ হতে জামালে হাকিকীর দিকে ধাবিত (যা যাত এর স্বরূপ থেকে অন্যতম একটি স্বরূপ) এমন একটি অবস্থার সঙ্গে যে, রূহের আকর্ষণের স্বরূপের উপলব্ধিও অবশিষ্ট থাকবে না। যেমন একটি নির্দিষ্ট চেহারার দিকে তাওয়াজ্জোহ্ (মনোনিবেশ) হয়ে থাকে। আর মোশাহাদা ও

জামাল উল্লেখিত ইসিমের অন্তরালে যখন তরিকতপন্থী সালেকের তরবিয়ত বা রূহানী প্রতিপালনের লক্ষ্য ওই ইসিমের উপরই চূড়ান্ত সমাপ্তি হয়ে থাকে এবং ওই জামালকে মুতলক (সাধারণ) বা মূখ্য উদ্দেশ্য বলা হয় মাবদায়ে তায়াইয়্যুন থেকে মুক্ত বা পবিত্র হওয়ার কারণে। আর ওই তায়াইয়্যুন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মা'কুলাতে ছানুবিয়্যাহ (দ্বিতীয় আকল বা জ্ঞান) এর দ্বারা অন্য কোনো কঠিন হুকুম বা নির্দেশ নয়, বা এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য কোনো বিষয়ও নয়। কবি বলেন—

ফয়েজ নাগা বরসাদ আম্মা বর দিলে আগা বরসাদ।

অর্থাৎ একমাত্র সজাগ হৃদয়েই ফয়েজ (করুণা) বর্ষণ হতে থাকে।

দাওয়ামে মোরাকাবা ঃ দাওয়ামে মোরাকাবা একটি বিরাট সম্পদ, যা অন্তরের মকবুলিয়াতের কারণ। আর অন্তরের (কলবের) মকবুলিয়াত হলো আল্লাহ্‌রই মকবুলিয়াত। যখন ব্যাপারটি এমন, তখন নিজে নিজেকে তথা কলবের মকসুদের প্রতি মনোনিবেশ করা ফরজ। এই তরিকায় জিকির আজকারের এমন বিচ্ছিন্নতা নেই যে, তুমি এই কাজ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পর অন্য কাজের প্রতি মনোযোগী হবে। এই তরিকার কাজ হলো হুঁশ দরদম অর্থাৎ প্রতিটি পদক্ষেপে সজাগ থাকা। হজরত আল্লামা মাওলানা আবদুর রহমান জামী কুদ্দিসা সিররুহুর বাণী প্রথমে প্রদীপ জ্বালাও, এরপর অধ্যয়ন পর্ব । কবি বলেন—

দিল আরামে কে দারী দিল দরোবন্দ
দেগারে চশমে আজ হামা আলম ফেরোবন্দ।

অর্থঃ স্বীয় বন্ধুর সাথেই দিল্ নিবদ্ধ রাখো। সকল মানুষ থেকে চোখ বন্ধ করে ফেলো।

কাশফে কুবুর ঃ তিনি বলেন, কাশফে কুবুরের কোনো গুরুত্ব নেই। কেনোনা এতে ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে। হুজুর মাআ'আল্লাহ্ তথা সর্বদা আল্লাহ্‌র স্মরণ হৃদয়ে জাগ্রত রাখার চেষ্টা করবে। যদিও আয়নায়ে আলম (জগৎরশ্মী) অস্বচ্ছ হয়ে গেছে এবং নূরানিয়াতের ভাবও দৃষ্টির অন্তরালে পড়ে গেছে, তথাপি চেষ্টা-সাধনা অনুসন্ধানে লেগে থাকো। কেনোনা খাজেগানের জয্‌বা ও হুজুর ভিন্ন এক জিনিস। এই মাকামে গাইরুল্লাহর নাম-নিশানাও বাকী থাকবে না। কখনো সম্পূর্ণভাবে আবার অনেক সময় ছয় দিক থেকে একটি তাওয়াজ্জোহ্ হয়ে থাকে এবং এই মাকামের

সতর্কতার অবস্থানস্থল এই কারণে উপরের দিকে হয়ে থাকে। সম্মানিত আরশের পৃথিবী দর্শন কল্পনাজগতের ঊর্ধ্বের দিকে স্থাপিত হয়ে থাকে। কখনো এই তাওয়াজ্জোহ্ সকল দিককে ঘিরে নেয়। যেমন আল্লাহ্র বাণী

وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ

(এবং আল্লাহ্ উহাদের অলক্ষ্যে উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। সূরা বুরুজ আয়াত ২০ — তখন এই অর্থ প্রকাশ পায়। যদি আত্মিক অবয়ব ও আকৃতি বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে শুধু মরীচিকা কল্পনার মতো মূল্যহীন হয়ে পড়ে তখন কল্পনাবয়ব হয়ে থাকে—

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

(তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত। সূরা হাদীদ আয়াত ৩)। আর যদি এই তাওয়াজ্জোহের প্রাবল্যকালে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবয়ব ও আকৃতি সম্পূর্ণ মিটে যায় এবং পূর্ণাঙ্গ স্বচ্ছতা প্রকাশ পায়, যেমন বলা হয় 'গৃহে তিনি ব্যতীত কোনো আগন্তুক নেই'— এর উদ্দেশ্য হাল প্রকাশ পাবে, তবে স্বজ্ঞান থাকতে হবে। কেনোনা অর্থগত পোশাকের সম্পর্ক মাঝামাঝিতে। আর কমের পক্ষে গুণগত জীবনের অস্তিত্ব অবশ্যই ধরে রাখতে হবে।

এখন আর একটি তত্ত্ব জেনে রাখো যে, 'এবং আল্লাহ্ উহাদের অলক্ষ্যে উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন'। তিনি তাদেরকে সকল দিক থেকে ঘিরে ফেলেছেন এই ভাব প্রকাশকালে সম্ভবত কোনো আবরণ অন্তরায় হয়ে যাবে বা সম্পূর্ণরূপে তার প্রেমদৃষ্টি খুলে যাবে, কিন্তু হকিকতে মকসুদের স্বরূপ এবং এর সংযোগ লাভ হতে পারে না বা হবে না। এখানে ইশক ও মহব্বত যে পর্যন্ত গাইরুল্লাহর ধ্যানমুক্ত না হবে, সে পর্যন্ত (হুজুরে যাতি এবং ওয়াহ্দাতে সেরফা) চিরসত্যের উপস্থিতি ও দ্ব্যর্থহীন এককত্বের মধ্যে বিলীন হওয়া প্রকাশ পায় না । এই ধারার আকাবেরগণ এই অবস্থাকে 'ফানা' বলেন না। আমরা বলেছিলাম যে, মাঝখানে আরেকটি স্তর বাকি আছে। আর সেটা এই স্তরই।

বেলায়েত ঃ বেলায়েত ওই নৈকট্যকে বলে, যা আল্লাহ্ ও বান্দার মাঝে স্থাপিত হয়। অথবা মানুষের ওই পূর্ণতাকে বলে, যা মানব সমাজে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হয়। পৃথিবীবাসী এর দ্বারাই আকৃষ্ট হয়। এই পূর্ণতার সম্পর্ক গোপনীয়তার সাথে। তাসাররুফ ও কারামত এই প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত।

উপস্থিতদের একজন প্রশ্ন করলেন, বরকতে ইলাহী, যা দক্ষ ব্যক্তিগণ লাভ করে থাকেন, তারা কোন্ প্রকারের বলে গণ্য হবেন? হজরত বললেন, তারা বেলায়েতে মালফাতাহ এর প্রভাবসম্পন্ন। শ্রোতাদের উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি আরও বলেন, যখন মুরিদের আয়না পীরের আয়নার মুখোমুখি হয়, তখন মুরিদের আয়নায় প্রতিবিম্বিত রশ্মি পড়ে। এরপর হজরত আরও বলেন, কেউ কেউ বেলায়েতের এই দুই প্রকারের যে কোনো একটি লাভ করেন। আবার কেউ কেউ এই দুই প্রকারের প্রত্যেকটিতেই পূর্ণতা লাভ করেন। আবার কারো কারো একটিতে বেশী অন্যটিতে কম পূর্ণতা লাভ হয়।

নক্শবন্দিয়া তরিকার মাশায়েখগণ সব সময় এই দুটোতেই পূর্ণাঙ্গতার স্তরে অবস্থান করেন। তিনি বলেন, অনুসরণীয় ব্যক্তি পরলোকগমনকালে দ্বিতীয় পর্যায়ের বেলায়েতকে তাঁর কোনো নিষ্ঠাবান মুরিদকে প্রদান করেন, আর প্রথম পর্যায়ের বেলায়েত নিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। তিনি আরও বলেন, কোনো স্খলনের কারণে দ্বিতীয় বেলায়েতকে (যাকে প্রদান করা হয়েছিলো তার নিকট থেকে) যদি ছিনিয়ে নেওয়া হয়। 'নাফাহাত' গ্রন্থে ইবনে ফারেস পীর বাকাল এর নামাজে জানাযায় ইমামতির ঘটনায় বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্‌র ওলীগণ কবীরা গুনাহ থেকে নিরাপদ নন

কখনো তাঁদের দ্বারা গুনাহ্ কবিরা সংঘটিত হয়ে গেলে এই কথা বলা ঠিক হবে না যে, তিনি বেলায়েত থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছেন। এমন কথা বলা অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নয়। বরং দেখা উচিত যে, তিনি বেশীর ভাগ সময় কোন্ অবস্থানে আছেন। যদি কখনো তাঁর দ্বারা মানবীয় কারণে বে-শরীয়ত কোনো কাজ সংঘটিত হয় বা স্খলন ঘটে, তবে তাঁকে মাজুর বা অপারগ মনে করা উচিত।

বাণী ঃ হতে পারে কেউ আল্লাহ্‌র নৈকট্যশীল বা পূর্ণতার স্তরে অবস্থানকারী। কিন্তু পৃথিবীর জীবনকালে ক্লান্তি, অবসাদ, জীবনের স্বল্পতার কারণে খুব মর্যাদাশীল হতে পারেননি। যেমন কেউ সাধনার স্তরগুলো অতিক্রম করেছেন ও বুজর্গী লাভ করেছেন, কিন্তু পৃথিবীতে খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি, তিনি আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদাশীল। যেমন এরশাদ হয়েছে—

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ

(তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি। সূরা হুজুরাত আয়াত ১৩)।

জয্‌বা (প্রেমাকর্ষণ) ও মহব্বত ঃ জয্‌বা এবং মহব্বতের তরিকা হলো আল্লাহ্‌র পথ। এর লক্ষ্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো দিকে নয়। এ ছাড়া আর যতো পথ আছে, তাদের অনেকেরই লক্ষ্য নূরের দিকে। তাই নূর পর্যন্ত গিয়েই থেমে যায়। আর এগুতে পারে না। আর জয্‌বা ও মহব্বত সকল মানুষের মধে বিদ্যমান। কিন্তু তা থাকে অপ্রকাশ্য, সুপ্ত অবস্থায়। নক্‌শবন্দিয়া তরিকার মাশায়েখগণ ওই জয্‌বা বা আকর্ষণ দ্বারাই মুরিদগণের তরবিয়ত করে থাকেন।

দৃষ্টির বিকাশ ঃ দৃষ্টির বিকাশ মৃত্যুর পরই লাভ হয়ে থাকে। কেনোনা রুইয়াতে ইনকিশাফে তাম- দৃষ্টিশক্তির পূর্ণ বিকাশকে বলে। যতোক্ষণ পর্যন্ত আত্মা এই শরীরের সাথে সংযুক্ত আছে, ততোক্ষণ দৃষ্টিশক্তির পূর্ণ বিকাশ হতে পারে না। ব্যক্তি যতোই অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করুক না কেনো, অন্তর এবং হায়াতের অন্তরায় তো থেকেই যাচ্ছে। যে পর্যন্ত আসল ধারা পয়দা না হবে, সে পর্যন্ত তায়াল্লুকে খুদী (সত্তাগত সম্পর্ক) বাকী থাকবেই।

আনন্দ-বিনোদন ঃ কেউ নিয়ত সহীহ্ করে আকিদা ঠিক করে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দাখেল হলে এবং শরিয়তের নিয়মাবলী যথাযথভাবে পালন করলে, তার এই দরবেশী আচরণে পার্থিব জগতে আনন্দ-বিনোদন না পেলেও মৃত্যুর পর অবশ্যই সে উত্তম বিনিময় প্রাপ্ত হবে। বরং তাকে পৃথিবী থেকে বিদায়কালেই এই দানে ভূষিত করা হবে। শরিয়তের বিধি-বিধান প্রতিপালন ও নিরেট আল্লাহ্‌প্রেম বিরাট সম্পদ। কোনো আনন্দ-বিনোদন এই নেয়ামতের চেয়ে বড় হতে পারে না।

ই দাশ্‌তা বাশ গো দিগার হিচ মুবাশ।

অর্থঃ মানুষ যদি কিছুই অর্জন না করে, তবুও যেনো এটি অর্থাৎ আল্লাহ্‌প্রেম ও শরীয়তপালন অর্জন করে।

আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সান্নিধ্য ঃ আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে নৈকট্য ও মিলনের সম্পর্কের প্রভাব এর চেয়ে বেশী নয় যে, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সে স্থায়ী প্রশান্তি লাভ করে, যা তাকে ফানার (ফানাফিল্লাহ্‌র) দিকে টানতে

থাকে। যখন এই নেসবত হাসিল হয়ে যায় তখন সালেক এর বদৌলতে বেলায়েতের মর্যাদা হাসিল করে ফেলে। আর এই পূর্ণাঙ্গতা যা (তাসাউফের ভাষায়) মাকামাতে তাজাল্লিয়ে আসমা ও সিফাত এর মাধ্যমে অর্জিত হয়, অন্যভাবেও সালেকগণ এটা লাভ করে থাকেন। আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সান্নিধ্যের নেসবত অর্জন বেলায়েতের (বেলায়েতে খাস্‌সা) বিশেষ স্তরে পৌঁছে দেয়। এই ধারার সালেকগণ প্রথম ধাপেই ফানার স্তরে উন্নীত হয়ে যায় এবং মাকামে 'ইনদিরাজ নেহায়াত দর বেদায়েত' (প্রারম্ভেই শেষ স্তরে) পৌঁছে যায়। আমাদের মাশায়েখগণ যা পূর্বেই ইঙ্গিত করেছেন, তা অর্জন করে।

মানুষকে দীক্ষা দানের কারণ ঃ বুজর্গানে কেরাম মানুষকে দীক্ষা দান তথা সুপথের দিশা দানের প্রবণতা তিন কারণের যে কোনো একটি হতে পারে। ১. আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এলহাম বা প্রেরণা। ২. পীরের নির্দেশ। ৩. মানুষের প্রতি দরদ বা ভালোবাসা। অর্থাৎ তিনি যখন মানুষকে পথহারা দেখতে পান, বা বিভ্রান্তি ও পাপাচারকে মানুষের আযাব-গজবের কারণ মনে করেন, তখন অতিশয় মেহেরবান হয়ে আযাব-গজব থেকে তাদের মুক্তি কামনা করেন। আর ভালোবাসার দাবি এটাই যে, শরীয়তের ওয়াজ-নসীহত প্রদানকে নিজের দায়িত্ব মনে করেন। আর মানুষকে ওয়াজ-নসীহত প্রদানের মাধ্যমে শিষ্টাচার শিক্ষা ও শরীয়ত প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা প্রদান করেন। যেমন এলমে ফেকাহ ও হাদিস পড়ানো এবং তদনুযায়ী আমল করানো। কিন্তু তাদেরকে ফানা-বাকার স্তরে পৌঁছে দেওয়া মেহেরবানী বা ভালোবাসার শর্ত নয়। এটা দয়া মেহেরবানীর ঊর্ধ্বে। এই তরিকার তালিম-তরবিয়তের উদ্দেশ্য হলো ইমানী আকর্ষণ বা চেষ্টা সাধনা— যার দাওয়াত সকল নবী-রসূল আলাইহিমুস সালাম দিয়ে গেছেন।

মুকাশাফা ও খাতা ঃ আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও ভুল। প্রকৃত সত্য এই যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এলমুল এলহামে অন্য কোনো চিন্তা-খেয়াল প্রবেশ করার কারণে বিভ্রান্তি বা বিভ্রাট দেখা দেয়। কিন্তু নিশ্চিত জ্ঞানে যা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়, তাতে বিভ্রান্তির দখল নেই। এতে যে ভুল হয়, তার কারণ হলো কোনো বিষয়ের প্রকৃতি সম্পর্কে কতিপয় উপকরণকে মিলিয়ে নেয়, যা তার মতের সাথে নিশ্চিতভাবে স্বীকৃত ও নির্ধারিত। এমন মিলানোর কারণেই এ বিষয়ে ভ্রান্তির জন্ম নেয়। নতুবা এলমে এলহামীর সাথে ভ্রান্তির কী সম্পর্ক? তাই তর্কশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ, যারা এলমে মানতেক

বা যুক্তি-তর্কের নিয়ম কানুন মেনে চলেন, তাদের চিন্তাধারায়ও কতিপয় পূর্বনির্ধারিত সূত্রের অনুপ্রবেশের কারণে যা একজন তর্কবিদ খেয়াল করে থাকেন, তাতে ভ্রান্তি দেখা দেয়। অন্যথায় তর্কশাস্ত্র এরূপ বিদ্যাকে বলে, যার অনুসরণ মেধাকে ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে। যদি তারা তর্কশাস্ত্রের বাইরের সূত্রগুলোকে পরিত্যাগ করতেন, তাহলে তাদেরকে ভ্রান্তিতে পড়তে হতো না।

কাশফের প্রয়োজনীয়তা ও এর প্রকারভেদ ঃ এই ক্ষেত্রে হজরত কুদ্দিসা সিররুহু বলেন, যাঁরা আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করেন, ওই সকল ওলীর জন্য কাশফের প্রয়োজন নেই। কেনোনা কাশফ বা দিব্যদৃষ্টি দুই প্রকার— ১. পার্থিব কাশ্‌ফ। এই ধরনের কাশ্‌ফ কোনো কাজে লাগে না। ২. পারলৌকিক কাশ্‌ফ- এই বিষয়গুলি কোরআন ও হাদিসে সবিস্তারে উল্লেখ রয়েছে, যা আমল করার জন্য যথেষ্ট। কোনো কাশ্‌ফ এর সমকক্ষ নয়।

তাওহিদ ঃ তাওহিদ অবশ্যই হাসিল করতে হবে। কালাম শাস্ত্রবিদদের নিকট তাওহিদ হলো সৃষ্টিজগতে আল্লাহ্ ব্যতীত ক্রিয়াশীল কেউ নেই। অর্থাৎ নিজের সামর্থ্যকে আল্লাহ্‌র প্রতি ন্যস্ত করা, নিজেকে সামর্থ্যহীন মনে করা। যদিও পরবর্তী কালামশাস্ত্রবিদগণ ক্রিয়াশীল ক্ষমতা-দক্ষতা-সামর্থ্যকে ক্ষেত্র বিশেষে বান্দার জন্যও সাব্যস্ত করেন— তাঁদের তাওহিদ বা দলিল হলো 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই', তথাপি বিশুদ্ধ মাজহাব হলো— সৃষ্টিজগতে আল্লাহ্ ছাড়া ক্রিয়াশীল আর কেউ নেই। সুফীগণ তাই ক্রিয়া ও সামর্থ্যকেও আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত করেন। তেমনিভাবে অবশিষ্ট গুণসপ্তক যথা জ্ঞান, শ্রবণ, দর্শন, জীবন, ইচ্ছা বা সংকল্প ও কালামকেও আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করেন।

ইমান ঃ অধিকাংশ গবেষকের মত হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালা ও তাঁর রসূল স. এর প্রতি চিন্তা-ভাবনা ও যাচাই করে ইমান আনয়ন করে তার ইমান প্রত্যাখ্যাত হয় না। আর যে ব্যক্তি ইমান আনয়নের পর মরদুদ হয়ে যায়, তার কারণ হলো— তার ইমান যাচাই বা গবেষণাসম্পন্ন ছিলো না, বরং সে দেখাদেখি ইমান এনেছিলো। আর এই প্রেক্ষিতেই শাফেয়ীগণ বলেন, 'ইনশাআল্লাহ্ আমি মু'মিন'। অন্যান্য উলামাগণও এই উদ্দেশ্যেই এরূপ বলে থাকেন।

মোরাকাবা ঃ মোরাকাবা অর্থ ইনতেজার বা অপেক্ষা। আর এখানে অপেক্ষা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌র অনুসন্ধানের অপেক্ষা। এরূপ অনুসন্ধান যে, নিজের শক্তি সামর্থ্য থেকে বেরিয়ে এসে আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের প্রত্যাশী হওয়া ও তাঁর ইচ্ছার মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া। শক্তিমত্ততা হলো চেষ্টা সাধনা করা, আর ধ্যানালয়ে অপেক্ষা হলো, আল্লাহ্‌র অনুসন্ধান করা। এরূপ মোরাকাবা চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থানকারী ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আর কেউ অর্জন করতে পারে না। এজন্য আবুল খাব্বাব নাজমুদ্দিন কোবরা কুদ্দিসা সিররুহু মোরাকাবার ১০টি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে মৃত্যুকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এখানে মোরাকাবাকে নবম নীতি সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর মতে প্রাথমিক পর্যায়ের আশেক শেষ পর্যায়ে অবস্থানকারীর অনুসরণ করবে এবং নিজের শক্তি-সামর্থ্য থেকে নিজেকে বের করে মোরাকাবায় রত থাকবে। আর ওই সকল মোরাকাবা কম মর্যাদা রাখে, যাতে উদ্দিষ্ট বিষয়ের সাথে উপমা এবং কল্পনার অবয়ব যুক্ত করে পেশ করা হয়। কবি বলেন—

হর চে পেশে তু পেশ আঁজা রাহ নিস্ত
আফিয়াতে ফাহম তুস্ত আল্লাহ্ নিস্ত।

অর্থ ঃ তুমি যা কিছু দেখেছো তার আগে আর কোনো রাস্তা নেই। সেটা তোমার কল্পনা বা বুঝ— তিনি আল্লাহ্ নন।

বাণী ঃ আল্লাহ্‌তায়ালার সত্তার আইনুল ইয়াকীন এর অর্থ হলো— আল্লাহ্‌তায়ালার এলমে হুজুরী (আল্লাহ্‌র সত্তার উপস্থিতির জ্ঞান) তাঁর নাম ও গুণাবলীর মধ্যে নিহিত। আর হক্কুল ইয়াকীন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা জেনে নেওয়া যে, আইনুল ইয়াকীনের জ্ঞানই ইলমে হুজুরী তথা আল্লাহ্‌র সত্তার উপস্থিতির জ্ঞান, যা জ্ঞাত হলো, তা-ই হক্কুল ইয়াকীনরূপে পরিচিত। তাজাল্লীয়ে সূরী মাকামে কামালে তাওহিদে পৌঁছার পূর্বে যা প্রাপ্তি হয়, তা আইনুল ইয়াকীন নয়। কেনোনা যা অনুভূতিতে আসে, তা আকৃতিসম্ভূত। আর এটাও জেনে রাখা দরকার যে, অনুভূত আকৃতিটি আল্লাহ্‌র জ্ঞান। অনুরূপভাবে তাজাল্লিয়ে মা'নবী তাওহিদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেনোনা এতে অনুভূত জ্ঞাত বিষয়টি আল্লাহ্‌রই জ্ঞাত বিষয়। কিন্তু মাকামে কামাল তথা তাওহিদের পূর্ণতার স্তরে পৌঁছার পর উভয় প্রকারের তাজাল্লি— তাজাল্লিয়ে আইনুল ইয়াকীন ও হক্কুল ইয়াকীন প্রবিষ্ট হয় বা একিভূত হয়, আর এই মাকামেই যাতি তাজাল্লি অনুপ্রবেশ করে, অন্য কোনো তাজাল্লি নয়।

কেনোনা তখন হকিকতে শুধু একক (আল্লাহ্) ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অর্থাৎ সে তখন পূর্ণ একত্ববাদ অর্জনকারী। আল্লাহ্প্রেমিকদের জন্য এখানে কিছু আসরার (ভেদ বা রহস্য) এর আলোকপাত করা হলো অর্থাৎ তাজাল্লিয়ে যাতি ও তাজাল্লিয়ে মা'নবীর বর্ণনা করা হলো। মনে রেখো, তাজাল্লিয়ে মা'নবী নামসমূহ ও গুণাবলির মধ্যেই নিহিত। মোট কথা যা কিছু জ্ঞাত হওয়া যায়, বা যা অনুভূতিতে আসে, সেই তাজাল্লি আল্লাহ্র সাথেই সম্পৃক্ত। সুতরাং এই ভেদ বা রহস্যগুলো ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

তাওয়াক্কুল ঃ তাওয়াক্কুল এর অর্থ এই নয় যে, উপায় উপার্জন ছেড়ে বসে থাকতে হবে। এমন করা অশিষ্টতা। তাওয়াক্কুলের অর্থ শরীয়তসম্মত উপার্জন। যেমন পুস্তক অনুলিখন, হস্তশিল্প ইত্যাদি পেশা গ্রহণ করা— কিন্তু এর সবব বা কারণের দিকে দৃষ্টিপাত না করা। কেনোনা সবব বা কারণ বা উপায় দরজার মতো, যাকে আল্লাহ্তায়ালা সবব বা কারণের মালিক পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম বানিয়েছেন। এমতাবস্থায় কেউ যদি এই আশায় দরজা বন্ধ করে দেয় যে, উপর থেকে তার রিজিক আসবে— এমন আচরণ আল্লাহ্র সাথে বেয়াদবী। কেনোনা এই দরজা তাঁরই সৃষ্টি। আর এটাই দলিল যে, তিনি ইচ্ছা করলে তা খোলা রাখবেন, অথবা বন্ধ করবেন। তিনি ইচ্ছে করলে এই দরোজা দিয়ে রিজিক প্রেরণ করবেন অথবা অদৃশ্য থেকে প্রদান করবেন। এটা তাঁরই অভিপ্রায়।

নক্শবন্দিয়া তরিকার শ্রেষ্ঠত্ব ঃ মাশায়েখগণের তরিকার মধ্যে তরিকায়ে আলিয়া আহরারিয়া নক্শবন্দিয়া সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। তাঁদের প্রথম সবক বসীতে ইদ্রাক থেকে, যা বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহ্র প্রতি গালবা বা প্রাবল্য এবং তাজাল্লিয়ে আনওয়ারে যাত এবং বিশেষ মাকাম বা স্তরের প্রকাশস্থল। এর প্রাথমিক অবস্থা, যা যৌগিক প্রবলতা ও সৌভাগ্যের প্রভাতের সূচনা মাত্র। একে তরিকতের পরিভাষায় হুজুর (সদাউপস্থিতি) বলে। আর যখন এই প্রবলতা ও আকর্ষণ দৃষ্টিজ্ঞানের মধ্য থেকে সালেক নিজেকে উঠিয়ে নেয় বরং তার হুজুরীগুণের চেতনাও অবশিষ্ট না থাকে তখন ওই অবস্থাকে ফানা ও ফানাউল ফানা বলে। এই নেসবতের পরম্পরাকে উজুদে আদম বলে। আর এই নেসবতের পরম্পরার প্রকাশকে এক বড় মর্তবার জিনিস বলে ধারণা করা হয়। কবি বলেন—

ওয়াসলে ইদাম গর তাওয়ানি কারদ্
কারে মরদানে মরদে তানী কারদ্

অর্থঃ যদি তোমার ওয়াস্‌লে ইদামের মর্তবা লাভ হয় তবে তুমি মর্দে মুজাহিদ। এটা বড় মহত্ত্বের কথা বটে।

এই কারণেই এই অবস্থা প্রকাশ পেলে বলা যায় যে, উজুদে আদম উজুদে ফানা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আর এই ফানা দ্বারা মানবীয় বৈশিষ্ট্যাবলীর নিঃশেষতা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় রহমতে এরূপ নূর দান করেন, যার স্বচ্ছতায় ওই নূর দেখা যেতে পারে। কেনোনা আল্লাহ্‌তায়ালার 'হুজুর' (সদাউপস্থিতি) এর এক প্রতিবিম্ব হলো আল্লাহ্‌র সত্তার গুণাবলী। ফলে ওই সময় সালেক ফানায়ে হাকিকীর মর্যাদায় ভূষিত হয়। তখন তার কোনো নাম-নিশানা অবশিষ্ট থাকে না। সেই সময় তার প্রতি যা কিছু আরোপিত হবে, তার সবই মূলের প্রতি ধাবিত হবে। এই মাকামই মাকামে বাকাবিল্লাহ। আর এই উজুদকে উজুদে ফানা বলে অভিহিত করা হয়।

আকাবেরে তরিকা কুদ্দিসা সিররুহুগণ বলেন, উজুদে ফানাকে উজুদে বাশারিয়াতে (মানবীয় অস্তিত্বে) ফিরিয়ে আনা যায় না। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র চিরন্তন রীতি এই যে, ফানা ফিল্লাহর স্তরের সালেকগণকে তাদের নিজ গুণাবলীর প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। এই মনজিলে অপূর্ণকে পূর্ণতার স্তরে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই কাশ্‌ফকে কাশ্‌ফে গালবা বলা হয়। আর একেই 'তাজাল্লিয়ে জাতি' 'শুহুদে যাতি' ও 'ইয়াদ দাশ্‌ত' নামে অভিহিত করা হয়। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে—

اَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ

(তুমি এভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, যেনো তুমি তাঁকে দেখছো) মেশকাত, কিতাবুল ইমান ২ — এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এই মাকামে এসে প্রকাশ পায় এবং পরকালীন দীদারকেও এই মনজিলেই সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইহসান ও দীদারের মধ্যে পার্থক্য হলো এমন— যেমন একজন সুন্দর মানুষকে প্রভাতের আলোতে দেখা। তরিকার আকাবেরগণ বলেন, 'ইনকেশাফাতে যাতি' (দিব্যজ্ঞান) বাসীরাত (দূরদৃষ্টি) এর গুণ বিশেষ। দৃষ্টি শক্তির নয়। কিন্তু যখন আল্লাহ্‌তায়ালা বলে দিলেন চর্মচক্ষুরও এতে

দখল রয়েছে, তখন আমরা তা বিশ্বাস করি ও এর উপর ইমান আনয়ন করি। যদি আল্লাহ্তায়ালা বলতেন, আমার দীদারে তোমাদের কপালের চোখের দখল রয়েছে, তবে আমরা এর উপরই ইমান আনতাম। যেমন বলা হয়েছে 'যখন আমি কোনো কিছু দেখি, তখন আল্লাহ্তায়ালাকে তার সাথে তার আগে তার পিছে দেখতে পাই'। এই দলের উচ্চ মার্গ থেকে ফিরে আসার আগে বা তার সত্যায়নের আগে কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। আর এই শুহুদ বা দর্শনকে শুহুদে মুআয়ানা বলা যায় না। যেমন কেউ কেউ বলেছেন, এই সকল লোকের বেশির ভাগ চেষ্টা-সাধনা কাশ্ফের প্রাবল্যের কারণে হয়ে থাকে। এই নেসবতের প্রাবল্যে অধিক গুণসম্পন্ন নেসবতও তার দৃষ্টি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তার কর্মযোগ ও গুণযোগ দ্বারা সে আল্লাহ্র সত্তা ব্যতীত আর কিছুই দেখে না। তার অস্তিত্বের প্রাঙ্গণে আল্লাহ্র প্রেম ছাড়া অন্য কিছু অবশিষ্ট থাকে না। এটাই নবী ও ওলীগণের শেষ স্ত র। কথায় আছে, নিশ্চয়ই এটা আপনার প্রভুপালকের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত স্ত র। প্রবাদ বাক্য— উব্বাদান পল্লীর পর আর কোনো পল্লী নেই।

বাণী ঃ তাসাউফের পরিভাষায় সম্পর্কছিন্নের অর্থ এই যে, অন্তর দুনিয়া ও আখেরাতের সকল নেয়ামতকে বিদায় জানাবে। সকল পরিচয় ও পার্থিব জগত থেকে অমুখাপেক্ষী হবে। আকর্ষণ ও চিন্তা-চেতনা এক আল্লাহ্র প্রতি স্থায়ী হবে।

বাণী ঃ কলবের স্পন্দন যখন নাড়ির স্পন্দনের ছন্দ গ্রহণ করবে, তখন কলবের স্পন্দন অন্তরের কর্ণ দ্বারা 'আল্লাহ্' শব্দ শোনা যাবে। এ দ্বারা উদ্দেশ্য গোশতের টুকরার জিকির। আর একেই জিকরে কলবি বলা হয়। এই জিকির (ফেরেশতাদের) গণনার ঊর্ধ্বে। আর জিকরে কলবি দ্বারা উদ্দেশ্য সর্বদা আল্লাহ্র স্মরণ বা সদা উপস্থিতি। যখন এই হাল বা অবস্থা অর্জন হবে, তখন কলব গাইরুল্লাহর সংক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবে। এমতাবস্থায় জিকির ছেড়ে দিয়ে ওই হাল বা অবস্থাকে হেফাজত করবে। যখন এতে ঘাটতির সৃষ্টি হবে, তখন জিকির করতে হবে যাতে আধ্যাত্মিক উন্নতির সেই হাল বা অবস্থা বহাল থাকে। এরপর ওই রত্নের (মহাদৌলতের) সাথে জিকিরকে সমন্বয় করে আল্লাহ্র করুণার অপেক্ষায় থাকবে। এরপর বলার বা জিজ্ঞাসার আর কিছু নেই।

বাণী ঃ যে পর্যন্ত হুজুরে যাতি (সত্তার মধ্যে সদাউপস্থিতি) ও নিরেট একত্ববাদে ডুবে যাওয়া বা বিলিন হওয়ার অবস্থা প্রকাশ না পায়, ততোক্ষণ পর্যন্ত এই তরিকার আকাবেরগণ একে ফানা বলেন না।

হজরত খাজা বাকি বিল্লাহ্ র. এর কারামতসমূহ

কারামত ১ ঃ কথিত আছে জনৈক খোরাসানী যুবক বেশ কিছু দিন থেকে হজরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার আউশী কুদ্দিসা সিররুহুর মাজার শরীফে অবস্থান করছিলো। সে রূহানীভাবে হজরতের কাছে এইমর্মে আবেদন করলো যে, আমাকে কামেলে মোকাম্মেল মোর্শেদের ঠিকানা বলে দিন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে কামালিয়ত হাসিল করবো। এক রাতে হজরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার আউশি র. তাকে স্বপ্নযোগে বললেন, সিলসিলায়ে নক্শবন্দিয়ার এক বুজর্গ দিল্লি শহরে আগমন করেছেন। তুমি তাঁর দরবারে যাও। তিনি জাগ্রত হয়ে অনতিবিলম্বে হজরতের খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর নিকট রাতের ঘটনা খুলে বললেন। হজরত খাজা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, এই অধম নিজেকে এমন এরশাদের উপযুক্ত মনে করে না। ওই বুজর্গ অন্য কেউ হতে পারেন। ওই লোক স্বস্থানে ফিরে গেলেন। দ্বিতীয় রাতে হজরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার আউশি র. পুনরায় স্বপ্নের মাধ্যমে বললেন, আমি যে বুজর্গের কথা বলেছিলাম তিনি ওই ব্যক্তি, যার দরবারে তুমি গিয়েছিলে। তিনি কেমন বিনয়ী তুমি বুঝতে পেরেছো। এরপর দ্বিতীয় দিন ওই ব্যক্তি পুনরায় তাঁর দরবারে এসে গত রাতের ঘটনা খুলে বললেন। আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। বললেন, আমি আপনার দরবার থেকে কিছুতেই যাবো না, আপনি আমাকে কবুল করুন বা না করুন। কবি বলেন—

তু খাহী আঁস্তী আফশাঁ ও খাহী দামনে আন্দর কাশী
মগছ হর গেজ না খাহাদ রফত আজ দাকান হালওয়াই

অর্থঃ আপনার ইচ্ছে হলে আস্তিনে আটকান বা গুছিয়ে ফেলুন। মাছি কিছুতেই মিষ্টির দোকান ছেড়ে যাবে না।

হজরত খাজা কুদ্দিসা সিররুহু তার এরূপ অবস্থা দেখে তার প্রতি অনুগ্রহপ্রবণ হলেন এবং তাকে কবুলের শুভসংবাদ জানিয়ে দিলেন। কিছু দিন হজরত খাজার খেদমতে থেকে ওই যুবক কামালতের দরজায় পৌঁছে গেলেন।

কারামত ২ ঃ হজরত খাজা বাকি বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহুর কারামত-সমূহের মধ্যে এক বড় কারামত হলো— তিনি তিন চার বছরের বেশী হেদায়াত ও এরশাদের কাজ করেননি। কিন্তু এই অল্প সময়ে তিনি আল্লাহ্‌র

বান্দাদের মধ্যে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করেন যে, তৎকালীন বেশীরভাগ মাশায়েখ তাঁর খেদমতে হাজির হন এবং তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর আলোকবর্তিকা ও বরকত গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। আশেকে এলাহীগণ তাঁর দরবারে ছুটে আসে। অল্প সময়ের মধ্যেই হিন্দুস্তান হয়ে যায় (সুফীগণের দেশ) সমরকন্দ। আর তরিকায়ে আলিয়া নক্‌শবন্দিয়া আহরারিয়া যা হিন্দুস্তানের প্রবাদ পাখি আনকার ভূমিকা রাখে তা পরিপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। কবি বলেন—

চে বাদায়েস্ত কে আজ নিশানা আশ জাঁহা মাস্‌ত আস্‌ত,
যামানা মাস্ত ও জমিন মাস্ত ও আসমান মাস্ত আস্ত।

অর্থ ঃ এটা অবিকল শরাবের মতো— যাতে (যার প্রেমে) একই সাথে জমিন, জামানা ও আসমান নেশাগ্রস্ত হয়।

টীকা ঃ *যুবদাতুল মাকামাত ২৮ পৃষ্ঠা। অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, দুই তিন বছরের বেশী নয়। আরেক বর্ণনায় রয়েছে তাঁর এই কাজ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর আগমন পর্যন্ত জারী ছিলো।*

হজরত খাজা বাকি বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহু'র দিল্লী আগমনের শুরুতে সেখানকার কতিপয় মাশায়েখ হজরতের আত্মপ্রকাশে ঈর্ষান্বিত হন। বিভিন্ন মন্তব্য ও তাওয়াজ্জোহ প্রদান করেন। এতে তারা মোটেও উপকৃত হতে পারেননি বরং এতে করে তাদের ক্ষতিই হয়েছে। পরিশেষে বাধ্য হয়ে তাঁরা হজরতের দরবারে আসেন ও পরিশুদ্ধ জীবন অর্জনে সমর্থ হন।

কারামত ৩ ঃ হজরত খাজা বোরহানুদ্দিন হিন্দী কুদ্দিসা সিররুহু স্বীয় আকাবেরগণ থেকে নেসবত ও এজাজত হাসিল করেছিলেন। তিনি হজরত খাজার দরবারে উপস্থিত হলেন ও দীক্ষা গ্রহণের আবেদন করলেন। হজরত খাজা তাঁকে রাবেতার নির্দেশ দিলেন। তিনি বিস্মিত হলেন এই ভেবে যে, এই নির্দেশ তো সুলুকের পথে প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত। যদি হজরত তাঁকে উচ্চপর্যায়ের মোরাকাবার নির্দেশ দিতেন, তাহলে ভালো হতো। কিন্তু হজরত খাজার প্রতি যেহেতু পূর্ণ বিশ্বাস রাখতেন, তাই তিনি রাবেতায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন। দু'দিন যেতে না যেতেই হজরত খাজার সূরত-সেকেল তথা চেহারা মোবারক তাঁর নজরে স্থির হলো। তিনি তাকে সংরক্ষণ করলেন। হজরতের নির্দেশ তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠলো এবং তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করলো নেসবতে আজীম। উন্মাদনা ও নিয়ন্ত্রণহীনতা তীব্রতর হতে লাগলো। দীর্ঘ রাত্রি জাগরণ ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা

সত্ত্বেও তাঁর অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলো। তিনি জমি থেকে দু'গজ উপরে চলতে লাগলেন। নিজেকে দেয়ালে দেয়ালে, গাছে গাছে সজোরে আঘাত করতে লাগলেন। শক্তিশালী সুঠামদেহী যুবকেরাও তাঁকে ধরে রাখতে ও আটকাতে পারলো না।

কারামত ৪ ঃ বর্ণিত আছে, একবার কোনো এক মসজিদের খতিব সাহেব মিম্বরে বসা অবস্থায় ছিলেন। হজরত খাজা মিম্বারের সামনে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ হজরত খাজার চেহারার প্রতি খতিব সাহেবের দৃষ্টি পতিত হলো। তৎক্ষণাৎ তাঁর শরীরে কম্পন সৃষ্টি হলো। তাঁর উপর হজরত খাজার এমন প্রভাব পড়লো যে, তিনি কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেললেন। মোহগ্রস্ত হয়ে মিম্বার থেকে জমিনে লুটিয়ে পড়লেন।

কারামত ৫ ঃ একদা রমজান মাসে সেহেরীর সময় হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি কুদ্দিসা সিররহুহুল আজিজ খাদেমের হাতে হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর খেদমতে ফালুদা পাঠিয়ে দিলেন। খাদেম সোজা তাঁর গৃহে চলে গেলেন ও দরজার কড়া নাড়লেন। হজরত খাজা ওই সময় কাউকে না জাগিয়ে নিজেই দরজায় এলেন। খাদেমের হাত থেকে ফালুদার কৌটা গ্রহণ করলেন। বললেন, তোমার নাম কী? তিনি বললেন, বামা। হজরত খাজা বললেন, যেহেতু তুমি হজরত শায়েখ আহমদের খাদেম, এজন্য তুমি আমাদেরই সাথী। একথা বলে হজরত খাজা র. অন্দরে চলে গেলেন। খাদেম ফিরে এলেন। খাদেম হজরত খাজার থেকে আলাদা হওয়ার পর তাঁর তাসাররুফ (প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব) প্রতিফলিত হলো। খাদেমের উপর একটি নেসবত প্রবল হলো। তিনি কান্নাকাটি, উহ্, আহ্, চিল্লাচিল্লি করে আছড়ে পড়তে পড়তে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর নিকট পৌঁছলেন। হজরত বললেন, তোমার কী হয়েছে? তিনি ওই ভাবান্তর অবস্থায় বলতে লাগলেন, আমি সবখানে, সব কিছুতেই রঙহীন এক নূর দেখতে পাচ্ছি। ওই নূরের বিবরণদান অসম্ভব। হজরত মোজাদ্দেদ র. বললেন, নিশ্চয়ই হজরত খাজার সাথে তোমার চোখাচোখি হয়েছে। দীপ্তিমান সূর্যের মুখোমুখি হওয়ার কারণে তোমার উপর একটি ঝলক আপতিত হয়েছে। দ্বিতীয় দিন খাদেম গত রাতের ঘটনা হজরত মোজাদ্দেদ র. এর নিকট খুলে বললেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর ওই ভাবমত্ততা দূর করে দিলেন।

কারামত ৬ ঃ জনৈক সেনা কর্মকর্তা হজরত খাজা বাকি বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহু'র সাথে সাক্ষাতের জন্য এলেন। তার কর্মচারী ঘোড়া নিয়ে দরজায়

দণ্ডায়মান ছিলো। এমন সময় হজরত খাজা বাকী র. ইস্তেঞ্জার জন্য বাইরে এলেন। কর্মচারীটির উপর মহান বুজর্গের দৃষ্টি পতিত হলো। ফলে তার উপরে এমন জয্‌বা ও উন্মাদনা উপস্থিত হলো যে, সে অস্বাভাবিকভাবে চিৎকার ও রোদন শুরু করে দিলো। জবাইকৃত মুরগির মতো মাটিতে গড়াগড়ি করতে থাকলো। এমতাবস্থায় আসরের পর থেকে রাতের একটি অংশ অতিবাহিত হলো। তার অস্থিরতা ক্রমাগত বেড়ে চললো। সে বাজারের দিকে ছুটে চললো। শেষে দৌড়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেলো। এরপর আর কখনো সে ফিরে আসেনি।

কারামত ৭ ঃ মীর মোহাম্মদ নোমান সাল্লামাল্লাহুর রহমান এই অধম লেখকের কাছে বলেছেন, তার কন্যার একজন ধাত্রী ছিলো। তিনি তাকে অনেক বার হেদায়াতের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন হজরতের মুরিদ হতে। কিন্তু সে বারবারই অস্বীকার করতো। একবার কোনো এক অনুষ্ঠানে সে আমার শিশুকন্যাকে হজরত খাজা র. এর খেদমতে নিয়ে গেলো। হজরত খাজা তাকে কোলে বসিয়ে অনেক আদর করলেন। সে হজরতের দাড়ি মোবারকে হাত রাখলো। হজরতের একটি দাড়ি তার হাতে চলে এলো।

হজরত খাজা বললেন, মীর মোহাম্মদ নোমানের মেয়ে আমার স্মৃতি রেখে দিলো। এটা ছিলো এলমে ফেরাসাত বা দূরদৃষ্টির কথা। কেনোনা অল্প কয়েক দিনের মধ্যে হজরত খাজা পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। আর হজরত খাজার ওই দাড়ি মোবারক আজও আমাদের ঘরে তাঁর স্মৃতি হিশাবে শোভা পাচ্ছে।

টীকা ঃ *মীর মোহাম্মদ নোমানের ওই কন্যা, যিনি হজরত খাজা বাকী র. এর একটি দাড়ি ছিঁড়ে নিয়েছিলেন, পরবর্তীতে তিনি হাশেম কাশমী র. এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। যুবদাতুল মাকামাত পৃষ্ঠা ১৮।*

কবি বলেন—

মরা আজ যুলফে তু মুয়ে বসন দাস্ত
ফুজুলী মায় কুনম বুয়ে বসন দাস্ত।

অর্থঃ আপনার কুন্তলগুচ্ছের একটি কেশই আমার জন্য যথেষ্ট— এটাই অনেক বেশী বরং তার ঘ্রাণই যথেষ্ট।

ওই ধাত্রী ফিরে এলো। একটু পরেই তার মধ্যে উন্মাদনা ও মত্ততা দেখা দিলো। অস্থিরতা প্রবল হতে লাগলো। সে হাত পা আছড়াতে লাগলো। পরিশেষে উন্মত্ততা তীব্রতর হলো। শেষে সে জোরে চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে গেলো। যখন তার স্বাভাবিকতা ফিরে এলো, তখন আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কী হয়েছিলো? এই অবস্থায় সে বললো, হজরত খাজা আমার সামনে ভয়ঙ্কররূপে প্রকাশ পাচ্ছিলেন। তাই আমি ভয়ে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম। এছাড়া আর কিছু বলতে পারছি না। আর এটাও জানি যে, আমার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র জিকির হচ্ছিলো।

হজরত মীর মোহাম্মদ নোমান র. বলেন, আমি তার এই অবস্থা খাজা র. এর কাছে পেশ করলে তিনি মৃদু হাসলেন। তাকে ডেকে পাঠালেন এবং জিকির শিক্ষা দিলেন।

কারামত ৮ ঃ এই ফকীরের নিকট হজরত মীর মোহাম্মদ নোমান র. আরও বর্ণনা করেন, কয়েক দিন ধরে শরীয়তবিরোধী কিছু আপত্তিকর ও নেশাকর ঘটনায় জড়িয়ে পড়লাম। চেষ্টা করেও তা দূর করতে পারলাম না। চেষ্টায় কেনো সফলতা এলো না। বাধ্য হয়ে তা হজরত খাজার নিকট ব্যক্ত করার ইচ্ছা করলাম। যখন মসজিদে প্রবেশ করলাম, তখন জামাত দাঁড়িয়ে গিয়েছে, এখনো তাহরিমা হয়নি। আমি কাতারের এক পাশে দাঁড়ালাম। আর হজরত খাজা ছিলেন অপর প্রান্তে। আমি ইচ্ছা করলাম যাতে কেবলায়ে হাকিকী তথা হজরত খাজাকে দেখে নিয়ে তাহরিমা বাঁধতে পারি। আমার দৃষ্টি তাঁর উপর পতিত হলো। তিনিও আমাকে দেখলেন। হজরত খাজার দৃষ্টির ফলে আমার ওই অবস্থা দূরীভূত হলো, যা আমি দূর করার জন্য চেষ্টা ও ইচ্ছা পোষণ করছিলাম।

কারামত ৯ ঃ হজরত মীর মোহাম্মদ নোমান র. আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, হজরত র. এর মুমূর্ষু অবস্থার একরাতে তাঁর সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্ব এসেছিলো আমার উপর। ওই রাতেই তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি ও তাওয়াজ্জোহ্ প্রদান করলেন। এর প্রভাবে আমার মনে এই অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, আমি যে কাজই করতাম ওই কাজের ব্যাপারে একটি স্বচ্ছ ধারণার সৃষ্টি হতো। বুঝতে পারতাম, কাজটি আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দনীয়, নাকি অপছন্দনীয়? তাই চলাফেরা, অবস্থান ও প্রতিটি পদক্ষেপে আমার এই ধারণা স্বচ্ছ ও সুদৃঢ় হলো। এর রহস্য হলো, হজরত খাজা মুমূর্ষু অবস্থায় আমাকে

বলেছিলেন, ইন্তেকালের সময় তিনি তাঁর সন্তুষ্টিসমুদ্রের একটি তরঙ্গ ও সৈকতহীন সমুদ্রের একটি বিন্দু এই পিপাসিত হৃদয়কে প্রদান করেছিলেন।

কারামত ১০ ঃ একদা হাল ও কাশফের অধিকারী এক দরবেশ হজরত খাজা র. এর নিকট আরজ করলেন, আমি আমার অভ্যন্তরকে অন্ধকার অবস্থায় ও নিজেকে বন্দীদশায় দেখতে পাচ্ছি। জানি না কোন্ অপরাধের কারণে এমন হলো। হজরত খাজা র. এই বিষয়ে মনোনিবেশ করলেন। এরপর এরশাদ করলেন, তোমার লোকমাতে অর্থাৎ খাবারে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়নি। তিনি বললেন, খাবার তো তাই খাচ্ছি, যা সব সময় খাই। হজরত বললেন, ভালোভাবে অনুসন্ধান করো। এছাড়া আমি কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না। নিশ্চয়ই এর কোনো অংশে ত্রুটি আছে। ভালোভাবে অনুসন্ধান করা হলো। জানা গেলো, খানা পাকাতে যে লাকড়ি জ্বালানো হচ্ছে, তাতে অসাবধানতা আছে।

কারামত ১১ ঃ একদিন এক দরবেশ হজরত খাজার জামাতে নামাজ আদায়ের সময় উপস্থিত হলেন। তখন ছিলো শীতকাল। তাঁর কাছে কম্বল ছিলো না। তিনি মনে মনে খেয়াল করলেন, যদি হজরত খাজা লেপের ব্যবস্থা করতেন, তাহলে ভালো হতো। হজরত খাজা র. সালাম ফিরানোর পর বললেন, ওই দরবেশকে কম্বল এনে দাও। ওই দরবেশ বলেন, আমি সেদিন থেকে এই ভেবে খুবই আতংকে থাকতাম যে, হজরত খাজা অস্বস্তি বোধ করেন এমন কোনো বিষয় আমার মনে উদয় হলো কি না? প্রকৃতপক্ষে রসূল স. এর তরিকাও ছিলো এমনই। মজলিশে কারো মনে কোনো কিছু উদয় হলে তাঁর মনেও তা উদ্ভাসিত হতো। তাঁর সূক্ষ্ম বাতেন জগত ছিলো আয়নার মতো স্বচ্ছ। হজরত খাজা র. এর দুই পাশে তাঁর মুখলিস শিষ্যগণ অবস্থান করতেন। কোনো অপরিচিত লোক এলে তার উদাসীনতা ও অসংলগ্ন মনোবাঞ্ছা হজরতের আত্মিক আয়নায় ফুটে উঠতো।

কারামত ১২ ঃ হজরত খাজার দরবারের একজন রহস্যবিদ বর্ণনা করেন, একবার হজরত খাজা হিন্দুস্তান থেকে মাওয়ারাউন্নাহার যাওয়ার পূর্বে লাহোরে জামাতে নামাজ আদায় করার জন্য এক মসজিদে প্রবেশ করেন। আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। ফরজ নামাজ পাঠকালে হজরতের বক্ষ থেকে এক ভয়ংকর আওয়াজ বেরিয়ে এলো। ওই কাতারের সকল মুসল্লি আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়লো। হজরত খাজা র. ফরজ নামাজ শেষ

হওয়ার সাথে সাথেই মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলেন, যাতে এই রহস্য রহস্যই থাকে। এরপর তিনি আর ওই মসজিদে যাননি। বরং দু'তিনজন একান্ত সাথীদের নিয়ে তাঁর অবস্থানস্থলেই নামাজ আদায় করতেন। তিনি আরও বর্ণনা করেন, ওই অবস্থান স্থলে যে দু'তিনজনকে নিয়ে নামাজ আদায় করেছেন আমি তাদের একজন। একবার নামাজরত অবস্থায় আমি দেখতে পেলাম, হজরত খাজার মুখ যেভাবে কাবার দিকে ছিলো ঠিক সেভাবে আমাদের দিকে ফেরালেন। আমার কম্পন সৃষ্টি হলো। কাঁপতে কাঁপতে আমি নামাজ শেষ করলাম। আমি যা দেখেছি তা হজরত খাজা র.কে বললে তিনি বললেন, এই রহস্য আর কারো কাছে প্রকাশ কোরো না।

বাণী ঃ দিব্যদৃষ্টিসম্পন্নগণের কলব বা অন্তর দিবালোকের মতো স্বচ্ছ। হজরত খাজা বাকী র. এর তরফ থেকে এই দু'টি বিস্ময়কর কারামত প্রকাশ পাওয়া রসূল স. এর নবুওয়াতের প্রমাণচিহ্ন, যা সুন্নতের অনুসরণেই তাঁর লাভ হয়েছে। কেনোনা রসূল স. থেকে বর্ণিত হয়েছে, (কখনো কখনো) নামাজ পাঠকালে রসূল স. এর বক্ষ থেকে উত্থিত আওয়াজ এক মাইল দূর থেকেও শোনা যেতো।

তিনি আরও বর্ণনা করেন, রসূল স. সামনে যেরূপ দেখতে পেতেন, পিছনেও অনুরূপ দেখতেন। হজরত খাজা বাকী র. যিনি ওই জামানার কুতুব ছিলেন, আর কুতুব সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা রসূল স. এর পদানুসরণ করেন। রসূল স. এর সাথে ফরজ নামাজ আদায়ের সময় মুমিনগণের মেরাজের যোগ্যতা হাসিল হতো। আর এটাও স্বীকৃত যে, পূর্ণ অনুসারী অনুসৃতের অনুরূপ কামালতের অংশ পেয়ে থাকেন।

কারামত ১৩ ঃ একদিন হজরত খাজা র. আয়না হাতে নিয়ে তাঁর স্ত্রীকে বললেন, এসো আমি আর তুমি একই সাথে আয়না দেখি। ওই মহীয়সী বর্ণনা করেন, আমি আয়নায় একজন পাকা দাড়িওয়ালা মুরব্বি দেখে ভীত হলাম ও কাঁপতে শুরু করলাম। তাঁকে বললাম, আমাকে এমন কিছু দেখাবেন না। এ সকল দেখার শক্তি আমার নেই। তিনি মৃদু হেসে নিজেকে স্বরূপে অর্থাৎ কৃষ্ণকেশে দেখালেন।

কারামত ১৪. তাসাররুফ বা হস্তক্ষেপ ঃ জনৈক বয়োবৃদ্ধ বুজর্গ বলেন, একদা আমি নামাজের জামাতে হাজির হলাম। ওই জামাতে হজরত খাজাও

ছিলেন। প্রথম কাতারে জায়গা খালি ছিলো না কিন্তু দরবেশগণ আদবের কারণে হজরত খাজা র. এর পাশে সামান্য জায়গা খালি রেখেছিলেন। হজরত খাজার প্রতি আমার পূর্ণ ইতেকাদ ছিলো না। তাঁর সাথে আমার আত্মিক সম্পর্ক ছিলো না। আর বাল্য বয়সে তাঁকে দেখেছিলাম, এজন্য তাঁকে চিনতাম। তাই আদবের দিকে খেয়াল না করে তাঁর পাশের খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলাম। একটু পরেই হজরত খাজার প্রভাব আমার উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। আমি তা প্রতিহত করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ফলে আমি নামাজের মধ্যেই একটু একটু করে পিছু হটতে বাধ্য হলাম। যদি আর এক কদম পিছু হটতাম তা হলে বারান্দার নিচে আছড়ে পড়তাম। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর আমি মুখলেসীনদের দলে শামিল হলাম।

কারামত ১৫. তাসাররুফ ঃ এক মহিলা হজরত খাজা র. এর আম্মাজানের খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, আমি বন্ধ্যা। এজন্য আমার স্বামী অন্যত্র বিবাহ করতে চায়। এরপর তার অনেক দুঃখ-কষ্ট ও অস্থিরতার কথা প্রকাশ করলেন। হজরতের আম্মাজান হজরত খাজার কাছে তাঁর কষ্ট ও ইচ্ছার কথা বললেন। হজরত খাজা তখন মাজুনে ফালাসাফা খাচ্ছিলেন। কিছু অংশ তিনি ছুরি দিয়ে কেটে খেয়ে ফেলেছিলেন, আর কিছু অবশিষ্ট ছিলো। তিনি বললেন, এটা খেয়ে নাও। আজ রাতে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়ো। আল্লাহ্ চাহেতো গর্ভবতী হয়ে যাবে। সে পূর্ণ বিশ্বাসে খেয়ে নিলো এবং রাতে স্বামী সহবাস করলো। হজরত খাজা র. এর দোয়ায় ও বরকতে ওই বন্ধ্যা মহিলা সেই রাতেই গর্ভবতী হলো। তার স্বামী অন্যত্র বিবাহের ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন।

কারামত ১৬ ঃ একদিন হজরত খাজা র. এর ঘোড়াচালকের ছেলে হজরত খাজার খেদমতে হাজির হয়ে বললো, আমার বাবার পেটে অনেক ব্যথা। তিনি মারা যাওয়ার উপক্রম। তিনি বললেন, সে ঘোড়ার হক কেড়ে নিয়েছে। তা ফেরত দিলে সে সুস্থ হয়ে যাবে। ছেলেটি তার বাবার কাছে গিয়ে হজরত খাজা র. এর কথা ব্যক্ত করলো। সে বললো, তিনি ঠিকই বলেছেন। আমি আজ ঘোড়ার খাদ্য থেকে খিছু খাদ্য ও তেল নিয়েছিলাম। সে তা ফিরিয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়ে গেলো।

কারামত ১৭ ঃ সিলসিলায়ে চিশতিয়ার একজন পীরজাদা হজরত খাজা র. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নক্শবন্দিয়া তরিকা গ্রহণ করেন। তিনি হজরত খাজার দরবারেই দিনাতিপাত করছিলেন। হঠাৎ একদিন তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন ও মৃত্যুর নিকটবর্তী অবস্থায় পৌঁছে যান। লোকেরা তার বেঁচে থাকার আশা ত্যাগ করলো। প্রত্যেক্ষদর্শীরা তার চরম অবনতির কথা হজরত খাজা র. এর নিকট ব্যক্ত করলেন। হজরত খাজা বললেন, তার মনে এই খেয়াল জাগ্রত হয়েছে যে, এই তরিকা ছেড়ে দিয়ে বংশীয় বুজর্গদের সিলসিলা অবলম্বন করবে। তার এই খেয়াল আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছে। আমার আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠেছে। এই কারণেই এ রোগের সৃষ্টি হয়েছে। তাকে বলো যাতে সে এই খেয়াল ত্যাগ করে তওবা করে। লোকেরা তাঁর কাছে এই ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, হজরত খাজা ঠিকই বলেছেন। তিনি অনুতপ্ত হয়ে তওবা করলেন। তারপর সুস্থ হয়ে গেলেন।

কারামত ১৮ ঃ একদিন হজরত খাজা র. এর এক মুরিদ তাঁর খেদমতে এসে বললেন, আমার স্ত্রী অসুস্থ। তার নড়াচাড়া করার শক্তি নেই। হজরত খাজা র. বললেন, তুমি বাড়ি গিয়ে একটি চাদর দিয়ে তোমার স্ত্রীকে ঢেকে দাও। সে বাড়িতে এসে একটি চাদর দিয়ে তার স্ত্রীকে ঢেকে দিলো। এরপর হজরত খাজা র. তাঁর বাড়িতে এলেন, রোগীর শয্যাপাশে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। রোগমুক্তির জন্য তাওয়াজ্জোহ্ প্রদান করলেন। এরপর বললেন, সে সুস্থ হয়ে গেছে। তিনি বাইরে চলে এলেন, মুরিদও হজরত খাজা র. কে বিদায় জানানোর জন্য বাইরে এলেন। হজরত খাজা বিদায় গ্রহণ করলেন। মুরিদ ঘরে ফিরে এসে দেখলেন, তার স্ত্রী সুস্থ হয়ে বসে আছে। তার মাঝে অসুস্থতার কোনো চিহ্নই নেই।

কারামত ১৯ ঃ একবার হজরত খাজা র. এর এক প্রতিবেশীর উপর তহ্শীলদার জুলুম করলো, এমন কি তাকে বাড়িছাড়া করতে চাইলো। এই ঘটনা হজরতের কানে পৌঁছলে তিনি রাগান্বিত হলেন। তহ্শীলদারকে বললেন, এই গ্রামে অনেক দরিদ্রলোক বসবাস করে। তাদেরকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা উচিত। সে এই জুলুম থেকে বিরত হলো না। হজরত খাজা র. বললেন, আমাদের খাজাগণ অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। শুধু তোমার জীবনই নয়, আরও অনেক জীবন বিপন্ন হয়ে যাবে। তিন দিন অতিবাহিত

হতে না হতেই ওই জালেম ডাকাতির মামলায় গ্রেফতার হলো এবং আত্মীয়স্বজনসহ নিহত হলো।

কারামত ২০ ঃ যখন হজরত খাজা হুসামুদ্দিন দুনিয়া ত্যাগ করে হজরত খাজা বাকী র. এর দরবারে তরিকত সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন, তখন তাঁর আত্মীয় আবুল ফজল তাঁর কাজে বাধা দিতে লাগলো। তাঁকে দরিদ্রতা থেকে ধনাঢ্যতার দিকে উৎসাহিত করতে লাগলো। তিনি হজরত খাজা র. এর নিকট তার উৎপাত ও প্রলোভনের কথা জানালেন এবং তার মনোকষ্টের কথা ব্যক্ত করলেন। হজরত খাজা বললেন, ধৈর্য ধরো। এই জালেমের সকল কিছু কয়েক দিনের মধ্যেই উলট-পালট হয়ে যাবে। যেমন কথা তেমন কাজ। সত্যি সত্যিই সে অল্প কিছুদিনের মধ্যে লাঞ্ছনার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করলো।

পঙ্‌ক্তি ঃ তেগ আ'জাজ রসূলাল্লাহ সের বাগে বারীদ

অর্থঃ রসূলে খোদা স. এর অলৌকিক তরবারি বিশ্বাসঘাতকের মাথা কেটে নিয়েছে।

কারামত ২১ ঃ দিল্লীর একজন আলেম শায়েখ হামেদ র. পঞ্চাশ বছর বয়সে এক কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলেন। পূর্ণ এক বছর তিনি স্ত্রী গমনে সক্ষম হলেন না। নিজের মানসম্মান রক্ষার্থে তিনি দিল্লী ত্যাগ করার ইচ্ছা করলেন। তাঁর এই ইচ্ছার কথা হজরত খাজার কান পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি ব্যথিত হলেন। একবার হজরত খাজা র. বাহনে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ওই বুজর্গ আলেমকে তিনি রাস্তায় পায়চারী করতে দেখলেন। যেহেতু তিনি আলেম ছিলেন, তাই হজরত খাজা র. তাঁর সম্মানার্থে ঘোড়া থেকে নামলেন। তিনিও যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করলেন ও হজরত খাজার পায়ে পড়ে গেলেন। হজরত খাজা র. তাঁকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করলেন। দু'তিন বার তাঁর বুকের সাথে বুক মিলালেন। কানে কানে বললেন, আজ রাতে স্ত্রী গমন করবেন। অবশ্যই সক্ষম হবেন। মাওলানা সাহেব বলেন, আমি হজরত খাজা থেকে যখন পৃথক হলাম, তখন থেকেই নিজের মধ্যে এক বিস্ময়কর শক্তি অনুভব করলাম, যার বর্ণনা লজ্জাকর বটে। মূল কথা ওই রাতে আমি স্ত্রী সহবাস করতে সক্ষম হলাম। আমার সন্তানাদিও জন্মগ্রহণ করলো।

কারামত ২২ ঃ একজন দরবেশ যিনি হজরত খাজা র. এর মুরিদ ছিলেন, তিনি একদিন একজনের কাছে বললেন, হজরত খাজা র. কে বলবেন, তিনি যেনো আমার হালের প্রতি বিশেষ তাওয়াজ্জোহ্ প্রদান করেন। তিনি তাঁর দাবি হজরত খাজা র. এর নিকট উপস্থাপন করলেন। হজরত খাজা বললেন, সে মনে হয় আমার নিকট বেশী কিছু পাবে না। তিনি হজরত খাজা র. এর নিকট যা শুনলেন, তা ওই দরবেশকে জানিয়ে দিলেন। দরবেশ সাহেব এই কথা শোনা মাত্রই তার জামা দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন ও অনুতপ্ত হলেন। এরপর হতবিহ্বল হয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে দরবারে পৌঁছে গেলেন। এই ঘটনায় তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন। পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে কাদায় পড়ে গেলেন। নিজের অজান্তেই পাগড়ি, জুতা খুলে পড়ে গেলো। এভাবে পাগলপারা হয়ে হজরত খাজার মসজিদে উপস্থিত হলেন। দৌড়ে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। হজরত খাজা র. সাথে সাথে তাঁকে সরিয়ে দিলেন। বললেন, আমার কপালের দিকে তাকাও। তিনি কপালের দিকে তাকাতেই বেঁহুশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেলেন। হজরত খাজা র. ভিতরে চলে গেলেন। অনেকক্ষণ পর তাঁর হুঁশ ফিরে এলো। তখন লোকেরা তাঁকে বেহুঁশ হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, হজরত খাজা র. এর নূরানী কপালে আমি যা দেখেছি তা বর্ণনাতীত। আমি এর প্রকোপ সইতে না পেরে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ি।

কারামত ২৩ ঃ হজরত খাজা র. এর বাসায় মহিলা খাদেমাদের মধ্যে একজন ছিলেন অতি প্রসিদ্ধ। একদিন তাঁর তিন চার বছরের একটি ছেলে ফিরোজাবাদ কেল্লার দেয়ালের উপর থেকে পড়ে গেলো। দেয়ালের নিচে পাথর বিছানো ছিলো। দেয়ালের উচ্চতা ছিলো প্রায় চল্লিশ গজ। ছেলেটির নাক কান দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো। তার মায়ের কান্নাকাটি ও অস্থিরতা ছাড়া আর কিছু মনে ছিলো না। একথাও তাঁর মনে ছিলো না যে, হজরত খাজার নিকট ছেলের জন্য দোয়া চাইবেন। হজরত খাজা র. বললেন, এতো অস্থির হচ্ছো কেনো? সম্ভবত ছেলেটি মরেনি। ওকে এখানে নিয়ে এসো। ছেলেটিকে ভিতরে আনা হলো। হজরতের তাওয়াজ্জোহের বরকতে হজরত ঈসা আ. এর মোজেজার মতো ছেলেটির মধ্যে প্রাণের

আলো দেখা গেলো এবং তার প্রাণস্পন্দন ফুটে উঠলো। হজরত খাজা কামরার বাইরে চলে এলেন এবং কারামতটি গোপন রাখার উদ্দেশ্যে বললেন, আমি তো আগেই বলেছিলাম সে মারা যায়নি । সে বেঁচেই ছিলো। শুধু হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা দেখা গিয়েছিলো।

কেউ কেউ এই কারামতটিকে বর্ণনা করেন এভাবে— হজরত খাজা একটি চিকিৎসাবিদ্যার বই আনতে বললেন, আর তা খুলে দেখলেন। এরপর বললেন, মনে হচ্ছে এই ছেলে মারা যাবে না। লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হলো। মনে মনে বললো, এরকম কথা কোনো কিতাবে লেখা থাকার কথা নয়। কারামতকে গোপন রাখার জন্য হজরত এই কথা বলেছেন। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। আর তাঁর পবিত্র তাওয়াজ্জোহের বরকতে ছেলেটি জীবন্ত হয়ে উঠলো।

কারামত ২৪ ঃ ওফাতের পূর্বে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, আমার ৪০ বৎসর বয়সে একটি মহা ঘটনা ঘটবে। সে বছরই তিনি ইন্তেকাল করেন।

কারামত ২৫ ঃ ওই বছর তিনি আরও বললেন, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে অচিরেই নক্‌শবন্দিয়া সিলসিলার কোনো এক শীর্ষ ব্যক্তিত্বের ইন্তেকাল হবে। তিনি আরও বলেন, দিল্লীর এক প্রান্তে কোনো একটি জায়গা বেছে নেওয়া দরকার। আর সব সম্পর্ক ছিন্ন করে সেখানেই অন্তিম শয্যা গ্রহণ করা উচিত। এই বিষয়ে তিনি তাঁর কতিপয় বন্ধুকে ইস্তেখারার নির্দেশ দিলেন। ইস্তেখারায় ইতিবাচক কোনো কিছু জানা গেলো না। ফলে এই ইচ্ছা তিনি পরিত্যাগ করলেন।

কারামত ২৬ ঃ ওই বছরে তাঁকে এটাও বলতে শোনা গেছে যে, যে উদ্দেশ্যে তোমাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিলো, তা পূরণ হয়ে গেছে। এখন বিদায়ের পালা। ওই সময় তিনি আরও বলতেন, শোনা যাচ্ছে, কুতুবে জামানের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। আর আমি নিজের শোকগাঁথার এক ছন্দময় কাসিদা পড়ছি, যাতে ওই কুতুবের উচ্চপ্রশংসা সন্নিবেশিত ছিলো।

যখন জুমাদাস্ সানির পনেরো, আঠারো অথবা বারো তারিখ চলে এলো তখন হজরত খাজার ব্যাধি দেখা দিলো। তিনি বললেন, আমি স্বপ্নে হজরত খাজা আহরার র.কে বলতে শুনলাম, জামা পরিধান করো। এরপর মৃদু হেসে বললেন, বেঁচে থাকলে জামা পরবো। নতুবা জামাতো কাফনই।

কারামত ২৭ ঃ ওই সময় হজরত খাজার দরবারের এক মুখলিস দরবেশ সফরের ইচ্ছা করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, কয়েক দিন অপেক্ষা করো। আমার সময়কাল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এই মুমুর্ষু অবস্থায় তাঁর নিকট থেকে অনেক সূক্ষ্ম জ্ঞান প্রকাশ পেলো। একরাতে ফানাফিল্লাহর এমন অবস্থা প্রকাশ পেলো যে, উপস্থিত লোকেরা এটাকে অন্তিমকাল মনে করতে লাগলো। অনেকক্ষণ পর যখন এই অবস্থা কেটে গেলো তখন তিনি বললেন, মৃত্যু যদি এমন হয়, তবে কতোইনা উত্তম হয়। ফিরে আসতে মন চায় না।

ওই মাসের পঁচিশ তারিখ শনিবার দিন পরকালযাত্রার আলামত প্রকাশ পেলো। ওই অবস্থায় এক দরবেশের মুখে উচ্চারিত হলো—

يَا اِلٰهَ الْعَالَمِيْنَ

তিনি তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে নিলেন। উপস্থিত জনতার একজন বললো, হজরত খাজা র. প্রিয় নামটি শোনার আগ্রহে এভাবে মাথা ঘুরিয়েছিলেন। এই কথায় তাঁর চোখ ভরে অশ্রু নেমে এলো। বিদায়ের সময় সন্নিকটবর্তী হলো। তিনি আল্লাহ, আল্লাহ জিকিরে মশগুল হয়ে গেলেন। আর এভাবে আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলতে বলতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। ওই মাসের ছাব্বিশ তারিখ রবিবার দিন মুরিদগণ যেখানে কবর খননের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেখানে কবর খনন করা হলো। যখন তাঁকে দাফনের জন্য কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো, তখন মুরিদগণ অত্যন্ত পেরেশানীতে নিমজ্জিত হলেন। একটি এলহামের কারণে পূর্বনির্ধারিত জায়গা ছেড়ে তাঁকে অন্যত্র দাফন করা হলো। এর কারণ, হজরত খাজা র. একবার ওই জায়গায় আগমন করেছিলেন। সেখানে ওজু করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেছিলেন। ওই সময়ে সেখানকার কিছু মাটি তাঁর জামায় লেগে গেলো। এলহাম হলো, এখানকার মাটি তোমার পরিচ্ছদ। এরপর রাস্তার পাশে সপ্তমহাদেশের বাদশাহ্ এই অমূল্য রত্নকে সেখানেই দাফন করা হলো।

ওই স্থানের পবিত্র ভূমি, ফুল, বৃক্ষ সকলে জান্নাতের অংশ হওয়ার কথা বলে। যেমন বর্ণিত আছে, এই কবরটি জান্নাতের একটি ফুলের কানন। আলেম ওলামা ও পুণ্যার্থিগণ তাঁর মাজার জিয়ারত করে আত্মিক ফয়েজ লাভ করে থাকেন।

হাজ্‌রাতুল কুদুস/২৯২

এই সংক্ষিপ্ত কিতাবে তাঁর কামালত ও বুজর্গীর বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কবি বলেন—

রফতে হাদীয়ে শরীয়ত মোরশেদে আহলে যামাঁ
আঁকেহ্ বুদাশ কেবলায়ে আরবাবে যানা সূরতাশ
কায় তাওয়ানম নুত্বক যাদ আন্দার সিফাত ও যাত আও
হাস্তে সারতা পা হামা আলম গাওয়াহে আজিমতাশ।

অর্থ ঃ শরীয়তের পথপ্রদর্শক ও জামানার মোর্শেদ বিদায় নিলেন। যা কিছু রেখে গেলেন, তা কেবল জ্ঞানীদের জন্য অনুসরণীয়, অনুকরণীয় পাথেয়।

তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য আমি কীভাবে বর্ণনা করবো। যিনি আপাদমস্তক বৈশিষ্ট্যময়, বিশ্বজগত তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের সাক্ষী।

সের গরদাহ নক্শবন্দা বুদ আমদ যাঁ সবব
সের গরদাহ নক্শবন্দিয়া হিসাব হিল তাকা।

পঙ্ক্তিঃ যাতী কেহ বদ দাস্ত বুদ বাকী
ওয়াজ খুদ হামসাহ্ ফানী আস সিফাত বুদ
বর খালেক খাওয়ায়েশ জামলগী আশেক!
বর খালেক তামাম আলফত বুদ।
দে তাশমাহ ওয়ালাম বেসালে আও খাওয়ায়েশ
খোশ গুফতে কেহ হিজর মা'রেফাত বুদ।

এই নগণ্য ফকির হজরত খাজার ওফাত সম্পর্কে বলেন—

আঁ খাজা কেহ কামেল শরীয়ত বুদ
দরইয়াই মাআরেফ হকিকত বুদ
দে হাতেফ গায়েব গুফতে সালেছ বামান
সুলতানে মামালেক তরিকত বুদ।

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহুর জীবনী আলোচনার পর আমাদের হজরত ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফে সানি কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজের জীবনী আলোচনা করা উচিত। তার এই কিতাবের ভিত্তি হলো হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানির মানাকেব, মাআছির, মাকামাত ও কারামত বর্ণনা করা। আর এই কিতাবের লেখকের উদ্দেশ্যেও

তাই। কিন্তু হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি ও তাঁর খলিফাবৃন্দের আলোচনা অনেক দীর্ঘ। এই জন্য পৃথক একটি খণ্ডে (দ্বিতীয় খণ্ডে) তাঁদের আলোচনা লেখা হলো। আর এই খণ্ডে হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহুর সন্তানাদি ও তাঁর কতিপয় খলিফাবৃন্দের আলোচনা করে হাজ্‌রাতুল কুদ্দুসের প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি করা হবে।

হজরত খাজা উবায়দুল্লাহ র.

তিনি আমাদের খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর বড় সাহেবজাদা। এই জন্মগত ওলীর শুভজন্ম রবিউল আউয়াল ১০১০ হিজরী। মারেফাতের এই বসন্তকাননের জন্মের পূর্বেই একজন বুজর্গ শুভসংবাদ দিয়েছিলেন যে, হজরত খাজার একটি পুত্রসন্তান হবে। তাঁর নাম রাখা হবে হজরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরারের নামানুসারে। জন্মের পর ওই সংবাদের ভিত্তিতেই তাঁর নাম উবায়দুল্লাহ রাখা হয়। তাঁকে খাজা কালাও বলা হতো।

আমাদের হজরত ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেসানি কুদ্দিসা সিররুহু বলেন, একদিন হজরত খাজা বাকী র. বললেন, আমার শারীরিক অবস্থা বেশী ভালো নয়। মনে হচ্ছে অন্তিমকালে এসে পড়েছি। সুতরাং তোমরা ছেলে দু'টির খোঁজ খবর রেখো। এরপর তিনি তাঁর দুই রত্ন খাজা উবায়দুল্লাহ ও খাজা আবদুল্লাহকে কাছে ডেকে আনলেন। তাঁরা দু'জনে হজরতের সামনে বসলেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন এদেরকে তাওয়াজ্জোহ্ দিন। আমি অপারগতা প্রকাশ করলাম। কিন্তু হজরত খাজা মানলেন না। অগত্যা হজরতের সামনেই উভয় সাহেবজাদার প্রতি তাওয়াজ্জোহ্ প্রদান করা হলো। তাওয়াজ্জোহের প্রভাব পরিলক্ষিত হলো।

হজরত খাজা কালা আমাদের হজরতের খেদমতে আপন পিতার সিলসিলা ও তরিকা লাভ করেন এবং এলমে জাহেরী তথা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তিনি ইতিহাস ও রিজাল শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এলমে তাসাউফে তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিলো। সাহিত্য জগতে তাঁর পূর্ণ দখল ছিলো। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, প্রশান্তচিত্ততা ও বিনম্র স্বভাব তাঁর মহান পূর্বসূরীদের ছাঁচেই গড়া ছিলো। তিনি একাকিত্ব ও নির্জনতা ভালোবাসতেন। গ্রন্থ অধ্যয়ন ছিলো তাঁর একান্ত প্রিয় কর্ম। তাঁর বেশীর ভাগ সময় লেখালেখি কার্যে অতিবাহিত হতো। তিনি এক লক্ষ বা তার চেয়ে কিছু কম বা বেশী (বয়াত) কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতা সংকলনের

নাম তাযকেরায়ে মাশায়েখ। এ ছাড়াও তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে। আর যেহেতু এই অধম লেখকের পক্ষে হজরতের সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হয়নি এবং তাঁর জীবনী সম্পর্কে অধিক কিছু জানা নেই, তাই এখানেই ইতি টানছি।

হজরত খাজা আবদুল্লাহ্ কুদ্দিসা সিররুহু

তিনি হজরত খাজা বাকী র. এর দ্বিতীয় সন্তান। মারেফতের এই কুসুম কাননের শুভজন্ম ৬ই রজব ১০১০ হিজরী। তিনি হজরত খাজা উবায়দুল্লাহ র. এর চেয়ে চার মাসের ছোট ছিলেন। তিনি ছিলেন অন্য মায়ের গর্ভের। হজরত র. তাঁর জন্মের আনন্দে বেশ কয়েকটি কবিতা রচনা করেন। এই মহান শায়েখ আকৃতি প্রকৃতি ও পরহেজগারীতে তাঁর উর্ধ্বতন পুরুষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন।

শিক্ষা ঃ তিনি ছিলেন হাফেজে কোরআন। দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে তিনি বুৎপত্তি অর্জন করেন। পাঠ্য কিতাবাদি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শিক্ষা দিতেন। এলমে তাসাউফে অভিজ্ঞ ছিলেন। এলেমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে অন্যান্য আলেমের তুলনায় বিজ্ঞ ও অগ্রগামী ছিলেন। আরবি, ফারসি ভাষায় তিনি অত্যন্ত স্বচ্ছ কবিতা রচনা করতেন। তাঁর কবিতামালা হতো অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।

ইবাদত ও খেলাফত ঃ তরিকতে তাঁর নেসবত আমাদের হজরত ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর সাথে। আল্লাহ্ অনুসন্ধানের পিপাসা যখন হৃদয়পটে জাগ্রত হলো, তখন দিল্লী থেকে অত্যন্ত আগ্রহ ও তৃষ্ণার সাথে পায়ে হেঁটে সেরহিন্দে আগমন করেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সান্নিধ্য গ্রহণ করেন। তিনি হজরতের অশেষ ভালোবাসা ও স্নেহ-মায়া-মমতায় সিক্ত হতেন।

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর ওসিয়ত অনুযায়ী ইমামে রব্বানি মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. সত্যানুসন্ধানী এই আল্লাহ্প্রেমিকের দীক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেন ও জিকির, মোরাকাবা ও নক্শবন্দিয়া সিলসিলার আসরার বা রহস্যসমূহ শিক্ষা প্রদান করেন। হজরত খাজাতনয় মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে পূর্ণ আনুগত্যের সাথে অবস্থান করেন। ইবাদত তথা সংকল্পে ও বরকতে সৌভাগ্যমণ্ডিত হন। হজরতকে বিশেষ তাওয়াজ্জোহ্ ও

আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করতেন এবং হজরতের এলমে মারেফাতের পরশে পূর্ণতা হাসিল করেন। এছাড়া এলমে কালামের কিছু কিছু কিতাব যেমন শরহে মাওয়াকেফ ও কতিপয় রাসায়েলে সুফিয়া হজরতের খেদমতে পাঠ করেন। অনেকবার বাহনে চড়ে ও পায়ে হেঁটে এই নিরহংকারী, বিনয়ী ব্যক্তিত্ব একাকি দিল্লী থেকে সেরহিন্দে হজরতের ধ্যানালয় চুম্বনের জন্য আসতেন। কল্যাণ ও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সময় হজরতের দরবারে অবস্থান করতেন। পরিশেষে হজরতের খেলাফত ও এজাজতে এরশাদ লাভে ধন্য হন।

শায়েখের দৃষ্টিতে ঃ ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. খাজাতনয় সম্পর্কে বলতেন, তিনি মোহাম্মদী মাশরাবের তথা মহানবী স.এর স্বভাবের লোক। তিনি আরও বলেন, তিনি একজন মাহবুব। আরও বলতেন, তিনি নেসবতে তাওহিদে মাগলুব থাকতেন। হজরত এই মহান পুরুষের পত্রের উত্তরে প্রাণবন্ত উত্তর লিখতেন। সেগুলো থেকে একটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মকতুব ঃ পত্র হাতে পেয়েছি। পাঠ করে খুশি হয়েছি। নেসবতে হুজুর ও তার প্রাবল্য সম্পর্কে যা লিখেছেন তা নেয়ামত ও বরকতময়। এই রত্ন তিন চার মাসের মধ্যেই আপনি অর্জন করেছেন। অপরাপর সিলসিলায় যদি তা দশ বছরেও লাভ হতো, তবুও তাকে মহানেয়ামত মনে করা হতো। সুতরাং এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করুন। আমি জানলাম যে, আপনার ফিতরাত উচ্চমার্গীয়, আর এরূপ পর্যায়ের প্রশংসা আত্মঅহংকারের আবেশমুক্ত। এজন্য নেয়ামতের বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন এরশাদ হচ্ছে—

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

(তোমরা কৃতজ্ঞ হইলে তোমাদিগকে অবশ্যই অধিক দিবো। সূরা ইব্রাহীম আয়াত ৭)।

আপনি লিখেছেন তাওহিদের দরবার প্রকাশিত হলো। এই নেয়ামত আপনার জন্য বরকতময় হোক। এই সকল নবাগত বিষয়কে অত্যন্ত আদবের সাথে গ্রহণ করুন। এমতাবস্থায় হালের প্রাবল্য সত্ত্বেও শরয়ী আদবের প্রতি মনোযোগী হতে হবে ও বন্দেগীর হক যথাযথভাবে সম্পাদন করতে হবে।

আমাদের হজরত ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. খাজাতনয়ের পরবর্তী অবস্থা তাঁর এক খালেস মুরিদের কাছে বর্ণনা করেন— জনাব খাজা আবদুল্লাহ রমজানের পূর্বে দিল্লী আগমন করলেন। আল্লাহ্তায়ালার কৃতজ্ঞতা যে, তিনি এই সফরে অনেক ফায়েদা লাভ করেছেন। পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ করেছেন। গালবায়ে তাওহিদের (তাওহিদের প্রাবল্যের) মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধসমুদ্রে সন্তরণ করছেন এবং গভীরতার দিকে ধাবিত হচ্ছেন। জাহের থেকে বাতেনে বরং মহাবাতেনে হারিয়ে যাচ্ছেন।

হজরত খাজাতনয় বিভিন্ন উদ্দেশ্যসম্বলিত উচ্চমার্গীয় নবাগত অবস্থা সম্পর্কে আমাদের হজরত ইমামে রব্বানীর খেদমতে লিখেছেন—

এই অধম বান্দা আবদুল্লাহর আরজ এই যে, হজরতের দোয়ায় অবস্থা ভালোই যাচ্ছে। তাসাউফতত্ত্ববিদ হজরতের খেদমত থেকে দূরে থাকার কারণে এই পরিমাণ অনুতাপ ও মনোকষ্ট হচ্ছে যে, যা বলা সম্ভব নয়। আর এতোটা বিমুখতা ও শীতলতা বিরাজ করছে যে, তার সামন্যতম বর্ণনা করা অসম্ভব। আপাদমস্তক ব্যথায় জর্জরিত। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্তায়ালার শুকরিয়া যে, বাতেনে রাবেতার নেসবত যার চূড়ান্ত অবস্থা ফানা ও নাস্তি। এতে সত্তাগত, গুণগত, উপকরণগত ও প্রভাবগত কোনো শূন্যতা আসেনি। আসল ঠিকানায় ফিরে আসার পর শূন্যতা আসবেই বা কী করে ? যেখানে রিক্ততার ঘাটতি মাথায় নেই ও বিরল বস্তুসমূহ প্রকাশ পাচ্ছে, বিস্ময়কর ভেদ বা তত্ত্বসমূহ উজ্জ্বলতর হচ্ছে— এই সকল বাতেনের দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আদমের (নাস্তির) দরিয়ার পানি মাথার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এই সকল কিছু হজরতের খেদমতে ও গোলামীর মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। আপনার ছায়া কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্সন্ধানী সালেক সালেকাদের মাথার উপর স্থায়ী হোক। আমীন।

এই অধম আবদুল্লাহর আরজ এই যে, অবস্থা এমন যাচ্ছে, যার আলোচনা দীর্ঘ অবকাশের দাবি রাখে। পরিনতি কী হবে এবং কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা জানি না। একটি উত্তম আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। হকিকতের দরিয়া তরঙ্গবিক্ষুব্ধ। ক্রমাগত তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে।

বিন্দুর তরঙ্গে বাস প্রেমের শরীয়ত
আফসোস! আফসোস! আমি কি লিখছি! বৃত্তের বলয় সমীপে।
এই উন্মাদের আশা যে, দান করবেন উন্মাদনা ।

কবি বলেন—

গাহে গিরইয়াম ও খান্দাম গাহে উফতম ও গাহে খীযাঁ
আমুখতা আম মাস্তী আজ দীলবর মাস্তানা।

অর্থ ঃ আমি কখনো হাসি কখনো কাঁদি কখনো উঠি কখনো পড়ি— আমি এই উন্মাদনাটি উন্মাদের কাছে শিখেছি।

হে কেবলা! খোদার পিয়ারা, দয়া করুন যাতে জলমগ্ন উন্মাদনা থেকে স্বাভাবিকতার তীরে ভিড়তে পারি। এর চেয়ে বেশী চাওয়া নিশ্চয়ই অপরাধ হবে।

আমাদের হজরত ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. একবার মখদুমজাদাকে সুসংবাদ দিয়েছিলেন এভাবে—

ইমামে জমাঁ কুতুবে আকতাবে আলম
কে চুঁ উ নাদানম কে বুগুযাশ্‌ত এক তন।
যে পছ হিম্মতে ওয়াসয়াতে ফয়েজে বাতেন
বা তাজদীদে আলফে দুওম শুদ মুআইয়্যিন।
চু বহরে শাফায়াত ব মাহ্‌শর দর আয়াদ
জাহানে নেহাঁ গরদেশ যের দামান
শাম্মাশে ইয়ামিন শুদ আয আঁ রও মুলকেরা
জুদা করদ আয খেদমতাশ রব্বে যুলমান
বসালে হাজার ও চেহেল না যে হিজরত
শব বিশতম আয রজব গুফতবামান
কে আয় বরগুযীদা খোদাওয়ান্দে ক্বাদের
কেহ বে ইযনে উজাঁ না পায় ওয়াস্তে বাতেন।
তরা মারকাযে রোজগারে তু করদম
হামী চান্দ বাশী বমারকাজে তু মুম্‌কেন।

অর্থঃ জামানার ইমাম জগতের কুতুব— যখন তিনি চলে গেলেন জানি না হিম্মত ও বাতেনী শক্তিওয়ালা ব্যক্তি পাওয়া যাবে কিনা? সৌভাগ্য যে, মোজাদ্দেদে আলফে সানির দ্বারা তা নির্ধারিত হয়ে গেলো। যখন শাফায়াতের উদ্দেশ্যে সকলে হাশরের ময়দানে আসবে, রিক্ত পৃথিবী তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় নেবে। রাজার ওই নীতি এখন পঞ্জিকা হয়ে গেলো। দানশীল প্রভু তাঁকে তাঁর দরবার থেকে উত্তীর্ণের সনদ দিলেন এক হাজার

চল্লিশ হিজরী রজবের বিশতম রাতে। দোয়ায় বললেন, হে পরওয়ার দিগার! তার অনুমতি প্রদান ব্যতিরেকে মৃত্যু দিয়ো না। আমি তোমাকে যুগকেন্দ্রে পরিণত করবো আর তোমার দ্বারা আরও প্রাণকেন্দ্র গড়ে উঠবে।

আমাদের খাজা বাকী র. এর তনয় তাঁর দরবারে বছরের পর বছর ধরে পড়ে থাকবেন এই নির্ধারণীর জন্য যে, আপন পিতার এরশাদের মসনদ ও গদীনশীন হতে পারবেন কি না? বা আল্লাহ্অন্বেষীগণের উপকৃত করার ক্ষেত্রে সরগরম তৎপরতা দেখাতে পারবেন কিনা? তাই দু'এক জনকে তাঁর নির্দেশ পালনের জন্য দীক্ষা দিলেন। কিন্তু হজরত খাজাতনয় পুরোপুরি মনোনিবেশ না কারণে তাঁর (খাজা বাকী র.) জীবদ্দশায় সে স্তরে পৌঁছতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে তিনি অর্থাৎ খাজা আবদুল্লাহ হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর হাত ধরে ওই উন্নত সোপানে উপনীত হন।

শায়েখ তাজুদ্দিন সম্ভলী কুদ্দিসা সিররুহু

তিনি হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর প্রথম সারির খলিফাগণের অন্যতম। তিনি প্রথমে মীর সায়্যিদ আলী জৌনপুরী র. এর অন্যতম খলিফা শায়েখ আল্লাহ্ বখশ র. থেকে খেলাফত লাভ করেন। কিন্তু আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে তিনি আমাদের হজরত খাজা বাকী র. এর সান্নিধ্যে হাজির হন এবং হজরতের তরবিয়তে কামালতের সোপানে পৌঁছে যান। তিনি হিন্দুস্তানী ঘরানার বুজর্গ ছিলেন। ছিলেন উৎকর্ষমণ্ডিত ও মিষ্টভাষী। যখন তিনি হজরত খাজা বাকী র.কে মাগলুবুল হাল তথা আত্মমগ্ন পেতেন, তখন সূক্ষ্ম ও উপযুক্ত কথা বলে হজরতকে আলাপচারিতায় ফিরিয়ে আনতেন। হজরত খাজার নিকট থেকে আসরার তথা রহস্য বা ভেদের কথা জিজ্ঞাসার ব্যাপারে তিনি সবচেয়ে দুঃসাহসী ছিলেন।

খেলাফত ঃ হজরত খাজা বাকী র. শায়েখ তাজ র.কে খেলাফত প্রদানের ইচ্ছা করলেন। তাঁর খেয়াল এরকম হলো যে, শায়খ তাজ যদি এ বিষয়ে (স্বপ্নে) কিছু দেখতে পেতেন তাহলে ভালো হতো। তাঁর খেয়াল বাস্তবায়িত হলো। দেখতে পেলেন, হজরত আজিজানে আলী রামেতিনি র. তুর্কি টুপি তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলেন। হজরত খাজা বাকী র. এই ঘটনা শোনার পর হজরত শায়েখ তাজ র.কে খেলাফত প্রদান করলেন ও তাঁকে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি সম্ভলে পাঠিয়ে দিলেন।

কথিত আছে— খেলাফত প্রদানের পর তাঁর স্বভাবে ও নজরে এমন প্রভাবের জন্ম নিলো যে, তিনি যাকেই তরিকার জিকির শিক্ষা দিতেন তাকে জয্‌বা ও গালবা এমনভাবে ঘিরে ফেলতো যে, তার মধ্যে ওলীসুলভ স্বভাব ও কর্মকাণ্ড প্রকাশ পেতো। তিনি হজরতের নির্দেশানুযায়ী হেদায়েত ও এরশাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন ও স্বীয় জন্মভূমি সফর করেন। এতে কিছু ঈর্ষাপরায়ণ লোক সেখানকার এক বুজর্গ আবু বকর র. যিনি আল্লাহ্ বখ্‌শ র. এর মুরিদ ছিলেন, তাঁকে ও অন্যান্যদেরকে শায়েখের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুললো। তিনি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হজরত খাজা বাকী র.কে জানালেন। তাদের আচরণের জন্য বিরক্তি প্রকাশ করলেন। হজরত খাজা বাকী র. মেশকে আম্বরতুল্য সুগন্ধিময় এক পত্রের মাধ্যমে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন এভাবে—

হজরত শায়েখ আবু বকরের সাথে আপনার যে দ্বন্দ্ব হচ্ছে, তার বিবরণ আমি পাঠ করেছি। এই সকল বিষয় হৃদ্যতার অনুকূল নয়। আর ওলীরা কবিরা গুনাহ থেকে নবীদের ন্যায় সুরক্ষিত নয়। বেচারা মাত্র কিছু দিন হলো সুলুকের পথে প্রবেশ করেছে। কী করে সে নিষ্পাপ থাকতে পারে। তাই তার দ্বারা অনভিপ্রেত কিছু প্রকাশ অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিশেষ করে পাগলের ক্ষেত্রে, যে আকলশূন্য। তার নিকট থেকে স্বাভাবিক কিছু আশা করা অনুচিত, যদিও সে বেলায়েতের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। আল্লাহ্‌তায়ালাই ভালো জানেন, ওই সময় তার অভ্যন্তরে কোনো অসংলগ্নতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো কিনা, যার কারণে সঠিক বিষয়টি তার দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলো। পাগলের পাগলামীর বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। তোমার কি জানা নেই যে, শরীয়তের বিধান আকলের (বিবেক- বুদ্ধির) সাথে সম্পৃক্ত। মোটকথা তার এই বিষয়টি মাজুর বা অপারগ মনে করা উচিত। দৃষ্টি থাকবে কর্তার প্রতি, তথা আল্লাহ্‌র প্রতি। তাঁর সঙ্গতাকে শিষ্টাচারের দৃষ্টিতে দেখবে। কেনোনা প্রবৃত্তি হয় বিভিন্ন রকমের। কোনোটি আম্মারা, আবার কোনোটি মুতমাইন্না, আবার কোনোটি মধ্যবর্তী, যাকে লাওওয়ামা বলা হয়। আর এটাও আকলের সাথে সম্পৃক্ত। মুতমাইন্না হয় ওলীদের প্রবৃত্তি। আর নফসে আম্মারার ব্যক্তিদেরকে মাজুর তথা অপারগ মনে করা উচিত। বরং ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখতে হবে ও সকল কাজে সঠিক পরিকল্পনা থাকতে হবে। সম্ভলবাসীদের ঠাট্টা-বিদ্রোপকে

তিরস্কার কোরো না, বরং তাদেরকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখো। কেনোনা তারা বুদ্ধিমত্তার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। আত্মার স্বভাবকে গিয়েছে ভুলে। যদি কোনো মাজুর (অপারগ) ব্যক্তি ভিন্নমত পোষণ করে, তাহলে কেনো তাকে বাতিলপন্থী বলতে হবে? তার কাজকে কেনো ইবলীসী কাজ বলে আখ্যায়িত করবে? আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা যে, তিরস্কার আল্লাহ্‌র ওলীদের জন্য পরশমণি। আমরা এরূপ কিছু প্রকাশে ভিতরেও অন্য কিছু, ভিন্ন কিছু দেখতে পাই। যখন আমাদেরকে কোনো কিছুতে তিরস্কার করা হয়, তখন আমরা তা নিজের মধ্যে দেখতে পাই অর্থাৎ নিজের ভিতরে একটি মন্দগুণ দেখতে পাই। আর এটাকে গায়েবী উপদেশ মনে করি। এজন্য আল্লাহ্‌পাকের দরবারে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। ইনশাআল্লাহ্ অবস্থার উন্নতি ঘটবে। তিরস্কারকারীদের তিরস্কারে তোমার কী ক্ষতি হবে? এতে কি তোমার ইবাদত কবুল হবে না, বা তাওয়াজ্জোহের স্বচ্ছতা চলে যাবে? নাকি আল্লাহ্‌র দরবার থেকে তুমি হবে প্রত্যাখ্যাত ?

পঙ্‌ক্তি ঃ মা'শুকা তেরা ও বর সারে আলম খাক।

অর্থ ঃ প্রেমাস্পদের সাথে তোমার মিলন হোক। অন্যের মাথায় পড়ুক মাটি।

মকতুব ঃ হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. শায়েখ তাজ র.কে আরও লিখেছেন, প্রিয় বৎস! চিরন্তন হেদায়াত ও বক্রতা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আল্লাহ্‌র বাণী—

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى

(তাহার দৃষ্টিবিভ্রম হয় নাই, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুত হয় নাই। সূরা নাজম আয়াত ১৭) এর প্রতিবিম্ব বর্তমান। সালেক আল্লাহ্‌র মহব্বতে আবদ্ধ থাকবে। এর আলামত হলো চিরন্তন সত্তার সাথে বান্দার দূরত্ব সত্ত্বেও সকল মাকাম মোশাহাদা ও মুরাতাব প্রত্যক্ষ ও মিলন তথা আধ্যাত্মিক স্ত রসমূহ অতিক্রম করা তার জন্য সহজসাধ্য হবে। কবি বলেন—

রন্দে চান্দান্দ কাস্ নাদানাদ চান্দান্দ,
হর নাসিয়া ও নকদ হর দু আলম খান্দান্দ।

অর্থঃ প্রবাদের চন্দন এমন যে, তাকে কেউ চিনে না, আর সে দুনিয়ার নগদ-বাকী নিয়ে হাস্য করে।

এই পর্যায়ের সালেক এই স্তরগুলি অতিক্রম করে বন্দেগীর মাকামে পৌঁছে যায় আর গনী তথা ঐশ্বর্যশীল গুণের প্রকাশস্থল হয়ে যায় এবং দরিদ্রতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। কথায় আছে, দরিদ্রতার পূর্ণতাই আল্লাহ্‌প্রাপ্তির লক্ষণ।

এই অসীম ভাবমত্ততায় ডুবে থাকাও আল্লাহ্‌প্রাপ্তির চেষ্টা-সাধনা। এই বিষয়টি জানা ছাড়াও ওই আদেশের আকর্ষণ, আকৃতি প্রকৃতি জগতের সুরত সেকেল— মরীচিকা বা কঙ্কালের বেশী কিছু নয়। এর চেয়ে সহজসাধ্য কিছু হবে না। তার কথা শেষ হয়ে গেছে।

হারামাইন শরীফাইনে উপস্থিতি ঃ হজরত তাজুদ্দিন র. যখন পৃথিবী ভ্রমণে বের হলেন, তখন হৃদয়ের বিক্ষিপ্ততার কারণে জলে-স্থলে ভ্রমণ করতে থাকেন। কাশ্মীর ও ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চল সফর করে হারামাইন শরীফাইনের পথ ধরেন। ওই সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের সাথে তাঁর হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়। শায়েখ মোহাম্মদ ইলান যিনি হারাম শরীফের ইমাম শীর্ষস্থানীয় আলেম ও বুজর্গ ছিলেন। তিনি আমল, রেয়াজত ও কানায়াতের বিষয়ে উত্তম ছিলেন। তিনি শায়েখের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর মাধ্যমে ওই পবিত্র ভূমিতে হজরত খাজার প্রসিদ্ধি বৃদ্ধি পায়। এজন্য হজরত শায়েখকে আশ্‌শায়খু শায়েখে ইলান বলা হতো। তিনি অনেকবার আরব ভূমি থেকে অনারবে আসতেন। আবার হজের মৌসুমে স্বীয় পবিত্র ভূমিতে চলে যেতেন।

একবার তিনি লাহসা ও বসরায় গমন করেন। সেখানে অনেক লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর উষ্ণ সান্নিধ্যে ভক্তদের সমাবেশ ও জ্ঞানীদের আনাগোনায় জমজমাট পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় আরাফার দিন ঘনিয়ে এলো। তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। লোকসমাগম ও পীরি-মুরিদির কাজ স্থগিত রেখে এখান থেকে ইহরাম বেঁধে একটি উটনি ও দু'জন খাদেমসহ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে রিক্ত হস্তেই বাইতুল্লাহ শরীফ ও রওজা মোবারক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। জনৈক বুজর্গ বর্ণনা করেন, ওই বছর অর্থাৎ ১০৩৭ হিজরীতে আরাফা প্রান্তরে আমি হজরতকে দেখতে পেলাম। তাঁর ইহরামের কাপড় দীর্ঘদিন পরিধানের কারণে ময়লা হয়ে গিয়েছিলো। মাথার চুল ও দাড়ি এলোমেলো হয়েছিলো

এবং চেহারা মলিন হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর দাড়ির শুভ্রতা, লালবর্ণ চোখ ও অন্যান্য ব্যস্ততা সফরের ক্লান্তির প্রমাণ দিচ্ছিলো। হজরত শায়েখের এরূপ ব্যক্তিত্ব দেখে আমি অনেক প্রভাবিত হলাম। আর তাঁর প্রতি আমার বিশ্বাস অধিকতর প্রগাঢ় হলো। কবির ভাষায়—

দোস্ত আদারেগী হামী খাহাদ
রফতানে হজ্জ বাহানা আফতাদাহ্।

অর্থ ঃ ওই অবস্থায় তিনি বললেন, আমি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বন-বাজারে ঘুরে বেড়াই ও এটা ওটা নিয়ে গবেষণা করি, আর এখন আমি আমার মাওলার ঘর ঝাড়ু দিচ্ছি, যাতে এখানকার মাটির সাথে মিশে থাকতে পারি।

পঙ্ক্তি ঃ খোশ আ সারেকে বর আঁ আস্তানা খাক শাওয়াদ।

অর্থ ঃ সেই মস্তক কতোইনা মূল্যবান, যা এই আস্তানার মাটি হয়ে গেলো।

১০৪৬ হিজরী হজরতের বয়স হলো প্রায় নব্বই বছর। তিনি বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী এক খণ্ড জমি ক্রয় করলেন এবং সেখানেই বসবাস শুরু করলেন।

তিনি সর্বদা নির্জনতা অবলম্বন করতেন। আগমনকারীদের সাথে খুব কম সময় সাক্ষাৎ দিতেন। তাদের নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করেই বিদায় দিতেন। দেশ-বিদেশের রাজ-রাজড়ারা তাঁর দর্শনে বরকত লাভের আশা করতেন। যদি কোনো আগন্তুককে তাঁর মনোপুত হতো, তবে তাকে ভেতরে ডেকে আনতেন। অন্যথায় বলতেন, অন্য সময় আসুন। এক কথায় আরব, সিরিয়া, রোম, পারস্যের সম্রাট ও অমাত্যবর্গ ও সাধারণ জনতা হজরতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও অনুরাগ পোষণ করতো। ওই সকল দেশে তিনি সূর্যের মতো প্রসিদ্ধি ও পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন রচনা ও পত্র আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণকারীদের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। আহলে আরবদের উপকারার্থে নক্শবন্দিয়া বুজর্গগণের কতিপয় ফার্সি কিতাব ও পত্র তিনি আরবীতে অনুবাদ করেন। তিনি পীরি-মুরিদি সম্পর্কে বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেন। জাহেরী আলেমগণ বলে থাকেন, পীরি-মুরিদি বেদাত। ওই সকল পুস্তকে আকলী-নকলী আলোচনা দ্বারা তাদের অহেতুক যুক্তি-তর্কের খণ্ডন করেন। তালিমে জিকির সম্পর্কেও তাঁর একটি পুস্তিকা রয়েছে।

শায়েখের আকৃতি ঃ হজরত খাজা আবদুল্লাহ র. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী র. এর এই উক্তি সম্পর্কে বলেন, যা নুফহাতুল উন্‌স কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে— প্রথমে ওই ব্যক্তির আকৃতিকে খেয়ালে আনবে, যার মাধ্যমে তুমি এই নেসবত লাভ করেছো। হজরত শায়েখ আবদুল্লাহ্ এ সম্পর্কে আরও লিখেছেন, হে সন্ধানী! তুমি তোমার শায়েখের আকৃতিকে খেয়ালের মাধ্যমে তোমার ডান কাঁধে রাখো। তারপর কাঁধ থেকে কলব পর্যন্ত মনে মনে একটি রেখা টানো। এরপর এই আকৃতির সাথে রেখাটির মিলন ঘটিয়ে জিকিরের অনুশীলন করতে থাকো। এরপর রেখাটিকে স্বীয় অন্তরে প্রবেশ করাতে থাকো। এর ফলে তোমাতে নিয়তের বিশুদ্ধতা অর্জন হবে, জিকিরের প্রভাব প্রতিফলিত হবে ও মানবিক ক্রিয়াকলাপ, মানবিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে আল্লাহ্র আকর্ষণের প্রভাব সৃষ্টি হবে। আর এই প্রভাবটি যোগ্যতা অনুপাতে কমবেশী হতে থাকবে। কারো কারো মধ্যে সোকর বা উন্মাদনা ও গাইবত দুটোই অর্জিত হবে। এরপর আদম বা অস্তিত্বহীনতার অধিকারী হবে ও অনুসন্ধানী ব্যক্তি ফানা ফিল্লাহর স্তরে উপনীত হবেন। শায়েখ আবদুল্লাহ আনসারী র. এই আয়াতের তাফসীরে—

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ

(যদি ভুলিয়া যাও তবে তোমার প্রভুপালককে স্মরণ করিও। সূরা কাহ্ফ আয়াত ২৪) উল্লেখ করেন যে, গাইরুল্লাহকে ভুলে যাও তাহলে তুমি নিজেকেও ভুলে যেতে পারবে। অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র স্মরণে ডুবে থাকতে পারবে।

১০৫২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ২২ তারিখ শনিবার দিন এশার নামাজের সময় মক্কা নগরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। ওই সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ৯৯ বছর। মক্কা নগরীর একটি বাগানে তাঁর পবিত্র মাজার শরীফ অবস্থিত, যা তিনি নিজে নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি অসংখ্য ভক্ত, মুরিদ ও গুণগ্রাহী রেখে যান।

খাজা হুসামুদ্দিন আহমদ কুদ্দিসা সিররুহু

তিনি আমাদের হজরত খাজা বাকী র. এর প্রথম সারির মুরিদ ও আশেক ছিলেন। তিনি ৯৭৭ হিজরীতে বদখশানের কুন্দুজ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ

করেন। তাঁর বংশধারা এক দিক থেকে হজরত হাসান বসরী র. পর্যন্ত পৌঁছেছে, আর অপর দিক থেকে তাফসীরে জাহেদীর লেখক ইমাম জাহেদ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

জন্ম ঃ তাঁর পিতা কাজী নিজামউদ্দিন বদখশানী র. ছিলেন একজন বিখ্যাত আলেম। তিনি মাওলানা সাঈদ তুর্কিস্তানী ও মাওলানা আহমদ জন্দীর ছাত্র ছিলেন। তিনি ৯৮১ হিজরীতে ভারতবর্ষে আগমন করেন ও দিল্লীর বাদশাহ্ আবুল মুজাফ্ফর জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবরের অমাত্যবর্গের একজন নিযুক্ত হন। আর হজরত খাজা হুসামুদ্দিন আহমদ তাঁর পিতার সাথে ভারতে আগমন করেন। পিতার ইন্তেকালের পর অল্প বয়সেই তিনি পদ ও নেতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন। ওই সময়েই তিনি হাজী রমযীর এজাজত লাভ করেন। আমরা যার বিস্তারিত আলোচনা 'সানাওয়াতুল আত্কিয়া' নামক গ্রন্থে করেছি। তাঁর বরকতময় সান্নিধ্যে দরবেশী ও আল্লাহ্অন্বেষার অঙ্কুর তাঁর বক্ষে শেকড়াবদ্ধ হয়। তাঁর হৃদয় সর্বদা ফকীর দরবেশগণের প্রতি আকৃষ্ট থাকতো। তিনি ছিলেন নির্জনতা ও একাগ্রতাপ্রিয়। তিনি ওই সময়েই হজরত খাজা বাকী র. এর দরবারে উপস্থিত হতেন। হজরতের সুউচ্চ তাওয়াজ্জোহ্, ফয়েজ, বরকত ও সান্নিধ্যের বরকতে ফকিরি ও নিস্তী বা না পাওয়ার আগ্রহ তাঁর অন্তরে দিন দিন প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। এভাবে একদিন তিনি জয্বায়ে এলাহীতে পৌঁছে গেলেন এবং এই তরিকার আকর্ষণ তাঁর অভ্যন্তরে প্রবলতর হলো। ফলে তিনি সকল ধন-সম্পদ পায়ে মাড়িয়ে চটের পোশাক পরিধান করলেন। বাদশাহ্ যেহেতু তাঁকে বিশেষ একটি পদ দান করেছিলেন, আর সুলতানের মন্ত্রী আবুল ফজল ফয়জীর সাথে হজরত খাজা র. এর রক্তের সম্পর্ক ছিলো। এজন্য বাদশাহ্ ও মন্ত্রী উভয়ে হজরত খাজাকে কষ্ট দিতো, যাতে তিনি ফকিরির পথ ছেড়ে দিয়ে ধনাঢ্যতার পথে ফিরে আসেন। তিনি বিষয়টি হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর দরবারে পেশ করলেন। হজরত খাজা র. ওই মন্ত্রীকে যে তার শত্রু ছিলো, তাকে বাতেনী তরবারি দ্বারা হত্যা করেন। ঘটনাটি হজরত খাজা বাকী র. এর কারামত অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

কথিত আছে, হজরত খাজা র. তাঁকে জাহেরীভাবে জালালী এবং বাতেনীভাবে জামালী তরবিয়ত করতেন। জাহেরীভাবে তাঁকে তাঁর দরবার থেকে বের করে দিতেন, আবার বাতেনীভাবে তাঁকে কাছে ডেকে আনতেন।

চতুষ্পদি পঙ্ক্তি ঃ

খোশ নাযিস্ত নাযে খোব রোইঁয়া
যাদিদাহ রান্দান ওয়া আজদিদাহ্ জোইয়াঁ
ব চশমে নাযে বে আন্দাযা কারদান,
বদেগার চশমে উয্‌রে তাজাহ্ করদান।

অর্থ ঃ প্রেমাস্পদের অভিমান বড় বিস্ময়কর। একবার তাকে দূরে ঠেলে দেয়, আবার তাকে তালাশ করে। একবার সীমাহীন অভিমানী হয়, অন্যবার স্বীয় রোষ সম্বরণ করে।

জামানার কুতুব ঃ জনাব খাজা হুসামুদ্দিন থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি লাহোরে ছিলাম। এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম, হজরত খাজা বাকী র. ঘোড়ায় চড়ে কোথাও যাচ্ছেন। চারদিক থেকে অনেক লোক দৌড়ে তাঁর দিকে আসছে, আর বলছে ইনি হলেন জামানার কুতুব। এই স্বপ্ন দেখার পর আমি হজরতের দরবারে উপস্থিত হলাম ও স্বপ্নের স্বীকৃতি আকাঙ্ক্ষা করলাম। হজরত খাজা অস্বীকৃতি জানালেন। আমার উপর কান্না এভাবে চেপে বসলো যে, আমি চিৎকার করে কাঁদতে লাগলাম। একটি শোরগোল সৃষ্টি হয়ে গেলো। চারদিক থেকে কৌতূহলী লোকজন আমার দিকে ছুটে আসতে লাগলো। সকল সূফী-দরবেশ আমার কান্নাকাটি দেখে কাঁদতে লাগলেন। আমি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলাম, এটা কেমন অভিমান। তিনি নিজেই আমাকে দর্শন দিয়ে আমার মন কেড়ে নিলেন। আর এখন অস্বীকৃতি জানালেন। আমার এই কথাগুলো যখন হজরত খাজার কর্ণগোচর হলো, তখন তিনি মৃদু হাসলেন এবং আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে জিকিরের তালকীন দিলেন ও জয্‌বা প্রদান করে আলোড়িত করলেন।

তা না গুরীদ কুদকে হালওয়া ফুরুশ
রহমতে হক্ক কায় হামী আয়াদ বাজোশ

অর্থ ঃ যতোক্ষণ মিষ্টি বিক্রেতার ছেলে বাধ্য হয়ে না কাঁদবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র রহমত জোশে আসবে না।

বায়াত ঃ এক বন্ধু হজরত খাজা শায়েখ হুসামুদ্দীন সম্পর্কে বর্ণনা করেন, হজরত খাজা র. এর প্রতি আমার ভালোবাসার কারণ হলো— তাঁর সাথে আমার দীর্ঘ দিনের পরিচয় ছিলো। ছিলো পূর্ণাঙ্গ বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতা। এক রাতে আমি হজরত খাজার বাসায় গেলাম। তখন তিনি ওজু করছিলেন। বন্ধুত্বের কারণে আমি হজরত খাজার বিছানায় ঠেস লাগিয়ে বসে রইলাম। আমার ঘুম এসে গেলো। এদিকে হজরত খাজা র. ওজু শেষে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। আল্লাহু আকবার ধ্বনি মুখ থেকে বের হলে তিনি এমন জোরে লাফ দিলেন যে, মাথা ছাদে গিয়ে ঠেকলো। অথচ ছাদ ছিলো অনেক উপরে। এরপর নেমে এসে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। এই দৃশ্য দেখে আমার শরীর কেঁপে উঠলো।

সেদিনের মতো সেখান থেকে চলে এলাম। পরদিন আবার হজরতের দরবারে উপস্থিত হলাম। অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আজ অন্য দিনের চেয়ে অধিক বিনয়-নম্রতা দেখাচ্ছো কেনো? আমি গত রাতের ঘটনাটি বললাম এবং এর কারণ জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, আত্মা যখন প্রিয় মাবুদের নাম শুনলো তখন শরীর থেকে আলাদা হতে চাইলো, অগত্যা লাফিয়ে উঠলো এবং শরীরকেও সাথে উঠিয়ে নিলো। এরপর পরিচয় গোপন রাখার স্বার্থে বললেন, এটা কোনো পূর্ণতার লক্ষণ নয়। এরপর থেকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে হজরতের দরবারে উপস্থিত হতাম। এমনকি হজরতের মতানুসারী ভক্তদের দলভুক্ত হয়ে গেলাম।

খেদমত ঃ কথিত আছে যে, হজরত খজা বাকী বিল্লাহ র. খাজা হুসামুদ্দীন আহমদ র.কে তরিকতের শিক্ষা প্রদানের অনুমতি দিলেন। তিনি বললেন, যদি খেদমত বা দায়িত্ব থেকে রেহাই দেওয়া হতো, তবে ভালো হতো। এই গুরুদায়িত্ব বহনের যোগ্যতা আমার কোথায়? হজরত খাজা র. তাঁর এই কথায় তাঁকে সত্যবাদি বলে জ্ঞান করলেন এবং তাঁর আপত্তি গ্রহণ করলেন। বললেন, ভালো কথাই বলেছো। নিজেই নিজেকে এই দায়িত্ব থেকে মুক্ত করেছো।

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর অন্তিমকালে তাঁর বরকতময় খেদমত, সেবা শুশ্রূষা ও তাঁর সাথে রাত্রিজাগরণের দায়িত্ব তাঁর হাতেই সম্পাদিত হয়। হজরতের কাফন-দাফনের দায়িত্বও তিনি সম্পাদন করেন।

হজরত খাজার ইন্তেকালের পর তিনিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। আর দরবারে আগমনকারী ও প্রত্যাগমনকারী লোকদের খেদমতও তাঁর হাতেই ন্যস্ত ছিলো। পীরজাদাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও তাঁদের দেখা-শোনার দায়িত্বও ছিলো তাঁরই উপর। কেনোই বা এমনটি হবে না? হজরত খাজা র. এর প্রতি তাঁর ইশক ছিলো অত্যন্ত গভীর। তিনি বার বার বলতেন, যেনো আমাদের খাজা আহরারই খাজা হুসামুদ্দিন নামে ধরায় এসেছেন।

আমল ঃ তাঁর দৈনন্দিন আমল ছিলো এমন— ফজরের নামাজ সমাপনান্তে কেবলার দিকে মুখ করে বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত মোরাকাবা করতেন এবং ইশরাক নামাজের পর স্বীয় পীর ও মোর্শেদ হজরত খাজা বাকি বিল্লাহ র. এর মাজারে যেতেন— যা ছিলো কদমরসূলসংলগ্ন। শহর থেকে দুই মাইল দূরে। সেখানে সারাদিন কোরআন তেলাওয়াত, নামাজ ও মোরাকাবায় মশগুল থাকতেন।

কথিত আছে, প্রত্যেহ সেখানে ১৫ পারা কোরআন তেলাওয়াত করতেন ও মেশকাত শরীফ থেকে কয়েকটি হাদিস পাঠ করতেন। এরপর হজরতের মাজার মসজিদে আসরের নামাজ আদায় করে শহরে চলে আসতেন।

অনুকম্পা ঃ জীবে দয়া ছিলো তাঁর চরিত্রের ভূষণ। দুনিয়াদার ও বিত্তবানদের সাথে তাঁর অনেক দূরত্ব ছিলো। তথাপিও গরীব মানুষের প্রয়োজনার্থে (সুপারিশের জন্য) তাঁদের কাছে যেতেন। তাঁর গুণগ্রাহীরা তাঁর সুপারিশের জন্য কতিপয় দুনিয়াদারকে বিষণ্ন হতে দেখে তাঁর কাছে আরজ করলেন, এ ব্যাপারে আপনি হস্ত সংকুচিত করুন। সৃষ্টজীবের প্রতি তাঁর প্রবল অনুকম্পা ছিলো— যার কারণে কোনো সমস্যাগ্রস্ত ব্যাক্তি তাঁর শরণাপন্ন হলে তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়তেন। আর যে কাজের জন্য সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি নিবেদন করতেন, তিনি অকপটে তার জন্য সুপারিশ করতেন।

যৌবনকালে একবার এই ফকির লাহোরে এসেছিলো। ওই সময় তিনিও সেখানে অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁর সাক্ষাতে গেলাম। তিনি ওজুর জন্য বের হয়ে ছিলেন। আমার সাক্ষাতে তিনি খুবই খুশি হলেন, মুসাফাহা মুআনাকা করলেন। এরপর বললেন, আপনি ঘরে অবস্থান করুন। আমি ওজু করে আসছি। তিনি ওজু করে এলে আমি তাঁর সাথেই জোহরের

নামাজ আদায় করলাম। কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর তিনি কিছুক্ষণ কেবলার দিকে ফিরে মোরাকাবা করলেন, আমিও তাঁর সাথে মোরাকাবায় নিমগ্ন হলাম। মোরাকাবা শেষে তিনি দস্তরখানা বিছাতে বললেন। দুটি রুটি এবং এক পেয়ালা শরবত উপস্থিত করা হলো। তিনি বললেন, দিল্লী থেকে সংবাদ এসেছে— গতকাল হজরত খাজা কুতুবুদ্দিনের উরশ শরীফ শেষ হয়েছে। কাল আমার কাছে খরচ করার মতো কিছু ছিলো না। আজ কিছু পয়সা আমার হাতে এসেছে। এজন্য তাঁর ফাতেহার নিয়তে রুটি তৈরী করা হয়েছে। আল্লাহ্র শুকরিয়া এমন সময় আমাদের সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। যেহেতু তিনি গরীব অসহায়দের প্রতি দয়াবান ছিলেন ও মানুষের প্রয়োজন পূরণে আগ্রহী ছিলেন, তাই তিনি ভেবেছিলেন আমিও হয়তো বা কোনো কাজের জন্য আমিরের কাছে সুপারিশের জন্য তাঁর নিকট হাজির হয়েছি। এরপর বললেন, আজকাল দিল্লী থেকে কিছু পরওয়ানা এসে জমা হয়েছে যাতে আমি আমার একনিষ্ঠ মুরিদ ও দরবেশগণের নাম লিখে পাঠাই। এছাড়াও আরও কিছু নির্দেশ এসেছে এরকম— এমন কিছু লোকের নাম লিখে পাঠান যারা আপনার অনুসারী ও ভক্ত। যদি তুমি ভালো মনে করো, তবে তোমাকে ওই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে দেই। আমি বললাম, আমি লাহোরে শুধু সফরে এসেছি, অন্য কোনো নিয়তে নয়। আর আপনার দরবারে এসেছি শুধু আল্লাহ্র জন্য, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। তিনি এই কথা শুনে খুবই খুশি হলেন এবং বললেন, তোমার উদ্দেশ্য তো এমন হবেই। কেনোনা তুমি মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর মহান সান্নিধ্য পেয়েছো।

আমীরগণের উদাসীনতা ঃ এক দিন হজরতের মজলিশের এক ব্যক্তি ওই জামানার ধনী ও আমীরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলতে লাগলো, তারা ফকির দরবেশগণের মান-সম্মানের প্রতি খেয়াল করে না এবং তাদেরকে উপযুক্ত মর্যাদা দেয় না। যেভাবে পূর্ববর্তী আমীরগণ করতেন। তিনি বললেন, হে ভাই! এই জামানার দরবেশগণের জন্য এটাকেই আল্লাহ্র হেকমত বলে গ্রহণ করতে হবে। কারণ পূর্ববর্তী দরবেশগণ দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের থেকে এতোটা দূরত্ব বজায় রাখতেন যে, ওই জামানার আমীরগণ দরবেশগণের সাথে সাক্ষাতের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। আর তাঁরা তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন। আর

বর্তমান জামানার ফকির- দরবেশগণের অবস্থা এমন যে, যদি আমীরগণ তাঁদের কাছে আসেন, তাঁদের প্রতি আস্থাশীল হন, তাহলে তাঁদের রীতিনীতি ও কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটবে। এজন্য আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি দয়া করে ফকির- দরবেশগণের সাথে আমীরদের আস্থার দূরত্ব তৈরী করে দিয়ে তাঁদেরকে রক্ষা করেছেন।

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর সাহেবজাদা খাজা উবায়দুল্লাহ সাল্লামাল্লাহু তায়ালা তাঁর জীবনচরিত সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেখানে তাঁর মাকামাতসহ সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে। এজন্য আমি এখানে তাঁর জীবনী সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করলাম না। তিনি ১০৪৩ হিজরীতে সফর মাসে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে আকবরাবাদে দাফন করা হয়। কিন্তু কিছুদিন পর সেখান থেকে স্থানান্তর করে দিল্লীতে আনা হয়। এখন তিনি তার পীর-মোর্শেদ ও নক্শবন্দিয়া তরিকার বুজর্গদের সমাধিপার্শ্বে চিরনিন্দ্রায় শায়িত আছেন।

শায়েখ ইলাহদাদ কুদ্দিসা সিররুহু

তিনি ছিলেন হজরত খাজা বাকি বিল্লাহ র. এর প্রবীণতম সহচর। হজরত খাজা মাওয়ারাউন্নাহার সফরের পূর্বেই তিনি দরবারে আগমন করেন। হজরতের বিশেষ মেহেরবানী ও তত্ত্ববধানে জিকির ও মোরাকাবা হাসিল করেন। কিন্তু এই সফরে হজরত খাজার সাথী হতে পারেননি। যাঁরা এই সফরে হজরতের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তাঁদেরকে তিনি তাঁর সান্নিধ্য গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। আর হজরত শায়েখ ইলাহদাদ র.কে স্বস্থান তথা দরবারে বহাল রাখেন, যাতে মানুষের যাতায়াত রুদ্ধ হয়ে না যায়। হজরত খাজা বাকী র. (মাওয়ারাউন্নাহার) সফরের পূর্বে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সহচরকে লিখেছিলেন, সম্প্রতি সফরের ইচ্ছা প্রবল হয়েছে। আশা করছি, কয়েক দিনের মধ্যেই সফরে বের হবো। শায়েখ ইলাহদাদকে এখানে রেখে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। যারা তার সঙ্গী হবে তাদের জন্য মোবারকবাদ ও সাফল্যকামনা।

দাগে বে ইয়ারী ও দরদে বে ওলী
ইঁ হামা বর খুদ পসন্দীদাম ও রফত।

অর্থ ঃ একাকিত্ব ও ভগ্নহৃদয়ের দগদগে দাগই আমি পছন্দ করতাম এবং এই দাগ বা ব্যথা নিয়েই চলে গেলাম।

যে ব্যক্তি তাঁর সোহবত লাভ করবে, সে বিরাট সফলতা লাভ করবে। আল্লাহর শপথ! আমি এটা লৌকিকতার জন্য বলিনি।

দাদে ইয়াম তরা আয্ গন্ধে মাকসুদ নিশাঁ
গরমা না রসীদাইম তু শাইয়াদ বরসী।

অর্থ ঃ আমরা তোমাকে লক্ষ্যস্থলের আলামত বা নিশানা বলে দিয়েছি। যদি আমরা পৌঁছতে না পারি, তুমি পৌঁছে যেও।

এই সফরে তিনি শায়েখ ইলাহদাদ র. এর নিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তরিকতের যে সকল তত্ত্ব ও রহস্য তুলে ধরেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

ভাই ইলাহদাদ! আপনি এই দোয়াপ্রার্থীকে তাওয়াজ্জোহ্ ও ফাতেহার মাধ্যমে সাহায্য করতে থাকুন। নিজের এই বাহ্যিক পেরেশানী ও অস্থিরতার জন্য লজ্জাবোধ হচ্ছে যে, আমরা তাসাউফের কথা বলি, জয্বা ও তরিকার সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং কাশ্ফের প্রান্তসীমার হকিকত বর্ণনা করি।

আয খুদ তলব হারাচে খাহী কে তুই

অর্থ ঃ তুমি যা ইচ্ছা করো, তা নিজেই অনুসন্ধান করো— তাতে তুমি সফল হবেই।

মোটকথা, একটি ওসিয়ত করছি, যা তুমি কখনো হাতছাড়া কোরো না। আর তা হলো, আমার মতো বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ো না। নিজের নেসবতকে আয়ত্তে রেখে সযত্নে সংরক্ষণ করবে। কেনোনা নেসবতে কিবরিয়াত দিগন্তের লালাভার চেয়েও অধিক সৌভাগ্যের বিষয়। এটাই শেষ কথা।

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এই গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দময় সফর থেকে ফিরে এলেন। শায়েখ ইলাহদাদ র. শায়েখের খেদমতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। স্বীয় মোর্শেদের দরবারে অবস্থান করে মারেফাতের পেয়ালা থেকে তৃষ্ণা নিবারণ করতে লাগলেন। কথিত আছে— একদিন হজরত শায়েখ ইলাহদাদ র. মসজিদে ফিরোজীর ছাদে কয়েকজন সাথী-সঙ্গীসমেত মোরাকাবায় মগ্ন ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর উপর এমন একটি হাল প্রবল হলো যে, তিনি উন্মাদের মতো ধ্বনি দিতে দিতে বেরিয়ে গেলেন। মসজিদের ছাদ থেকে পড়েই যাচ্ছিলেন প্রায়। এক যুবক তাঁকে ধরে ফেললেন। মসজিদের ছাদ সমতল জমি থেকে প্রায় চল্লিশ গজ উঁচু ছিলো। এক কথায় তিনি ওলীসুলভ সকল গুণের আধার ছিলেন। ফানা ফিল্লাহ

মর্তবা তাঁর উপরে সদা বিরাজমান ছিলো। সর্বদা নির্জনতা ও একাকিত্ব অবলম্বন করতেন। ১০৪৯ হিজরী রমজান মাসে এই মহান পুরুষ ওফাতবরণ করেন। তাঁর জ্যোতির্ময় সমাধি হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর সমাধির পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত।

মহান আল্লাহ্তায়ালার ফজল ও করমে, দয়া ও তওফিকে হাজ্‌রাতুল কুদুসের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হলো। এতে সিলসিলায়ে নক্‌শবন্দিয়া আলিয়া কাদ্দাসাল্লাহু আসরারাহুমগণের মাকামাত বা স্তরসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

এর বিনিময় সম্পর্কে আল্লাহ্ই ভালো জানেন। অবস্থান ও প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে।

সমাপ্ত

আমি মৃত্যুকেই জীবন মনে করি। প্রকৃত জীবন মৃত্যুর সাথেই সম্পৃক্ত। মৃত্যুই হচ্ছে জীবন। মৃত্যুই বন্ধুত্বের পোশাক পরিধান করায়। নিঃশেষ করে দেয় অস্থায়ী আস্বাদকে। মৃত্যুই আল্লাহ্ ছাড়া সবকিছুর অস্তিত্বকে জ্বালিয়ে দেয়, অদৃশ্য ও স্থায়ী সৌন্দর্যকে উন্মোচিত করে। প্রেমিককে প্রেমাষ্পদের সাথে মিলিয়ে দেয়। ওটাই প্রকৃত মৃত্যু, যার আগমন আনন্দ দান করে।

- খাজা মোহাম্মদ সিদ্দীক কাশমী রহ.

HAZRATUL QUDUS

Written by Allama Badruddin Serhindi R.
Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia
www.hakimabad.com
Exchange Taka. 280/- only. US $ 20
ISBN : 984-70240-0065-0